সচিত্র

দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ

শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী
প্রণীত

দ্বিতীয়সংস্করণ,

কলিকাতা

২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ বেঙ্গল-মেডিকেল্
লাইব্রারি হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩১১ সাল।

মূল্য ১।০

নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট্ নিউব্রিটেনিয়া-প্রেসে
শ্রীঅম্বিকাচরণ সোম দ্বারা মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

পাঠাবস্থায় বারাণসী অবস্থান কালে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ-বাসী বিদ্যার্থীর সহিত পরিচয় হয়। সেই সময়েই দেশভ্রমণেচ্ছা হৃদয়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়াছিল। ঘটনাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের নানাস্থান পর্য্যটন করি। যদিও দক্ষিণাপথে শেষে গমন করিয়াছিলাম, তথাপি আমার কতিপয় কৃতবিদ্য বন্ধুর অনুরোধে "দক্ষিণাপথভ্রমণ" নাম দিয়া দক্ষিণা-পথের ভ্রমণ-বৃত্তান্তই অগ্রে প্রকাশ করিলাম। যদি পাঠকগণের নিকট উৎসাহ প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে পরে "উত্তরাপথভ্রমণ" নামে আর্য্যাবর্ত্তের ভ্রমণ-বৃত্তান্তও প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব।

এই পুস্তকে পরিদৃষ্ট জনপদ-সমূহের প্রাচীন নাম ও তৎ তৎ প্রদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা, বর্ত্তমান অধিবাসীদের আচার, ব্যবহার, সভ্যতা, যথাশক্তি লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ভ্রমণাবসরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে, অবিকল তাহাই বর্ণনা করা গিয়াছে। উহার কোন্ অংশ পাঠকগণের রুচিকর হইবে, কোন্ অংশ হইবে না, তাহা বলিতে পারি না। পরিশেষে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে, এই গ্রন্থ প্রণয়ন-কালে বম্বে নগরীর নির্ণয়সাগর ও বেঙ্কটাচলেশ-যন্ত্রালয় হইতে মুদ্রিত বেদ, পুরাণ ও বহুবিধ সংস্কৃত ও বাঙ্গলা গ্রন্থ এবং বিশ্বকোষ অভিধান হইতে স্থানে স্থানে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

উপসংহারে বক্তব্য, নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় সত্বরতা-নিবন্ধন যদি কোন ভ্রম প্রমাদ ঘটিয়া থাকে, পাঠকগণ নিজগুণে উহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

নবদ্বীপ।
২৩ শে আশ্বিন, শকাব্দ ১৮১৯।

নিবেদক—
শ্রীশরচ্চন্দ্রশর্ম্মা।

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

প্রথম যখন "দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ" প্রকাশ করি, তখন আশা করি নাই যে ইহা সাহিত্যসেবি-সমাজে এতদূর সমাদৃত হইবে। সৌভাগ্যের বিষয়, পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার পর অল্প দিনের মধ্যেই উহা সম্পূর্ণ নিঃশেষ হইয়া যায়। কৃপালু পাঠকগণের আগ্রহাতিশয় দর্শনে ইহা পুনরায় প্রকাশিত করিলাম। বর্ত্তমান সংস্করণে গ্রন্থের কলেবর প্রায় দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। অধিকন্তু এবার বহুব্যয় স্বীকারপূর্ব্বক পরিদৃষ্ট কতিপয় প্রধান দৃশ্যের চিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছি। দ্বিতীয় সংস্করণে যেরূপ ব্যয়-বাহুল্য হইয়াছে, তদনুরূপ মূল্য-বৃদ্ধি করা হইল না, সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত পূর্ব্ববৎ ১।০ মূল্যই রহিল। আশা করি, পাঠকবর্গ এবারেও আমার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় করুণা বিতরণে কুণ্ঠিত হইবেন না। এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ পাঠ করিয়া অনেকে আমাকে উৎসাহিত করেন। তন্মধ্যে সংস্কৃত-কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার এম্, এ. বেঙ্গলগবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব অনুবাদক শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু এম্, এ. এবং বেঙ্গলগবর্ণমেণ্টের পুস্তকালয়াধ্যক্ষ রায়বাহাদুর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রচন্দ্রশাস্ত্রী এম্, এ. মহোদয়গণ পরিদৃষ্ট জনপদবাসীদের আচার ব্যবহার ও সভ্যতার বিষয় অধিক পরিমাণে বর্ণন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের যুক্তিযুক্ত পরামর্শ অনুসারে এবার মধ্যভারতবর্ষ ও দক্ষিণাপথবাসী নানাজাতির কৌতুকাবহ আচার ব্যবহারের বিষয় অধিক পরিমাণে লিপিবদ্ধ করিলাম।

গতবার নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এত সত্বর এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল যে, "নোটবহি" পর্য্যন্ত দেখিবার অবসর হয় নাই। তজ্জন্য পর্য্যটন-কালের শকাব্দ এবং তারিখ ও দুই একটী ঘটনার বর্ণনে ভুল হইয়াছিল। এ বার যথাশক্তি উহা সংশোধিত করিলাম। পরিশেষে কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করিতেছি যে, দেশীয় রাজ্যাদির বর্ণনস্থলে হণ্টারসাহেবের সঙ্কলিত "ইম্পিরিয়েল্-গেজেট" ও "বম্বে-গেজেটিয়ার্" হইতে কোন কোন স্থানে সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি এবং মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-জাতির ইতিবৃত্ত লেখার সময় সাহিত্যসংসারে সুপরিচিত হালিসহর-নিবাসী পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত "দাক্ষিণাত্য-ব্রাহ্মণ" শীর্ষক প্রবন্ধের মত স্থানে স্থানে গ্রহণ করিয়াছি। আর এক জনের নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা নিতান্ত আবশ্যক। তিনি আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু প্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর। দেউস্কর মহাশয়, মহারাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব অধিবাসী এবং মরাঠী সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন, সুতরাং এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে প্রবৃত্ত হইয়া মহারাষ্ট্র-সম্বন্ধে আমি যখন যে প্রশ্ন করিয়াছি, তিনি তৎক্ষণাৎ উহার মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন এবং সময়ে সময়ে দুর্ল্লভ গ্রন্থাদি প্রদান করিয়া আমার সাহায্য করিয়াছেন। অতএব তাঁহার কৃত উপকার অনেক দিন আমার স্মৃতিপথে অঙ্কিত থাকিবে। এই গ্রন্থে যে কয়টী চিত্র সন্নিবেশিত হইয়াছে, উহার ফটো বম্বের প্রসিদ্ধ ফটোগ্রাফার্ রাজা দীনদয়ালের বিপণি হইতে আনীত হইয়াছে। আর ইণ্ডিয়ান্-আর্টস্কুলের অধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মন্মথ-নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতি উহার ব্লক্ প্রস্তুত ও মুদ্রণের ভার

অর্পিত হইয়াছিল। তাঁহার চিত্রকলায় নৈপুণ্য ও ক্ষিপ্রকারিতা সন্দর্শনে আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি।

অনেকে দক্ষিণাপথ-ভ্রমণের প্রথম সংস্করণ পাঠ করিয়া বিজ্ঞাপিত "উত্তরাপথ-ভ্রমণে"র জন্য আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। আমি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে সেই সকল বাঙ্গালা সাহিত্যানুরাগী মহাত্মাদিগকে জানাইতেছি যে, যাহাদের অন্য উপায়ে জীবিকা সংগ্রহ করিয়া সাহিত্য-চর্চ্চা করিতে হয়, তাহাদের সময় নিতান্ত সংক্ষিপ্ত। নিয়মিত রূপে অধ্যাপনা ও "শঙ্করাচার্য্য-চরিত" নামক একখানি জীবনচরিত গ্রন্থ প্রণয়ন এবং অন্যান্য প্রবন্ধ রচনায় ব্যস্ত থাকায় এপর্য্যন্ত উহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। আমার "নোট-বহিতে" সমস্তই সংগৃহীত আছে, কিছু সময় পাইলেই আমি উক্ত পুস্তক প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাদের হস্তে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইব। এবারও যথেষ্ট সময়ের অভাবে ভালরূপ দেখিতে না পারায় দুই একটী ভুল রহিয়া গেল, পাঠকগণ দয়া করিয়া উহা সংশোধন করিয়া লইবেন।

কলিকাতা
রাজকীয় হিন্দু-বিদ্যালয়।
২৫শে আষাঢ়, শকাব্দ ১৮২৯।

নিবেদক—
শ্রীশরচ্চন্দ্রশর্ম্মা।

৪১।

সূচীপত্র।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবম পরিচ্ছেদ।

দশম পরিচ্ছেদ।



শ্রীশরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী।

দক্ষিণাপথ-ভ্রমণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কলিকাতা হইতে যাত্রা।

১৮১৫ শক * অতীতপ্রায়। এ বৎসর সাময়িক ব্যাধির প্রভাবে কলিকাতার অধিবাসিগণ নিতান্ত শঙ্কিত। গবর্মেণ্ট-কলেজ, স্কুল্ ব্যতীত স্থানীয় অন্যান্য বিদ্যালয় ও গ্রীষ্মাবকাশ উপলক্ষে চৈত্র মাসের শেষেই দীর্ঘকালের জন্য বন্ধ হইল। শিক্ষক ছাত্র সকলেই প্রায় কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গমন করিতে লাগিলেন। আমিও ২৬ শে চৈত্র (৮ই এপ্রেল) রবিবার সায়ংকালে বাসা হইতে যাত্রা করিলাম। রাত্রি নয়টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের সময় হাওড়া-ষ্টেসনে যাত্রি-গাড়ীতে আরোহণ করিয়া দুইটার সময় "আসানসোল্" ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম।

"আসানসোল্" ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-রেলপথের একটী প্রসিদ্ধ ষ্টেসন। এখান হইতে বেঙ্গল-নাগপুর-রেলপথ আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানটী রাণীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত। এখান হইতে কলিকাতা একশত বত্রিশ মাইল। আসানসোলে অনেক কয়লার খনি আছে। কয়লার ব্যবসায়ের জন্য বহুসংখ্যক ফিরিঙ্গী ও ইংরেজ এখানে বাস করেন। ঐ সকল শ্বেতাঙ্গ নর নারীদের আবাস-

* ইংরাজী ১৮১৪ খ্রীঃ।

বাঙ্গালোগুলি দেখিতে অতি সুন্দর। এতদ্ভিন্ন মধ্য-ইংরেজীবিদ্যালয়, দাতব্য-ঔষধালয় ও ক্ষুদ্র একটী বাজার আছে। এখানে অধিবাসীর সংখ্যা তত অধিক নহে। যে গভীর রাত্রে অবতরণ করিলাম, তখন ষ্টেসন ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইবার সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং যে কোন প্রকারে ষ্টেসনেই অবস্থান করিতে হইল। আমরা অনেকগুলি আরোহী একত্র নামিলাম। তন্মধ্যে একটী বাঙ্গালী আরোহী, তাঁহার কম্বল ও বিছানার চাদর পাতিয়া বিস্তৃত এক শয্যা প্রস্তুত করিলেন এবং সেই ভদ্রলোকটী ও আমি সেই শয্যায় শয়ন করিয়া রাত্রির অবশিষ্ট অংশ যাপন করিলাম।

রাত্রি প্রভাত হইলে কিঞ্চিৎ-দূরস্থ বাজারের একটী দোকানে আশ্রয় লইলাম। আসানসোলে অত্যন্ত জলকষ্ট। প্রান্তর-মধ্যস্থ একটী পুষ্করিণীতে গিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন ও স্নান, সন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া আসিলাম এবং রন্ধন ভোজন শেষ হইলে দশটার সময় পুনরায় ষ্টেসনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ষ্টেসনে অত্যন্ত জনতা। আরোহীদের বিশ্রামের জন্যও পর্য্যাপ্ত স্থান নাই। দুইটা বাজিলে গাড়ী আসিল। সে দিন মক্কাযাত্রীর এত ভিড় যে, গাড়ীতে উঠা একরূপ দুর্ঘট হইয়া উঠিল। একটী গাড়ীতে কয়েকটী বাঙ্গালীবাবু ছিলেন, তাঁহারা আমাকে গাড়ীতে উঠিবার জন্য ছুটাছুটী করিতে দেখিয়া তাঁহাদের গাড়ীতে ডাকিয়া লইলেন। ইহাদের মধ্যে দুইটী বাবু বেশ শিক্ষিত। তাঁহারা আমার মস্তকে ক্ষুদ্র টিকী ও পায়ে চটী জুতা দেখিয়াই সংস্কৃত-ভাষার প্রসঙ্গ উপস্থিত করিলেন। ক্রমে আমরা কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ, বাণভট্ট-প্রভৃতি কবিগণের কাব্যের আলোচনা করিতে করিতে মহানন্দে যাইতে লাগিলাম। অবশেষে তাঁহাদের সহিত আমার এত সৌহৃদ্য জন্মিল যে, তাঁহারা

আমাকে একাকী গাড়ীতে রাখিয়া যাইবেন বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। আমরা সর্ব্বসমেত আট জন বাঙ্গালী একটী কামরায় ছিলাম। তন্মধ্যে একজন পুরুলিয়া ষ্টেসনে নামিলেন। আমি এই বাঙ্গালী ভ্রাতাদের এতদূর প্রিয় হইয়াছিলাম যে, প্রত্যেকেই নামিবার সময়, যাঁহারা গাড়ীতে থাকিলেন, তাঁহাদিগকে বলিয়া গেলেন "মক্কাযাত্রীদের উৎপাতে ইহার যাহাতে ক্লেশ না হয়, আপনারা যেন তাহার বন্দোবস্ত করিয়া যান্"।

ক্রমে ক্রমে সকলেই নামিয়া গেলেন্। আমরা তিন জনমাত্র একটী কামরায় থাকিলাম। এক একটী ষ্টেসনে যেই গাড়ী থামে, অমনি অপর কামরার লোকেরা উহাতে উঠিবার জন্য দল বাধিয়া দাঁড়ায়। অনেক বুঝাইয়া আমরা তাহাদিগকে ফিরাইয়া দিতে লাগিলাম। বস্তুতঃ তাহাদেরও বড় কষ্ট হইতেছিল, সে দিন আরোহীর সংখ্যা এত অধিক যে, অনেকে গাড়ীর মধ্যে দাঁড়াইয়া যাইতেছিল। কয়েক ঘন্টার পর একটী ষ্টেসনের নিকটে গিয়া সঙ্গী একটী বাবু বলিলেন "আমাদের গন্তব্য স্থান সন্নিহিত, অতএব এখনই আপনার নিরাপদে যাইবার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য"।

গাড়ী থামিলেই দেখা গেল, সেখানকার ষ্টেসন-মাষ্টার ও বুকিং-ক্লার্ক বাঙ্গালী। আমাদের দেখিয়া আপন ইচ্ছাতেই তাঁহারা গাড়ীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। দুই চারিটি কথার পর, আমাদের মনোগত ভাব জানাইলাম। ষ্টেসনমাষ্টার বলিলেন "আপনার কোথাকার টিকিট?" আমি বলিলাম "নাগপুরের"। তিনি সে দিন নামিয়া থাকিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম "আমার অবকাশ কালটা বৃথা নষ্ট করিতে চাহি না, সুতরাং আমি আর এখানে অপেক্ষা করিব না, আপনি অনুগ্রহ করিয়া

যাহাতে নাগপুর পর্য্যন্ত নির্ব্বিঘ্নে পৌছিতে পারি, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিন্"। ষ্টেসন-মাষ্টারটী অতিসজ্জন। তিনি তৎক্ষণাৎ কয়েকটী নাগপুরী ভদ্র লোককে আমাদের গাড়ীতে আনিয়া দিলেন, সুতরাং আমাদের মকাযাত্রীর উপদ্রবের আশঙ্কা বিদূরিত হইল। তাহার পর, একটী ষ্টেসনে আমার সঙ্গী দুইটী বাঙ্গালী নামিলেন। আমি তাঁহাদের বিদায় দিয়া একপার্শ্বে আমার ব্যাগ্‌টীর উপর অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় অদৃষ্টপূর্ব্ব জনপদের প্রান্তর, গ্রাম, নগর সকল নিরীক্ষণ করিতে করিতে যাইতে লাগিলাম।

সন্ধ্যা সমাগত প্রায়। সূর্য্যদেব লোহিতবর্ণ গোলকের ন্যায় মন্দ মন্দ কিরণ বিকীর্ণ করিতে করিতে অস্তমিত হইতেছেন। গম্ভীর-আকৃতি পর্ব্বতমালা যেন উন্নত-শিরে আকাশের প্রান্তদেশ অবলোকন করিতেছে। স্থানে স্থানে নিবিড় শালবন। পর্ব্বতের কোন অংশে বাঁশঝাড়গুলি পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। একটী পর্ব্বতের গায়ে হাট বসিয়াছে। পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় দলে দলে সাঁওতালগণ সেই হাট হইতে গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিতেছে। পর্ব্বতের উপত্যকাবাসী স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকারা তাহাদের কুটীরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নির্নিমেষে বাষ্প-শকটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আছে। ক্রমে আকাশে একটী একটী নক্ষত্র দেখা দিতে লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যে চন্দ্রকিরণে সমুদয় আরণ্যভূভাগ আলোকিত হইয়া গেল। নাগপুরী সঙ্গীরা পরস্পর গল্পে মাতিয়া উঠিয়াছেন। তাঁহাদের সেই স্বদেশীয় গল্পের অর্দ্ধোচ্চারিত ভাষা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অবোধ্য, সুতরাং তাঁহাদের হাস্য কিম্বা করতালীর কারণ অনুভব না করিতে পারিয়া নীরবে বসিয়া কাল যাপন করিতে লাগিলাম। ষ্টেসনমাষ্টার বাবু, আমাকে যত্নপূর্ব্বক লইয়া যাইবার

জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন তজ্জন্য তাঁহারা মধ্যে মধ্যে আমার তত্ত্ব লইতে লাগিলেন।

রাত্রি অধিক হইল। নিদ্রাবেশে কিছু চক্ষে দেখিতে পাইতেছি-না। তখন নাগপুরী সঙ্গীদের অনুরোধে ব্যাগে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলাম। নিশা অবসানে বিলাসপুর ষ্টেসনে গাড়ী থামিল। বিলাস-পুর একটী ক্ষুদ্র সহর। এখানে খাদ্য দ্রব্য পাওয়া যায়। যাত্রীরা নিজ নিজ অভিলষিত খাদ্য ক্রয়ে নিযুক্ত হইল। আমি এই অবসরে নামিয়া হস্ত মুখ ধৌত করিয়া লইলাম। তাহার পর পূর্ব্বাহ্ণ দশটার সময় রায়পুর-ষ্টেসনে শকট হইতে অবতরণ করিলাম। ষ্টেসন হইতে সহর প্রায় অর্দ্ধ মাইল্ দূরে। আমি এখানে নামিয়া অত্রত্য উকীল শ্রীযুক্ত রায় ভূতনাথ দে বাহাদুর এম্ এ, বি, এল্ মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। ভূতনাথবাবু অতি-শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি, তাঁহার সমাদরে আমি পরমপরিতোষ লাভ করিয়াছিলাম। তিনি রায়পুর মিউনিসিপালিটীর ভাইস্‌চেয়ার-ম্যান্। তাঁহার ঐকান্তিক পরিশ্রমে ও এই প্রদেশের একটী রাজার অর্থসাহায্যে এখানে জলের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভূতনাথ বাবু এই সাধু কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ গবর্মেণ্ট হইতে "রায়বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। রায়পুর সহরটী ক্ষুদ্র হইলেও ইহার বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। প্রথম ইহার ইতিহাস সংক্ষেপে ব্যক্ত করিতেছি।

রায়পুর।

ভারতবর্ষে কোশলরাজ্য দুইটী। একটী প্রাক্‌কোশল বা পূর্ব্ব-কোশল, অপরটির নাম উত্তরকোশল। পূর্ব্বকোশল কাহার কাহারও

মতে দক্ষিণকোশল নামে ও অভিহিত। এই দক্ষিণকোশলের রাজকন্যা কৌশল্যাই উত্তরকোশলের অধিপতি মহারাজ দশরথের মহিষী ছিলেন। মহাভারতপাঠে জানা যায়, পঞ্চম পাণ্ডব সহদেব দক্ষিণদিকে গিয়া পূর্ব্বকোশলের রাজাদিগকে জয় করিয়াছিলেন*। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে—দেবরক্ষিত নামক একজন পরাক্রান্ত নরপতি দক্ষিণকোশলের অধীশ্বর ছিলেন। মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের উৎকীর্ণ শিলালিপিতে কোশলরাজ্যের অধিপতি রাজা মহেন্দ্রের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে সুপ্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক হিউএন্‌সাঙ্‌ কোশলরাজ্যে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন ;—"কলিঙ্গ রাজ্য হইতে প্রায় দেড়শত ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে গমন করিলে কোসলজনপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার প্রান্তসীমার চতুর্দ্দিক্ পর্ব্বতমালা ও অরণ্যানী-পরিব্যাপ্ত এবং ভূমি উর্ব্বরা ও প্রভূতশস্যশালিনী"। চীনদেশীয় অপর পণ্ডিত ঈশীং লিখিয়াছেন ;—"সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জ্জুন "সুহৃদ্‌লেখ" নামক একখানি উপদেশ-পূর্ণ কাব্য লিখিয়া দক্ষিণ-কোশলের রাজা সাতবাহনের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন"। কোসলাধিপতি ভবগুপ্তের উৎকীর্ণ শিলালিপি পাঠে জানা যায়, "উৎকল ও কলিঙ্গ প্রদেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল এবং উৎকলের কেশরীরাজ তাঁহাকে করপ্রদান করিতেছেন" †। প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহামের

* কোসলাধিপতিঞ্চৈব তথা বেণ্বতটাধিপম্।
কান্তারকাংশ্চ সমরে তথা প্রাক্‌কোশলান্ নৃপান্ ॥
(মহাভারত—সভাপর্ব্ব ৩০ অধ্যায়:)

† (Journ. Roy, A S. Soc. N. S. Vol. VI. P. 260).

মতে ;—"মহানদী ও উহার শাখার উত্তরবর্ত্তী সমুদায় উপত্যকাই দক্ষিণকোশল বা মহাকোশল নামে খ্যাত ছিল"। চীনপরিব্রাজক, দক্ষিণকোশলের যে রাজধানীর বর্ণন করিয়াছেন, কেহ কেহ বলেন ;—"প্রাচীর-বেষ্টিত বর্ত্তমান "বান্দা" নামক নগরেই সেই রাজধানী ছিল"। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন "বর্ত্তমান "ভাণ্ডক" নামক স্থানেই প্রাচীন রাজধানী বিদ্যমান ছিল" *। এখন ইহার নামান্তর হইয়াছে। অধুনা সেই অতিপ্রাচীন দক্ষিণ-কোশল রাজ্য ছত্রিশগড় নামে অভিহিত হইয়া থাকে †। ইহা মধ্যভারতের অন্তর্গত একটী বিভাগ। রায়পুর বিলাসপুর ও সম্বলপুর এই তিনটী জেলা লইয়া এই বিভাগ গঠিত হইয়াছে। রায়পুর জেলার হেড্-কোয়াটার্ রায়পুর। ইহা একটী ক্ষুদ্র নগরী। এখানে ডেপুটী কমিসনার্ বাস করেন এবং ফৌজদারী কোর্ট, দেওয়ানি-কোর্ট ও অন্যান্য কার্য্যালয় আছে। এই নগরে কয়েকটী অতিসুদৃশ্য বাঙ্গলো আছে। আর অধিকাংশ রাজপথ ও শ্বেতাঙ্গগণের আবাস-গৃহগুলি লোহিতবর্ণের পুষ্পরাজিতে সুশোভিত। এখানে ধান্য, গোধূম, সর্ষপ-প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় ও গব্যঘৃত এবং দুগ্ধাদিও বেশ সুলভ। উৎকল, মহারাষ্ট্র, বিহার ও বাঙ্গালা দেশ হইতে আসিয়া অনেক ভদ্রলোক

---

* Cunningham's Arch. Sur. Reports, Nol. XVII. P. 68.)

† ছত্রিশগড়ে ইংরেজাধিকৃত স্থান ব্যতীত কয়েকটী ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যও আছে। রায়পুর জেলায় ছুইকাদান, কাঙ্কেড়, রায়গড়, নন্দগাঁও। বিলাসপুর জেলায় কোরারধা, শক্তি। সম্বলপুর জেলায় কালাহাণ্ডী, সারণগড়, পাটনা, শোণপুর, রাইরাখোল ও বামড়া। এই সকল রাজ্যের রাজন্যগণ নিজ নিজ রাজ্য মধ্যে রাজস্ব-গ্রহণ ও ফৌজদারী, দেওয়ানি বিচারাদি স্বয়ংই সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

বিষয় কার্য্যোপলক্ষে এখানে বাস করিতেছেন। এ দেশের আদিম অধিবাসীরা প্রায়ই অশিক্ষিত। এখানকার ভাষা, উড়িয়া ও হিন্দী-মিশ্রিত। আমি দুই দিন ভূতনাথ বাবুর বাসায় অবস্থিতি করিলাম। প্রত্যহ সায়ংকালে ভূতনাথবাবুর সহিত ভগবদ্-গীতার আলোচনা করা যাইত।

৩০শে চৈত্র বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ দশটার সময় মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপ্ত করিয়া রায়পুর ষ্টেসনে পুনরায় বাষ্পশকটে আরোহণ করিলাম। রায়পুর নগর অতিক্রম করিলেই কুমারী নাম্নী একটী পার্ব্বত্য-নদী আমাদের নয়নপথে পতিত হইল। এই বিমলসলিলা স্রোতস্বিনী মধ্যাহ্ন-সূর্য্যকিরণসম্পর্কে রজতরেখার ন্যায় শোভা বিস্তার করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে। ইহার পর আমরা দেবাড়ী ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেসনের পূর্ব্বভাগে দেবাড়ীনাম্নী একটী পার্ব্বত্য-নদী উত্তরভাগস্থ পর্ব্বতমালা হইতে বেগে নির্গত হইতেছে। ঐ নদীর বক্ষে রেল-সেতু। উহার দক্ষিণে নদীর স্রোত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রবাহিত। উক্ত বিভিন্নপথগামী স্রোতোদ্বয়ের মধ্যে ক্ষুদ্র একটী পর্ব্বত। তাহার উপরিভাগে প্রাচীন প্রস্তরময় মন্দিরে সুন্দর নৃসিংহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ঐ স্থানটীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি-মনোহর। দেখিলে ইচ্ছা হয়, শকট হইতে অবতরণ করিয়া ঐ সুশীতল-সমীর-পরিষেবিত বিজন দেবমন্দিরে কিছু কাল বিশ্রাম করিয়া হৃদয় পবিত্র করি। রেলপথের উভয় পার্শ্ব বংশকানন ও নিবিড় শালবৃক্ষে সমাবৃত। এই সকল পার্ব্বত্য ভূভাগ দেখিতে অতিগম্ভীর। অপরাহ্ণে একটী ষ্টেসনে শকট থামিল। ইহার চতুর্দ্দিকে লোকালয় নাই, কেবল দুর্গম অরণ্যানী। বোধ হয় উহার অনতিদূরে সাঁওতালগণের বসতি আছে। সেই সকল

অরণ্যবাসিনী সাঁওতাল-রমণী সুমিষ্ট সান্তারিয়া* ফল ও ফুটী বিক্রয়ের জন্য আসিতেছিল, প্রথম পুলিস-প্রহরিগণ তাহাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল, ট্রেণ ছাড়িবার কিছু পূর্ব্বে ছাড়িয়া দিল। শেষে তাহারা তাড়াতাড়ী বিক্রয় করিয়া যাহা পাইল, উহা ও পুলিস্ প্রহরীরা কাড়িয়া লইল, সেই দুর্ভাগ্য সাঁওতাল-রমণীদের রোদনে হৃদয় বিষাদে পূর্ণ হইল। ঐ স্থানটী যেরূপ তাহাতে কোন মনস্বী ব্যক্তি ইচ্ছা করিলেও সহজে উহার প্রতীকার করিতে পারেন না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দেখা গেল, রেলপথ একটী উন্নত পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া গিয়াছে। যখন অন্ধকারময় পর্ব্বত-রন্ধ্রে শকটমালা প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন বোধ হইল যেন পিপীলিকাশ্রেণী বল্মীকবিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে। কিছুদূর অগ্রসর হইলেই পর্ব্বতরন্ধ্র-প্রবিষ্ট শকটারোহিগণ সমস্বরে ভগবানের নামোচ্চারণ করিতে লাগিল। ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত। ছয়টার সময় রেলশকট নাগপুর নগরে উপস্থিত হইল। আমি ষ্টেসনে নামিয়া এক্কা গাড়ীতে আরোহণপূর্ব্বক অত্রত্য বাঙ্গালী ডাক্তার শ্রীযুক্ত তারানারায়ণ রায় এম্-বি, মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। উক্ত ডাক্তারবাবুর স্বাভাবিক সৌজন্য ও সমাদরে আমি পরম আপ্যায়িত হইয়াছিলাম। আহারান্তে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তারানারায়ণ বাবুর সহিত নানাবিষয়ক গল্পে অতিবাহিত করিয়া শয়ন করিলাম। পরদিন প্রাতঃকালে নাগপুরের দৃশ্যগুলি সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইলাম।

---

* কমলালেবুর ন্যায় এক প্রকার সুমিষ্ট ফলকে এ দেশের লোকে সান্তারিয়া ফল বলে।

নাগপুরের বৃত্তান্ত।

বাল্মীকি-রামায়ণে বর্ণিত দণ্ডকারণ্যের একাংশ এখন নাগপুর নামে অভিহিত। পুরাকালে এই স্থান হইতে গোদাবরীতীরস্থ পঞ্চবটী পর্য্যন্ত উত্তর-দক্ষিণব্যাপী বিস্তৃত ভূভাগ দণ্ডকারণ্য ও জনস্থান নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মহর্ষি বাল্মীকি লিখিয়াছেন ;—সূর্য্য-বংশীয় ইক্ষাকুনৃপতির অন্যতম পুত্র দণ্ড বলপূর্ব্বক শুক্রাচার্য্যের কন্যা অরজার ধর্ম্মনষ্ট করেন। তাহাতে শুক্রাচার্য্য কুপিত হইয়া অভিসম্পাত করেন। তিনি বলেন ;—এই রাজা সপরিবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এই রাজ্যের স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণিগণের ক্ষয় হইবে। সপ্তরাত্রি মধ্যে বন ও আশ্রমাদির সহিত এই জনপদ ধূলিরাশিতে পরিণত হইবে। তিনি ক্রোধান্ধ হইয়া আশ্রমবাসীদিগকে বলেন "তোমরা এই জনপদের প্রান্তভাগে গিয়া অবস্থান কর"। বিন্ধ্যশৈলের সানুদেশে অবস্থিত সেই দণ্ডের রাজ্য ব্রহ্মশাপে ভস্মসাৎ হইয়া "দণ্ডকারণ্য" নামে পরিচিত হয়। যে স্থানে গিয়া তপস্বীরা বাস করিয়াছিলেন তাহা "জন-স্থান" নামে খ্যাতি লাভ করে" *। এখানকার লোকেরও বিশ্বাস ইহা সেই প্রাচীন দণ্ডকারণ্য। কারণ এখনও ব্রাহ্মণেরা কোন

---

* সপ্তরাত্রেণ রাজাসৌ সভৃত্যবলবাহনঃ।
পাপকর্ম্মসমাচারো বধং প্রাপ্স্যতি দুর্ম্মতিঃ॥
* * * *
সপ্তাহাদ্ভস্মসাদ্ভূতঃ সচাপি ব্রহ্মতেজসা।
তস্য দণ্ডস্য বিষয়ো বিন্ধ্যশৈলস্য সানুষু॥
তদা প্রভৃতি কাকুৎস্থো দণ্ডকারণ্যমুচ্যতে।
তপস্বিনঃ স্থিতা যত্র তজ্জনস্থানমুচ্যতে॥ (বাল্মীকিরামায়ণম্)

বৈধ কার্য্যের সঙ্কল্পকালে "দণ্ডকারণ্যান্তর্গত-প্রদেশে" এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

এই নগরের নাম নাগপুর কেন হইল ? উহা জিজ্ঞাসা করায় একজন বলিলেন "নাগনদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া এই নগর নাগপুরনামে খ্যাত"। বস্তুতঃ নাগনদীনামে একটী অরণ্যচারিণী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী ইহার পূর্ব্বভাগস্থ রামটেক্ পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া নাগপুরের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। কেহ কেহ বলেন "নাগবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের * রাজধানী ছিল বলিয়া ইহা নাগপুর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে"। প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে ;— "আর্য্যজাতির ভারতবর্ষে আগমনের পূর্ব্বে নাগজাতি এই মহাদেশের অনেক স্থান করায়ত্ত করিয়াছিল। ইহারা যখন ভারতবর্ষে প্রভুত্ব করে, তখন এখানকার আদিমনিবাসিগণ ইহাদিগকেই প্রভু বলিয়া স্বীকার করিত"। বস্তুতঃ আর্য্যদের সঙ্গে যে নাগগণের সংঘর্ষ হইয়াছিল, প্রাচীন গ্রন্থে উহার অনেক উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যমুনাহ্রদে শ্রীকৃষ্ণ যে, কালিয়নাগকে দমন করিয়াছিলেন, উহার প্রকৃত অর্থ এই যে— তিনি ঐ দেশবাসী কোন পরাক্রান্ত নাগরাজকে বাহুবলে শাসন করিয়াছিলেন। আর পরীক্ষিতের নাগদংশন ও কোন নাগভূপতি কর্ত্তৃক পরাভব ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। শেষে নাগজাতি আর্য্যজাতিরসহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। স্বয়ং দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ নাগরাজভগিনী জাম্ববতীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, অর্জ্জুনও দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া নাগরাজকন্যা উলুপা ও চিত্রাঙ্গদার বিবাহ করেন। বুদ্ধদেব যে অনেক নাগরাজকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন,

* প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে—নাগজাতি পরাক্রান্ত—শকজাতির একটী শাখা।

উহা "ললিতবিস্তর" ও অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃত বৌদ্ধ-গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। কালিদাসের রঘুবংশ পাঠে জানা যায়, অযোধ্যাধিপতি—ভগবান্ রামের জ্যেষ্ঠপুত্র কুশ কুশাবতী হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া নাগরাজ-ভগিনী কুমুদ্বতীর করগ্রহণ করিয়াছিলেন। আর উক্ত নাগজাতি যে মধ্যভারতের অন্যান্য স্থানে রাজত্ব করিয়াছিল, প্রাচীন শিলালিপি ও গ্রন্থাদি পাঠে উহা বিলক্ষণ অবগত হওয়া যায়। নাগপুর নাগজাতির প্রাচীন রাজধানী হইলেও এখন উহার একমাত্র নাম-সাদৃশ্য ভিন্ন অন্য কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান নাই। নাগগণের পর গৌলী নামক এক শ্রেণীর ভীল নাগপুর প্রদেশ শাসন করে। প্রদেশীয় সংগীতে গৌলীগণের অনেক বীরত্ব কাহিনী বর্ণিত আছে। গৌলীগণের পর এই প্রদেশ গোণ্ডজাতির অধিকারভুক্ত হয়। জটবানামক রাজগোণ্ডজাতীয় এক রাজা এই প্রদেশ শাসন করেন। ইনিই ভীমগড় পর্ব্বতের দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ইহার নির্ম্মিত আরও কতকগুলি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৪২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই রাজ্য যথাক্রমে কতিপয় মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীন থাকে। তাহার পর ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে বুরনশা নামক একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা মহারাষ্ট্রযোদ্ধৃসমিতির অন্যতম নেতা রঘুজী ভোঁস্লের সাহায্যে স্বীয় ভ্রাতার সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তাহার পর এই রাজ্য রঘুজী ও তদীয় পুত্র জানোজীর হস্তগত হয়। অনেক দিন যাবৎ এই ভোঁস্লেবংশীয় রাজগণই এই রাজ্য শাসন করেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ভোঁস্লেবংশীয় দ্বিতীয় রঘুজীর পুত্র তৃতীয় রঘুজী একটী শিশুসন্তান রাখিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। শাস্ত্রানুসারে রাজজননীই সিংহাসনের উত্তরাধিকারিণী হন, তজ্জন্য ইংরেজ-

রেসিডেণ্ট তাঁহাকে রাজ্যশাসনের বন্দোবস্ত করিবার জন্য আদেশ করেন। তখন রাজমাতা পুত্রশোকে এতই ব্যাকুলা ছিলেন যে, তিনি তাঁহার পত্রের উত্তর পর্য্যন্ত প্রেরণ করেন নাই। এ দিকে শাসনকর্ত্তার অভাবে রাজ্য উচ্ছৃঙ্খল হইতেছে দেখিয়া, রেসিডেণ্ট ইংরেজপক্ষের শান্তি-রক্ষকের প্রতি শান্তিরক্ষার ভার অর্পণ করেন। তদবধি এই রাজ্য ইংরেজ-রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে নাগপুরে কমিসনার্ নিযুক্ত হইয়াছেন। এখন রাজ্যাধিকার-বঞ্চিত ভোস্লেবংশীয় রাজার দুইটী পুত্র বিদ্যমান আছেন; ইহারা ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট হইতে মাসিক কয়েক সহস্র মুদ্রা ও কয়েকখানি গ্রামের রাজস্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নাগপুরে দ্রষ্টব্য পদার্থ অনেক আছে। ইহার ঈশান কোণে প্রায় তিন চারি ক্রোশ দূরে কালিদাসের বর্ণিত সেই প্রসিদ্ধ রামগিরি। এখন ঐ স্থানকে "রামটেক্" বলে। ঐ দেশীয় ভাষায় টেক্ শব্দের অর্থ পর্ব্বত। কথিত আছে;—কুবেরের অভিশাপে অলকানগরী হইতে রামগিরিতে নির্ব্বাসিত যক্ষ প্রিয়াবিরহে অধীর হইয়া অতিকষ্টে আটমাস কাটাইয়াছিল; কিন্তু আষাঢ় মাসের প্রথমে আকাশে নূতন মেঘ উদিত দেখিয়া আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিল না, তাহার প্রিয়তমার সেই সুন্দর মুখের স্মৃতি তাহাকে নিতান্ত বিচলিত করিয়া তুলিল। মেঘ যে কতকগুলি বাষ্পের সমষ্টিমাত্র তাহা সে ভাবিবার অবসর পাইল না, কেননা সে তখন প্রিয়াবিরহে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত। মেঘকে দক্ষিণ হইতে উত্তরে যাইতে দেখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাহার প্রিয়ার নিকট সংবাদ লইয়া যাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিল। যক্ষ যেস্থলে দাঁড়াইয়া মেঘকে আহ্বান করিয়া ছিল সেই রামগিরিতে আসিলে কালিদাসের কবিতাকে

২

মূর্ত্তিমতী দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ছায়াপ্রধান তরুরাজি ও পবিত্র জলাশয় সকল অদ্যাপি দর্শকের চিত্তহরণ করিয়া থাকে।*

এই নগরমধ্যে জমাতলাও, আমঝারি ও তেলিঙ্গখরি নামে তিনটী জলাশয় আছে। ঐ সকল জলাশয়ের জল কাক-চক্ষুর ন্যায় অত্যন্ত স্বচ্ছ। আর মহারাজবাগ, তুলসীবাগ নামক উদ্যান দুইটী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের আদর্শ। গ্রীষ্মকালে এই দুই উপবনের বৃক্ষশ্রেণী নানাবিধ কুসুমরাজিতে সুশোভিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। উদ্যানমধ্যস্থ জলাশয়গুলিও অত্যন্ত মনোহর। পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে এই সকল উপবনে ভ্রমণ করিতে আসিলে কোকিল, পাপিয়া প্রভৃতি বন-বিহঙ্গের মধুর কাকলীতে হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। নগরীর নৈঋত-কোণে ক্ষুদ্র একটী পর্ব্বতের উপরে ভোঁস্লে-নৃপতিগণের দুর্গ বিরাজমান। এই দুর্গটী অতিশয় সুদৃঢ়। এখন এখানে ইংরেজ-সৈন্যেরা বাস করে। আর এখানকার চিপ-কোর্ট ও অন্যান্য রাজ-কার্য্যালয় নাগনদীর তীরে অবস্থিত। নাগপুর নগরের চতুর্দ্দিকেই দূরে দূরে পর্ব্বতমালা বিদ্যমান। পার্ব্বত্য-ভূমিতে অবস্থিতিপ্রযুক্ত এই নগরটী সমতল নহে। কোন স্থান উন্নত, ও কোন স্থান নিম্ন। এই নগরে ইষ্টকালয় ও পাষাণনির্ম্মিত সৌধ অপেক্ষা খোলার ঘরই অধিক, কিন্তু নির্ম্মাণ-পরিপাটীতে খোলার বাড়ীগুলিও বেশ সুন্দর দেখায়। নগরের নৈঋত কোণে একটী সুবৃহৎ দীর্ঘিকা আছে। সময়ে সময়ে বায়ুবেগে উত্তাল-তরঙ্গমালা উত্থিত হওয়ায় উহা সাগরের ন্যায় আকার ধারণ করে। তীরে অনেকগুলি শিব-মন্দির ও দেবালয় প্রতিষ্ঠিত। অনেক সাধু

* "মেঘদূত" পাঠ করুন।

সন্ন্যাসী ইহার তটদেশে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বসিয়া আছেন, এবং মহাদেবের নামে গঞ্জিকা সেবন করিয়া সাধুতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছেন। নগরের অধিকাংশ গৃহস্থই এই জলাশয়ের জলে স্নানাদি সম্পন্ন করেন। পূর্ব্বাহ্নে ও অপরাহ্নে হাস্যমুখী পুরসুন্দরীগণের পরস্পর বিশ্রম্ভালাপে স্নানঘাটগুলি মুখরিত হইয়া উঠে।

১৮১৬ শকাব্দের ১লা বৈশাখ এখানে নূতন "টাউনহল্" প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটী মহতী সভার অধিবেশন হয়। পূর্ব্বোক্ত ডাক্তার-বাবুর সহিত সভায় গিয়া দেখিলাম উক্ত সমিতিতে চিফ্ কমি-শনার্ ও বহুসংখ্যক শিক্ষিত ভদ্রলোকের সমাগম হইয়াছে। উহাতে এত দূর জনতা হইয়াছিল যে, বহুলোকের যত্নসত্ত্বে ও সভার কার্য্য আশানুরূপ শান্তিতে সম্পন্ন হইতে পারিল না। অবশেষে লোকের ভিড়ে কাষ্ঠাসনগুলি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। সভা হইতে প্রত্যাগমন-কালে স্থানীয় হিস্‌লপ্-কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত সদাশিব-জয়রাম এম্, এ. মহোদয়ের সহিত তাঁহার বাটীতে পরিচয় হইল। উক্ত পণ্ডিতের পূর্ব্বপুরুষগণ মহারাষ্ট্র দেশ হইতে আসিয়া নাগপুরে বাস করেন। পণ্ডিত সদাশিব-জয়রাম একজন কৃতবিদ্য পরোপকারী ও উন্নতস্বভাব ব্যক্তি। প্রায় দুই ঘণ্টাকাল সংস্কৃতভাষায় তাঁহার সহিত প্রত্নতত্ত্ব ও সংস্কৃত-সাহিত্য-সংক্রান্ত কথোপকথন হয়। উক্ত পণ্ডিতবরের সহিত আলাপ করিয়া আমি পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় পণ্ডিত সদাশিব-জয়রামের বাটীতে স্থানীয় মরিস্-কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কেশবগোপাল তামন্-কার এম্ এ. মহাশয়ের সহিত আলাপ হইল। পণ্ডিত কেশব-

গোপালও সংস্কৃত-ভাষায় বিবিধ শিষ্টতাপূর্ণ আলাপে আমাকে আপ্যায়িত করিলেন। পণ্ডিত সদাশিবজয়রাম ভোন্‌স্লে-বংশীয় রাজকুমারগণের গৃহশিক্ষক। তাঁহার সহিত রাজভবন সন্দর্শন করিবার জন্ত গমন করিলাম। ভোন্‌স্লে-নৃপতিগণের প্রাসাদ কৃষ্ণবর্ণ-পাষাণ-নির্ম্মিত এবং উহা নানাবিধ কারু-কার্য্যে মণ্ডিত। রাজবাটীর অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ কিন্তু গৃহগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রা-য়তন এবং গবাক্ষগুলি ছিদ্রবিশিষ্ট। এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় এই রাজভবনের যত্ন ও সমাদর নাই, সুতরাং সৌন্দর্য্যের অনেকটা অভাব ঘটিয়াছে;—"সূর্য্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্"। ভোন্‌স্লেবংশের এখন দুইটী রাজকুমার বিদ্যমান। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার গ্রীষ্ম-যাপনের নিমিত্ত নীলগিরিতে গমন করিয়াছেন। কনিষ্ঠ কুমার লক্ষ্মণরাও ভোন্‌স্লের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইঁহার বয়স পোনর ষোল বৎসরের অধিক নহে। ইনি সুশীল ও বিনয়ী। নাগপুরে বাঙ্গালী, মহারাষ্ট্রীয় এবং বিহারী লোকই অধিকাংশ রাজকর্ম্মচারী। ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, পারসী, শিখ, কবীরপন্থী, সৎনামী, য়িহুদী, খৃষ্টান, মুসলমান-প্রভৃতি সমুদয়ই বিদ্যমান। এ প্রদেশের প্রকৃত অধিবাসীদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও রাজ-পুতের সংখ্যা তত অধিক নহে। অধিকাংশই মরাঠা, কুড়্মী, গোণ্ড, তিলি, মালী, নাপিত, সূত্রধার, মহার, কোষ্টী, মেহরা, গবরী, ধিমার, বড়ই, বলিয়া, গদারিয়া ও গরুই জাতীয়লোক। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত জাতিসমূহের মধ্যে কুড়্মী ও গোণ্ড-জাতির সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইতিহাসের সহিত ইহাদের বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে বলিয়া নিম্নে এই দুই জাতির আচার ব্যবহারও সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইল।

কুড়্মী জাতি। কুড়্মী জাতি প্রধানতঃ কৃষিকর্ম্মোপজীবী। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি মনু এই জাতির কথা উল্লেখ করেন নাই; কিন্তু ইহারা এখন শূদ্রজাতির অন্তর্গত। ইহাদের সংখ্যা ও ক্ষমতা অল্প নহে। এদেশ ব্যতীত ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যায় বিস্তর কুড়্মীজাতির বাস। বিহারপ্রদেশে মৈথিলব্রাহ্মণ ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরহিত্য করেন। কিন্তু নাগপুরে কুড়্মীর ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্র। উড়ীষ্যার কুড়্মীরা কুক্কুট ও মূষিকের মাংস ভোজন ও মদ্যপান করে বলিয়া বিহার ও নাগপুরের কুড়্মীরা তাহাদিগের সহিত "রোটীব্যভার" ও "বেটীব্যভার" করে না। কুড়্মীজাতির মধ্যে বিবাহভঙ্গ ও বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে।

মহারাষ্ট্র গুজরাট্-প্রভৃতি প্রদেশে কুড়্মীজাতি কুণ্বীনামে খ্যাত। কুণ্বীরা তাহাদের উৎপত্তি বিষয়ে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়া থাকে;—একদিন হরপার্ব্বতী বনে বেড়াইতে বেড়াইতে একস্থানে উপস্থিত হন। মহাদেব পার্ব্বতীকে কোন্ নির্দ্দিষ্ট স্থানে কিছু কাল বিশ্রাম করিতে বলিয়া তপস্যা করিতে যান। পার্ব্বতী সময়-যাপনের জন্য মাটীর পুতুল (স্ত্রী-পুরুষ) গড়িয়া তাহার সহিত খেলা করেন। বার বৎসর পরে মহাদেব পুনরায় সেই স্থানে ফিরিয়া আইসেন। তাহার পর পার্ব্বতীর অনুরোধে মহাদেব সেই মাটীর পুতুলের জীবনদান করেন। তাহা হইতে সুবিশাল কুণ্বী-জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। প্রতি দশ বার বৎসর অন্তর বৃহস্পতি সিংহরাশিতে গমন করিলে কুণ্বীদিগের বিবাহকাল উপস্থিত হয়। এই সময় দুগ্ধপোষ্য হইতে বয়ঃস্থা পর্য্যন্ত যত কন্যা থাকে সকলেরই এক একটী বরের সহিত বিবাহ হয়। কারণ

এ সময়ে বিবাহ না দিতে পারিলে আবার সিংহরাশিতে বৃহস্পতির সমাগম প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। উপযুক্ত বর না পাওয়া গেলে ফুলের সহিত বিবাহ হয়। বিবাহের পরদিন সেই ফুল কূপে নিক্ষেপ করে। ইহাতে বরের মৃত্যু ও কন্যা বিধবা হয়। পরে সুযোগমত কন্যার "নাত্রা" বা পুনর্ব্বিবাহ দেওয়া হয়। পুনর্ব্বিবাহেও আড়ম্বর কম হয় না। বরের ধুতির অঞ্চল ও কন্যার শাড়ীর অঞ্চলে গাঁঠ দেওয়া হয়। এইরূপ গ্রন্থিবদ্ধ দম্পতী ঘোড়ায় চড়িয়া জনতার মধ্য দিয়া গীত বাদ্যের সঙ্গে সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করে। পুরোহিত গণপতির পূজা করিয়া বিবাহ-কার্য্য সম্পন্ন করেন। প্রকৃত বিধবার বিবাহে কিছুমাত্র আড়ম্বর নাই। কুণ্‌বীদিগের মধ্যে কৌলীন্য-প্রথা আছে। লোকে অর্থ দিয়া কুলীন-পাত্রে কন্যাদান করিয়া থাকে। কুলাভীমানী নির্ধন কুণ্‌বীদিগের মধ্যে পূর্ব্বে কন্যাহত্যা-প্রথা প্রচলিত ছিল। কন্যা জন্মিলেই তাহারা দুগ্ধপূর্ণ পাত্রে ফেলিয়া দিয়া কন্যাদায় হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিত। বিশেষতঃ অন্যে শালা বলিবে ইহা কুলীন কুণ্‌বী-কন্যার ভ্রাতার পক্ষে একান্ত অসহনীয় ছিল। এখন রাজশাসনে কন্যাবধ উঠিয়া গিয়াছে। কুণ্‌বীদিগের স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পরস্পর সম্মতিক্রমে বিবাহভঙ্গ করিতে পারে। কুণ্‌বীরা অত্যন্ত সাহসী ও বলিষ্ঠ।

গোয়ালিয়রের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রবীর রণজী-সিন্ধিয়া কুণ্‌বীজাতি-সম্ভূত ছিলেন। তিনি বালাজী-পেশওয়ার অধীনে একটী অতি নিম্নকর্ম্ম হইতে প্রধান সেনানায়কের পদ প্রাপ্ত হন। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে তিনি গোয়ালিয়র্-রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মাধোজী-সিন্ধিয়া সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কি রাজনীতি, কি যুদ্ধবিদ্যা, উভয়

বিষয়েই তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মাধোজীসিন্ধিয়া পাণিপথের যুদ্ধে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি নামে মাত্র পেশবার অধীন ছিলেন, কিন্তু সকল বিষয়েই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিতেন। এক সময় দিল্লীর সম্রাট্ তাঁহার আশ্রয় ভিক্ষা করেন এবং রাজপুত সেনানায়কগণ তাঁহাদের প্রসিদ্ধ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ও তাঁহারা সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন নাই। বর্ত্তমান সময়েও ইহার ই অধস্তন পুরুষের হস্তে গোয়ালিয়র্-রাজ্য শাসিত হইতেছে।

গোঁড়জাতি। গোঁড়জাতিকে কেহ গোণ্ড, কেহ বা গণ্ডনামে অভিহিত করেন। ইহারা হিন্দুজাতির অন্তর্গত কিন্তু মহর্ষি মনু অথবা অন্যান্য শাস্ত্রকারগণ এই জাতির উল্লেখ করেন নাই। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ বলেন "তেলেগুভাষায় কোণ্ড শব্দ হইতে গোণ্ডনামের উৎপত্তি হইয়াছে। কোণ্ড শব্দের অর্থ পর্ব্বত। অতএব পার্ব্বত্য-জাতি বলিয়া ইহারা গোণ্ড নামে আখ্যাত হইয়া থাকে"। অন্যেরা বলেন ;—গৌড় দেশের আদিমনিবাসী বলিয়া ইহারা গোঁড় নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। যাহা হউক গোণ্ডদের প্রকৃত বাসস্থান গোণ্ডবন বা গোণ্ডোয়ানা। ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি শ্রেণী বা থাক আছে কিন্তু রাজগোণ্ড বা রাজগোঁড়েরাই ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এ প্রদেশে রাজগোঁড়-জাতীয় অনেকগুলি রাজা আছেন। এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এই রাজগোঁড় জাতির পৌরহিত্য করেন। রাজগোঁড়েরা হিন্দুর ন্যায় বৈধকার্য্যের অনুষ্ঠান ও ক্ষত্রিয়-রীতির অনুকরণ করিয়া থাকেন। অনেক দরিদ্র রাজপুত ইহাদিগকে কন্যাদান করিয়া থাকে। অন্য শ্রেণীর কতকগুলি গোঁড় কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। অপর শ্রেণী মৃগয়াজীবী। আর এক শ্রেণী

গবাদির আহার তৃণাদি সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে। কোন কোন শ্রেণী সময়ে সময়ে চৌর্য্য ও দস্যুবৃত্তি দ্বারা জীবিকা সংগ্রহ করে। কেহ বা ক্রিয়াকর্ম্মে বাদ্য বাজায়। কেহ পশুপালন করে। কেহ বা পথে পথে গান গাহিয়া বেড়ায়, ইহাদের কন্যারা নর্ত্তকীর কার্য্য করে। মাদিয়াল গোঁড়েরা সর্ব্বাপেক্ষা অসভ্য, তাহারা কুঠারহস্তে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায় ও ইহারা উলঙ্গাবস্থায় থাকে। স্ত্রীলোকেরা পর্য্যন্ত বস্ত্র পরিতে জানে না, কতকগুলি বৃক্ষপত্র সংগ্রহ করিয়া কোমরের সম্মুখে ও পশ্চাদ্ভাগে ঝুলাইয়া রাখে। ইহারা অপরিচিত লোক দেখিলেই পলায়ন করে। বাস্তারের রাজাকে ইহারা নানাপ্রকার কর দিয়া থাকে। কর আদায়ের সময় তহশীলদার গ্রামের বাহিরে ঢাক বাজাইয়া লুকায়। পরে উহারা সেই চিহ্নিত স্থানে আসিয়া নিজ ইচ্ছামত পশুচর্ম্ম, কাষ্ঠ প্রভৃতি নানাবিধ কর রাখিয়া যায়। ইহারা বুড়াদেবের পূজা করে ও তাঁহার উদ্দেশে শূকর উৎসর্গ করে। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে ;—ঘণ্টারাম, চম্পারাম, নৈকারাম, পোতলিঙ্গ প্রভৃতি পঞ্চভ্রাতা এবং দণ্ডেশ্বরী নামে এক ভগিনী আছেন। তাঁহারাই জীবের রোগ ও মৃত্যুর কারণ। নাগপুরবাসী গোঁড়েরা ঐ সকল দেবতাকে অত্যন্ত ভয় ও ভক্তি করে। পূর্ব্বোক্ত দেবতা ব্যতীত ও ইহারা আরও কতকগুলি দেবতাকে পূজা করে। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি রাজগোঁড়দের আচার প্রায় রাজপুতের মত। অন্যান্য গোঁড়দের কয়েকশ্রেণীতে বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু রাজগোঁড়-দের মধ্যে নাই। বিবাহকে ইহারা "লমজিনা" বলে। বিবাহের পূর্ব্বে বরকে কিছুকাল কন্যার আজ্ঞাবাহী হইয়া থাকিতে হয়। বিধবারা নিজ দেবর বা অন্য পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে।

ইহারা মৃতদেহের অগ্নির দ্বারা সৎকার করে, কেবল স্ত্রীলোকের দেহ পুঁতিয়া রাখে।

পূর্ব্বকালে গোণ্ডবনের অন্তর্গত গড় ও মণ্ডল নামে গোঁড়রাজগণের প্রতিষ্ঠিত দুইটী অতি সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল। অদ্যাপি ঐ দুই রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। ঐ দুই স্থানের গোঁড়রাজেরা আপনাদিগকে গোঁড়ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত করিতেন। মালবের রাজপুতগণের সহিত এই গোঁড়রাজগণের সময়ে সময়ে যুদ্ধবিগ্রহ চলিত। হামিরপুর জেলায় মহোবানগরে চন্দেল-রাজপুত-বংশীয়দিগের এক রাজধানী ছিল। মহোবার রাজার দুর্গাবতী নামে এক কন্যা ছিলেন। গড়-রাজ্যের গোঁড়রাজ দলপৎশা দুর্গাবতীর রূপগুণের সংবাদে তাঁহাকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করেন। রাজপুতেরা রাজগোঁড়দিগের শৌর্য্য বীর্য্য দেখিয়া, গোঁড়রাজপুত বলিত কিন্তু আপনাদিগের অপেক্ষা হীন মনে করিত, সুতরাং মহোবারাজ হীনবংশীয়কে কন্যাদানে সম্মত হন নাই। দলপৎশা উহাতে ক্ষান্ত না হইয়া নিজের সৈন্য সামন্ত সহ মহোবারাজকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দুর্গাবতীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। বিবাহের এক বৎসর পরে একটী পুত্র হয় এবং পুত্রের যখন বয়ঃক্রম তিন বৎসর তখন রাণী দুর্গাবতীকে রাজ্যভার ও পুত্রের রক্ষাভার অর্পণ করিয়া রাজা পরলোক গমন করেন। দিল্লীর সম্রাট্ আকবরের মাণিকপুরস্থ প্রতিনিধি আসফখাঁ গড়-রাজ্য আক্রমণ করিলে রাণী দুর্গাবতী অলৌকিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধে রাণী দুর্গাবতী ও তাঁহার পুত্র বীরনারায়ণের প্রাণবিয়োগ ঘটে। বীরনারায়ণের পুত্র হৃদয়েশ্বর রাজা হন। তিনি রামনগরে মতিমহল নামে একটী সুন্দর প্রাসাদ

নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাঁহার পত্নী রাণী সুন্দরী এক বিষ্ণু-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। উহাকে পঞ্চরত্ন-মন্দির বলে। কুণ্‌বীজাতি ও রাজগোঁড় জাতির ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলে নিশ্চয় প্রতীতি হয়, শিক্ষা ও সদ্বৃত্তির অনুশীলনই মানবের অভ্যুদয়ের কারণ। তাহা না হইলে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রবর্ত্তয়িতা মহর্ষি মনুর সময়ে যাহাদের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল না, অথবা থাকিলেও অন্ততঃ যাহারা তাঁহার রচিত শাস্ত্রে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তাহারা আপন, আপন অধ্যবসায়-প্রভাবে ক্ষত্রিয় জাতির শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিল, ইহা কি উক্ত উভয় জাতির অল্প গৌরবের কথা ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আরণ্য-রেলপথ।

তিন দিন অবস্থানের পর ৪ঠা বৈশাখ অপরাহ্ন ৬টার সময় পুনরায় যাত্রা করিলাম। ষ্টেসনে গিয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল। নাগপুর ষ্টেসনটী নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। এখানে অনেকগুলি কার্য্যালয় ও সুন্দর বাঙ্গলো আছে। এখান হইতে "জি,—আই,—পি"—রেলপথ আরম্ভ হইয়াছে। ষ্টেসনে বহুদেশীয় যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। গাড়ী ছাড়িবার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সদ্যঃ-পরিচিত কতিপয় যাত্রীর সহিত গাড়ীতে উঠিলাম। প্রায় ৭॥ টার সময় ট্রেণ্ ছাড়িল। বহুসংখ্যক আরোহী বক্ষে করিয়া সুদীর্ঘ শকটমালা হুস্ হুস্ শব্দে দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইল। রজনী অন্ধকারময়ী, অল্প অল্প আলোকে রেলপথের উভয় পার্শ্বস্থ নিবিড় অরণ্য ও

পর্ব্বতমালা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। আমরা এখন যে পথ দিয়া যাইতেছি, ইহা সেই প্রাচীন বিদর্ভ জনপদ। ইহার বর্ত্তমান নাম বেরার্।

এই প্রদেশের রাজ-দুহিতা দময়ন্তীর সহিত নিষধেশ্বর নল-রাজের বিবাহ হইয়াছিল। যে সময়ে রাজা নল কলির চক্রান্তে স্বীয় ভ্রাতা পুষ্করের সহিত পাশক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া বনে গমন করেন, তখন ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হয়। তিনি এই সকল কানন প্রদেশে বিচরণ কালে দময়ন্তীকে ক্লান্ত এবং একান্ত অবসন্ন দেখিয়া পিত্রালয় বিদর্ভ রাজধানীতে গমনের জন্য অনুরোধ করেন। নল বলিয়াছিলেন "এই সমুদয় পথ অবন্তীপ্রদেশ ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দক্ষিণাপথ অভি-মুখে যাইতেছে। এই বিদর্ভ জনপদের পথ। ঐ পথ কোশল প্রদেশে যাইতেছে। ইহার পর দক্ষিণদিকে দক্ষিণাপথ*। বস্তুতঃ এই স্থানের পশ্চিমে অবন্তীদেশ ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বত বিদ্যমান, দক্ষিণে বিদর্ভ জনপদ ও পূর্ব্বদিকে কোশলরাজ্য। এই সমুদয়ের পরই দক্ষিণাপথ। অতএব মহাভারতের বর্ণনার সহিত বর্ত্তমান দেশ ও পর্ব্বত সংস্থানের আশ্চর্য্য ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ লিখিয়াছেন;—গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত "নাড়ওয়ার" † নামক স্থানেই নিষধেশ্বর নলের প্রাচীন

* এতে গচ্ছন্তি বহবো পন্থানো দক্ষিণাপথম্।
অবন্তীমৃক্ষবন্তঞ্চ সমতিক্রম্য পর্ব্বতম্॥
এষ পন্থা বিদর্ভানামসৌ গচ্ছতি কোশলান্।
অতঃপরঞ্চ দেশোঽয়ং দক্ষিণে দক্ষিণাপথঃ॥
(মহাভারত—বনপর্ব্ব)।

† কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে বর্ত্তমান কুমায়ুন প্রদেশেই প্রাচীন নিষধ কিন্তু নানা কারণে উহা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

রাজধানী ছিল। ঐ মতটী নিতান্ত অসমীচীন নহে। কারণ মাড়ওয়ার নিষধ-প্রদেশের রাজধানী হইলে, উহার অব্যবহিত পর-বর্ত্তী বিদর্ভ-দেশের অধীশ্বরের কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়াই অধিক সঙ্গত বোধ হয়। আর মহাভারত-কার নলদময়ন্তীর অরণ্যবাস কালে যে সকল রাজ্যের ও রাজধানীর নাম করিয়াছেন, ঐ সমস্তই প্রায় মধ্য ভারতবর্ষের অন্তর্গত। দময়ন্তী, পতিকর্ত্তৃক বিযুক্ত হইয়া কিয়ৎকাল সৌরিন্ধ্রীবেশে চেদিরাজ্যের রাজধানীতে ছিলেন। পুরাকালে মধ্যভারতের অন্তর্গত নর্ম্মদাতীরে চেদি-নামক একশ্রেণীর ক্ষত্রিয় বাস করিত, তাহাদেরই নামানুসারে ঐ দেশ "চেদি-দেশ" নামে অভিহিত হয়। চেদিদেশের রাজা সুবাহুর রাজধানী মাহিষ্মতী পুরীতে ছিল। উহা বর্ত্তমান জব্বলপুরের অনতিদূরে অবস্থিত। উক্ত চেদি-দেশের অধীশ্বর সুবাহুর মাতাই দময়ন্তীর মাতৃস্বসা ছিলেন। পূর্ব্বকালে বিদর্ভ-প্রদেশ বিদ্যাচর্চ্চার জন্য সবিশেষ খ্যাত ছিল। এখন ইহা একপ্রকার অরণ্যময়। এরূপ অরণ্যবহুল প্রদেশ অতি অল্পই দেখা যায়। কিয়দ্দূর গিয়াই একটী ষ্টেসন পাওয়া গেল। ঐ ষ্টেসনের অনতিদূরে চন্দ্রপুর নামক একটী সমৃদ্ধ পল্লীগ্রাম বিদ্যমান আছে। নাগপুরস্থ একজন পণ্ডিত* বলিয়াছিলেন;—ঐ চন্দ্রপুরের নিকট একটী নগরের ভগ্নাবশেষ. কতকগুলি মৃত্তিকাস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাই সেই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ পদ্মপুর নগরের শেষ চিহ্ন।

মহাকবি ভবভূতি। মহাকবি ভবভূতির নাম অনেকেই

---

* পণ্ডিত কেশব-গোপাল তামনকর এম্, এ।

জানেন। তিনি খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর* শেষভাগে অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে কিঞ্চিদধিক একাদশ শত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া বীর ও করুণরসের প্রবাহে ভারতবর্ষ প্লাবিত করিয়াছিলেন। এই পদ্মপুরই সেই মহাকবির জন্মভূমি। এই কবি বীরচরিত, উত্তরচরিত ও মালতীমাধব নামে তিনখানি নাটক প্রণয়ন করেন। তিনি বীরচরিত ও মালতীমাধবের প্রস্তাবনায় আত্মপরিচয় প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। কবি সূত্রধারের মুখে বলিয়াছেন—"দক্ষিণাপথের অন্তর্গত বিদর্ভদেশে পদ্মপুর নগর অবস্থিত। ঐ নগরে যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয়-শাখাধ্যায়ী কাশ্যপগোত্রসম্ভূত সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেন। তাঁহাদের বংশে মহাকবি গোপাল-ভট্টের জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র নীলকণ্ঠ। নীলকণ্ঠের পুত্র ভবভূতি। ভবভূতি শ্রীকণ্ঠ উপাধিতে বিভূষিত ছিলেন। তাঁহার মাতার নাম জাতুকর্ণী। তিনি যে গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ভগবান্ জ্ঞাননিধি। জ্ঞাননিধি একজন পরমহংস ছিলেন †। গাড়ীতে বসিয়া সঙ্গীদের সহিত মহাকবি ভবভূতির বিষয়ে অনেক আলোচনা করা গেল। অনন্তর সমস্ত নিশা সেই আরণ্যপ্রদেশ

---

* প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বিবিধ গবেষণা দ্বারা স্থির করিয়াছেন, ভবভূতি খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে জন্ম গ্রহণ করেন।

† অস্তি দক্ষিণাপথে বিদর্ভেষু পদ্মপুরম্ নামনগরম্। তত্র কেচিত্তৈত্তিরীয়িণঃ কাশ্যপাশ্চরণগুরবঃ পংক্তিপাবনাঃ পঞ্চাগ্নয়ো ধৃতব্রতাঃ সোমপীথিনঃ উডুম্বরা ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি। তদামুষ্যায়ণস্য তত্রভবতো বাজপেয়যাজিনো মহাকবেঃ পঞ্চমঃ সুগৃহীতনাম্নো ভট্টগোপালস্য পৌত্রঃ পবিত্রকীর্ত্তে র্নীলকণ্ঠস্য আত্মসম্ভবঃ শ্রীকণ্ঠপদলাঞ্ছনো ভবভূতির্নাম জাতুকর্ণী-পুত্রঃ কবির্মিত্রধেয়মস্মাকমিত্যত্রভবন্তো বিদাংকুর্ব্বন্তু।

শ্রেষ্ঠঃ পরমহংসানাং মহর্ষীণামিবাঙ্গিরাঃ।
যথার্থনামা ভগবান্ যস্য জ্ঞাননিধির্গুরুঃ॥

(বীরচরিতম্)

দিয়া গমন করিতে করিতে প্রত্যূষে ভোঁশোয়াল-নামক ষ্টেসনে পৌঁছিলাম।

ভোঁশোয়াল। ভোঁশোয়াল একটী জংসন। এখান হইতে একটী রেলপথ নাসিক হইয়া বম্বে গিয়াছে। অপর রেলপথটী খাণ্ডোয়ায় গিয়া মিলিত হইয়াছে। আমরা আপাততঃ খাণ্ডোয়া যাইব, সুতরাং এখানে অবতরণ করিলাম। অবশিষ্ট আরোহী লইয়া ঐ ট্রেন্‌টী বম্বে অভিমুখে ছুটিল। ভোঁশোয়াল ষ্টেসনটী একটী বালুকাময় প্রান্তরমধ্যে অবস্থিত। এখানে বহু যাত্রী অবতরণ করিল। ষ্টেসনে কয়েকটী জলের কল আছে। অধিকাংশ লোক ঐ সকল কলে গিয়া স্নানাদি করিতে লাগিল। আমরা কতিপয় আরোহী হস্তমুখ প্রক্ষালনাদি সম্পন্ন করিয়া স্নানার্থ অনতিদূরস্থ একটী পুষ্করিণীতে গমন করিলাম। উহার জল অতিশয় নির্ম্মল ও আম্রতরুরাজিতে ঐ পুষ্করিণীর তীরদেশ ছায়াময় ও সুশীতল। এখানেও দুই তিনটী মিষ্টান্ন এবং ফলের দোকান আছে। আমরা ঐ জলাশয়ে স্নান আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলাম। যতই বেলা অধিক হইতে লাগিল, ততই ষ্টেসনের আতপসন্তপ্ত আরোহিগণ ক্রমে ক্রমে আসিয়া এই জলাশয়-তীরস্থ আম্রবণ আশ্রয় করিতে লাগিল। এই সুদূরব্যাপী প্রান্তর-মধ্যে এই রমণীয় জলাশয়টী পান্থগণের পক্ষে যে কি উপকারী, উহা বলিয়া শেষ করা যায় না। দশটার সময় পুনরায় ট্রেন্ পাওয়া যাইবে, সুতরাং উহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই আমরা ষ্টেসনে গেলাম। ঐ সময় ষ্টেসনটী যেন একটী প্রদর্শনী (Exhibition) বলিয়া বোধ হইল। নানাবিধ অপূর্ব্ব অলঙ্কার ও রঞ্জিতবস্ত্রে সুসজ্জিতা মাড়োয়ারী-মহিলারা অবগুণ্ঠিত-বদনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। কোন স্থানে মাতৃ-ক্রোড়ে শিশু

রোরুদ্যমান। কোথায়ও ফল ও লাড্ডু বিক্রেতা ফেরীওয়ালাদের চীৎকারধ্বনি দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে। কয়েকটী বৃক্ষের শাখায় আরোহিণীদের পীত ও লোহিত বস্ত্র-সকল কোন উৎসব-গৃহের ধ্বজের ন্যায় উড়িতেছে। এক ছায়াবিরল বৃক্ষের মূলে কতিপয় দাক্ষিণাত্য-বিদ্যার্থী ন্যায়শাস্ত্রের তর্কে ব্যাপৃত। তাঁহারা রৌদ্রতাপে গলদ্‌ঘর্ম্মকলেবর হইয়াছেন, তথাপি চৈতন্য নাই। এমন সময় সহসা টিকিটের ঘণ্টা পড়িল। সকলেই তখন সুপ্তোত্থিতের ন্যায় হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং আপন আপন সঙ্গীকে ডাকিয়া টিকিট-ঘরের সম্মুখে গিয়া ভিড় করিতে লাগিল। আমাদের টিকিট ছিল, সুতরাং ট্রেন্ আসিবামাত্র আরোহণ করিলাম।

খাণ্ডব বন। ভোঁশোয়াল হইতে খাণ্ডোয়া পর্য্যন্ত এই সুদূর-ব্যাপী ভূভাগ পূর্ব্বকালে খাণ্ডব বন নামে পরিচিত ছিল। এই স্থানটী অতি-পুরাতন। যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরিয় আরণ্যকে খাণ্ডব বনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মহাভারতে লিখিত আছে ;—পুরাকালে ভারতবর্ষে শ্বেতকি নামে এক দাতা ও যাগশীল রাজা ছিলেন। তিনি প্রত্যহই যজ্ঞ করিতেন। তাঁহার যজ্ঞে নিযুক্ত ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞধূমে অন্ধপ্রায় হইয়া সেই নিত্যযজ্ঞকারী রাজাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। রাজর্ষি যজ্ঞে অত্যন্ত আস্থা। তিনি যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতীত থাকিতে পারিতেন না, সুতরাং অপর ঋত্বিক্ ডাকিয়া শতবর্ষব্যাপী যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সেই ঋত্বিকেরাও তাঁহার যজ্ঞ সমাপ্ত করিতে সক্ষম হইলেন না। রাজা পুনরায় পূর্ব্ব ঋত্বিক্‌গণের শরণাপন্ন হইলেন এবং অনেক অনুনয় করিলেন কিন্তু তাঁহারা সম্মত হইলেন না, বলিলেন "আপনি মহাদেবকে প্রসন্ন করুন, তিনি আপনার

যজ্ঞের ঋত্বিক্ হইবেন"। রাজা কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া বহুকাল মহাদেবের উদ্দেশ্যে তপস্যা করিলেন। মহাদেব প্রসন্ন হইয়া সমীপস্থ হইলে রাজা তাঁহার নিকট আপন প্রার্থনা জানাইলেন। মহাদেব বলিলেন "আমি স্বয়ং তোমার যাজন করিতে পারিব না, আমার অংশসম্ভূত দুর্ব্বাসা মুনি তোমার যজ্ঞের ঋত্বিক্ হইবেন"। রাজা যজ্ঞের আয়োজন করিয়া পুনরায় মহাদেবের নিকট গেলে মহাদেব দুর্ব্বাসাকে ডাকিয়া যজ্ঞ সমাপ্ত করিতে আদেশ করিলেন। দুর্ব্বাসা পূর্ব্বনিযুক্ত ঋত্বিক্‌গণের সহিত যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়া দক্ষিণা-গ্রহণ পূর্ব্বক গৃহে প্রস্থান করিলেন। এ দিকে দীর্ঘকাল প্রত্যহ হব্য ভোজন করিয়া অগ্নির উদরপীড়া উপস্থিত হইল। তাঁহার আর পূর্ব্বের ন্যায় তেজঃ রহিল না। তিনি বিপদে পড়িয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন ;—"অগ্নি! তুমি ভীত হইও না, দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই রাজার যজ্ঞে ঘৃত ভোজন করায় তোমার অজীর্ণ হইয়াছে। তুমি যাও, পূর্ব্বে দেবরাজের আদেশে দৈত্য-দিগের বাসস্থান যে খাণ্ডববন দগ্ধ করিয়াছিলে এখন, সেখানে বহুপ্রাণীর বসতি হইয়াছে। পুনরায় সেই স্থান দগ্ধ কর। সেই সকল জীবের মেদ ভোজন করিলে তোমার অগ্নিমান্দ্য বিদূরিত হইবে।

অগ্নিদেব বিধাতার আদেশে গিয়া সেই বন দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, সেই স্থানের প্রাণিগণের মধ্যে একটা সংক্ষোভ উপস্থিত হইল। সকলেই অগ্নি নির্ব্বাপণের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইল। হস্তিগণ শুণ্ডদ্বারা ও নাগগণ ফণার সাহায্যে জল সংগ্রহ করিয়া অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া দিল, সুতরাং অগ্নি নিরস্ত হইলেন। শেষে তিনি অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলেন। অর্জ্জুন ও কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের

আদেশ লইয়া বনে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। সেই সময় অগ্নি ব্রাহ্মণবেশ ধারণপূর্ব্বক গিয়া তাঁহাদের অতিথি হইলেন। তাঁহারা বলিলেন "আপনার কি অভিলাষ? যেরূপ ইচ্ছা করেন, সেইরূপ অন্ন প্রস্তুত করা যাউক।" অতিথি বলিলেন "আমি অগ্নি, এ অন্নে আমার প্রয়োজন নাই। আমি খাণ্ডব বন ভক্ষণ করিব। অতএব যাহাতে কেহ বিঘ্ন উপস্থিত করিতে না পারে, আপনারা তাহাই করুন।" অর্জ্জুন অগ্নির প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন "যান্, আপনি নিরুদ্বেগে গিয়া খাণ্ডব বন ভক্ষণ করুন। স্বয়ং বজ্রধর ইন্দ্র আগমন করিলেও আমি তাঁহার সহিত সংগ্রাম করিব"। তাহার পর অগ্নি খাণ্ডব বনে প্রবেশ করিলে সেই বন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। প্রাণিগণ চীৎকার করিতে করিতে দগ্ধ হইতে লাগিল। কেহ বন হইতে বাহির হইতে পারিল না, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন অগ্নির সহায়স্বরূপ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাহার পর সেই বনের প্রাণিগণ দেবরাজের নিকট গিয়া নিবেদন করিল। দেবরাজ কুপিত হইয়া সেই স্থানে আগমন করিলেন এবং অর্জ্জুনের সহিত তুমুল সংগ্রাম হইল। দেবরাজ পরাস্ত হইলেন এবং অগ্নি নির্ব্বিঘ্নে পঞ্চদশ দিন ব্যাপিয়া বিশাল খাণ্ডববন উদরসাৎ করিলেন। কেবল নাগজাতীয় অশ্বসেন, ময়দানব ও শার্ঙ্গকেরা চারিজন ব্যতীত আর সকলেই ভস্মসাৎ হইল *।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে;—এই বনটী পূর্ব্বে ইন্দ্রাদি দেবগণের বিহারস্থান ছিল। চন্দ্রবংশীয় সুদর্শন নামক কোন

* "মহাভারত—আদিপর্ব্ব" পাঠ করুন।

নরপতি দেবরাজের আজ্ঞা লইয়া এই অরণ্য পরিষ্কৃত করেন এবং এখানে খাণ্ডবী নামে এক পুরী নির্ম্মাণ করেন। ঐ পুরী নানাগুণে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। উহার দৈর্ঘ্য চারিশত ক্রোশও বিস্তার দ্বাদশ শত ক্রোশ ছিল। সুদর্শনের বলবিক্রমে অনেক রাজ্যের রাজাকেই তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে সুদর্শন কাশীরাজ বিজয়ের সহিত বন্ধুতা করিয়া তাঁহাকে প্রধান অমাত্যপদে বরণ করেন। তাহার পর তিনি প্রজাদের প্রতি কিছু অন্যায়াচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন, ইহার ফলে প্রজারা তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। কাশীরাজ বিজয় সুযোগ পাইয়া সুদর্শনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। যুদ্ধে সুদর্শনের পরাজয় হইল। রাজা বিজয় খাণ্ডবী পুরী লুণ্ঠিত করিলেন। ঐ সময় দেবরাজ ইন্দ্র কাশীরাজ বিজয়ের নিকট আসিয়া জানাইলেন—এই স্থানে পূর্ব্বে একটী বন ছিল, সেই বনে দেব ও গন্ধর্ব্বগণ মহাসুখে বিচরণ করিতেন। সুদর্শন তাঁহাদের সেই সুখে বাধা দিয়া এই স্থানে খাণ্ডবীপুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তাঁহাদের ইচ্ছা এই স্থানটী পুনরায় উপবনে পরিণত হয়। কাশীরাজ বিজয় তাহাতেই সম্মত হইলেন এবং দেবরাজের আদেশে ঐস্থানে একটী উপবন প্রস্তুত করিয়া দিলেন*। প্রজাগণ কাশীরাজের অনুমতিক্রমে তাঁহার রাজ্যে গিয়া বাস করিতে লাগিল। খাণ্ডবী পুরী ধ্বংস করিয়া এই বন

---

* "ললিতবিস্তর" নামক অতিপ্রাচীন বৌদ্ধ-সংস্কৃত-গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী এক রাজা সুদর্শনের বৃত্তান্ত আছে। অনেকে অনুমান করেন "উক্ত রাজা সুদর্শনই খাণ্ডবী পুরীর নির্ম্মাতা। তাঁহার অভ্যুদয়ে অসন্তুষ্ট হইয়া ঈর্ষ্যাবশতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধী রাজা বিজয় ঐ পুরী ধ্বংস করিয়া অরণ্যে পরিণত করেন"।

নির্ম্মিত হয় বলিয়া ইহা খাণ্ডব বন নামে পরিচিত হইয়াছে*। এই সকল প্রাচীন আখ্যায়িকা ও ললিত-বিস্তরের বৌদ্ধরাজা সুদর্শনের বিবরণ পাঠে, এই অনুমান হয়। বৈদিককালে এই স্থান ঘোর অরণ্যময় ছিল। হস্তী ব্যাঘ্র সর্প প্রভৃতি জন্তুগণের বাসস্থানে পরিণত হইয়াছিল। তাহার পর অনার্য্য ভিল প্রভৃতির অধিকৃত হয়। অনার্য্যগণের পর এই স্থান নাগগণের অধিকারে আইসে। মহাভারতীয় সময়ে অর্জ্জুনের সাহায্যে এই স্থান দগ্ধ ও পরিষ্কৃত হয়। কোন প্রাণীর বাস না থাকায় আবার অরণ্যময় হইয়াছিল। তৎপর সুদর্শন রাজা রাজধানী স্থাপনের মানসে এই স্থান পরিষ্কৃত করিয়া খাণ্ডবী পুরী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বনে প্রজারা অসন্তুষ্ট হইয়া প্রধান মন্ত্রীর সাহায্যে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত এবং তাঁহার নির্ম্মিত বৌদ্ধবিহারাদি ধ্বংস করিয়া ভূমিসাৎ করিয়াছিল।

এই খাণ্ডব বনের বিস্তৃতি দেখিয়া মনে হয়, মহাভারতের বর্ণনার অক্ষরে অক্ষরে সত্য। পঞ্চদশ দিনের ন্যূন সময়ে এই সুদূরব্যাপী মহারণ্য দগ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমরা পূর্ব্বাহ্ণ দশটা হইতে অপরাহ্ণ তিনটা পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত দ্রুতগামী বাষ্পশকটে গমন করিয়া এই অরণ্যানীর দক্ষিণপ্রান্তে উপনীত হইলাম। রেল-পথের উভয়পার্শ্বস্থ ঘনসন্নিবিষ্ট—বৃক্ষগুল্ম পরিবৃত ভূভাগের কোথাও পর্ব্বতমালা, কোনস্থানে ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী, বিদ্যমান। কোন অংশে বা পার্ব্বত্যনদীসকল শুষ্কবক্ষে যেন সেই নিবিড়তর শালবনের মধ্যে ম্রিয়মান রহিয়াছে। অরণ্য-মধ্যে স্থানে স্থানে অতি পুরাকালের দুই চারিটী ক্ষুদ্র মন্দির ও পর্ব্বতগাত্রে পাষাণ-নির্ম্মিত

* "কালিকা-পুরাণ" পাঠ করুন।

রাজপথ সকল দেখা যাইতে লাগিল। বস্তুতঃ এই সকল স্থান সন্দর্শন করিয়া মনে নানা ভাব উপস্থিত হইতে লাগিল। এই মনুষ্যসঞ্চার-রহিত নিবিড়তর অরণ্যানী-মধ্যে মন্দির ও রাজপথ-সকল কে নির্ম্মাণ করিল? অথবা ইহা সেই পরাজিত নরপতি সুদর্শনের শাসিত জনপদের শেষ চিহ্ন। এই রেল-পথ হইবার বহুশতাব্দী পূর্ব্বে মানব জাতির অগম্য এই সকল স্থানে যে কোন সমৃদ্ধ জনপদ ছিল, উহা সহজেই অনুমিত হয়। পুরাণের আখ্যায়িকা-সমূহ অতিরঞ্জিত কিংবা রূপক দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইলেও উহা হইতে অনেক ঐতিহাসিক তত্ত্বের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। বস্তুতঃ আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের বিষয় যাহা কিছু জানিতে পারি, উহার অধিকাংশই পুরাণের সাহায্যে বলিতে হইবে।

খাণ্ডোয়ানগরী।

৫ই বৈশাখ অপরাহ্ন তিন ঘটিকার সময় খাণ্ডোয়া ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া তত্রত্য বাঙ্গালী প্রধান উকীল শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় এম্-এ, বিএল্, মহাশয়ের বাসায় সাদরে গৃহীত হইলাম। হরিদাস বাবু একজন কৃতবিদ্য ও স্বদেশহিতৈষী ব্যক্তি। তিনি ঐ নগরের মিউনিসিপালিটীর সভাপতি ও বিবিধ দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠাতা। আমি তাঁহার ও তাঁহার ভ্রাতার যত্নে তিন দিবস খাণ্ডোয়ায় অবস্থান করি। খাণ্ডোয়া নিমার জেলার হেড্-কোয়ার্টার্। পূর্ব্বকালে এই প্রদেশ মাহিষ্মতী নগরীর হৈহয়বংশীয় রাজাদের শাসনাধীন ছিল। কথিত আছে—ব্রাহ্মণেরা সেই রাজাকে

পদচ্যুত করিয়া এই প্রদেশে শিবপূজা প্রবর্ত্তিত করেন। ইহাদ্বারা অনুমিত হয়, হৈহয়-বংশীয়গণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাহার পর চোহানবংশীয় হিন্দু রাজপুতগণ আশীরগড়ে রাজধানী স্থাপন করিয়া এই দেশ শাসন করেন। তৎপর প্রমরবংশীয় রাজপুতগণ আশীরগড় অধিকার করিয়া এই প্রদেশের রাজা হন। কাহারও কাহারও মতে মাহিষ্মতীনগরীর হৈহয়বংশীয় রাজাদের পরেই আশানামক একজন গোপবংশীয় রাজা এই দেশের অধীশ্বর হন। তিনি ই আশীরগড়ে রাজধানী স্থাপন করেন। আশার গড় বলিয়া আশীরগড় নাম হয়। যাহা হউক প্রমরবংশীয় রাজপুতগণ দীর্ঘকাল এই প্রদেশ শাসন করিয়া ছিলেন। নবম খৃষ্টাব্দ হইতে দ্বাদশ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত চোহানবংশীয়গণ দক্ষিণনিমারের প্রভু ছিলেন। উত্তরনিমারে ভীলরাজগণ রাজত্ব করিতেন। তাহার পর দিল্লির সম্রাট্ প্রমরবংশীয় ও ভীলবংশীয় রাজগণকে পরাজিত করিয়া নিমার্ প্রদেশ অধিকার করেন। এখনও নর্ম্মদাবেষ্টিত মান্ধাতা নামক স্থানে এক ভীলরাজবংশ বাস করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে মান্ধাতার বংশ বলিয়া পরিচয় দেন। ঐ স্থানে ওঙ্কারেশ্বর নামক এক শিব আছেন এবং উহা একটী তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত। খাণ্ডোয়া সহরটী ও নিতান্ত আধুনিক নহে। অতিপ্রাচীন কালের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক টলেমি ও আবুরিহান পর্য্যন্ত এই নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন। এই নগরে দুইটী প্রধান রাজপথ আছে। মধ্য স্থানে চৌরাস্তা। ঐ সকল রাজপথের উভয়পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকা। এই নগরে খোলার ঘরও বিস্তর আছে। সে গুলিও দ্বিতল ত্রিতল এবং সুন্দর-চিত্রিত। শ্বেতাঙ্গ-নিকেতন বাঙ্গলো গুলিও বেশ নয়নপ্রীতিকর। এখন নাগপুরের চিপ্‌কমিসনার্ মধ্যভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তা।

তাঁহার অধীন একজন ডেপুটী কমিশনার্ এখানকার শাসনকার্য্য পরিচাল করেন। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী কোর্ট আছে।

এই নগরে প্রাচীন কীর্ত্তির অভাব নাই। ৬ই বৈশাখ অপরাহ্নে হরিদাস বাবুর বাটীর অগ্নিকোণে প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে "রামশর*" নামক প্রাচীন স্থান সন্দর্শন করিতে গেলাম। ঐ স্থানটী একটী কৃত্রিম নদীর পূর্ব্বতীরে বিজন অরণ্য মধ্যে অবস্থিত। কথিত আছে ;—পিতৃসত্য পালনার্থ নির্ব্বাসিত রাম, সীতা, লক্ষ্মণ, এই পথে পঞ্চবটীতে গমন করেন। গমনকালে এই স্থানে আসিয়া সীতার দারুণ পিপাসা হয়। তখন এই স্থান বিজন-অরণ্যময় ছিল। কোনরূপ মনুষ্যাবাস অথবা জলাশয় বিদ্যমান ছিলনা। লক্ষ্মণ বহু অনুসন্ধান করিয়াও জল পাইলেন না দেখিয়া রাম ভূতলে এক শর নিক্ষেপ করেন। তাহাতে ভূতল বিদীর্ণ হইয়া জল উত্থিত হইলে উহা পান করিয়া জনকনন্দিনীর তৃষ্ণা দূর হয়। তদবধি এই স্থানটী "রামশর" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তত্রত্য একটী ব্রাহ্মণ-বালক যখন ভক্তিগদ্‌গদস্বরে ঐ কথা গুলি বলিতে লাগিল, তখন তাহার কথা শুনিয়া হৃদয় মুগ্ধ হইয়া গেল। কত যুগ যুগান্তর অতীত হইয়াছে, তথাপি লোকের হৃদয় হইতে সেই সত্ত্ব-গুণের আধার, পুরুষোত্তম ভগবান্ রামের ক্ষুদ্র কার্য্যের স্মৃতিটুকুপর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয় নাই। যে স্থান হইতে

* "রামশর" নামক স্থানটী তীর্থবিশেষ। আমি দক্ষিণাপথ হইতে প্রত্যাগমনের পর গুপ্তপ্রেশপঞ্জিকার সত্বাধিকারী স্বর্গীয় ৺জগজ্জ্যোতি গুপ্ত আমাকে একটী তীর্থের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দিতে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাকে যে তীর্থের তালিকা প্রস্তুত করিয়া দেই, ঐ তালিকায় রামশর, ওঙ্কারেশ্বর প্রভৃতি তীর্থ, স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে।

জলোদ্ধার করা হইয়াছিল, ঐ স্থানে একটী কূপ আছে। উহার চতুর্দ্দিক্ পাষাণমণ্ডিত। নিকটে কতিপয় প্রাচীনও আধুনিক মন্দির আছে। একটীতে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের পাষাণ-মূর্ত্তি বিরাজিত। অপরটীতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। অনতি-দূরস্থ দুই তিনটী মন্দিরে বৌদ্ধমূর্ত্তি সকল বিরাজমান। ঐ মূর্ত্তি-গুলিই অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। কিঞ্চিৎ দূরে একটী মহম্মদীয় মস্‌জীদও আছে। ঐ কৃত্রিম নদীর পশ্চিম তীরে প্রান্তর মধ্যে একটী দুর্গ বিদ্যমান। সেখানে বহুসংখ্যক ইংরেজ-সৈন্য বাস করে। সায়ংকাল উপস্থিতপ্রায়। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন হইল, মধ্যে মধ্যে মেঘগর্জ্জন শ্রুত হইতে লাগিল, আমি দ্রুতপদে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

পরদিন (৭ই বৈশাখ) তত্রত্য অন্যান্য দর্শনীয় পদার্থগুলি সন্দর্শন করিলাম। নগরের নৈঋত কোণে একটী সমচতুষ্কোণ সরোবর আছে। ঐ জলাশয়ের নাম পদ্মকুণ্ড। উহার পার্শ্বে প্রাচীর বিদ্যমান। ঐ প্রাচীরের গাত্রে কুলুঙ্গীর মত স্থানগুলিতে ভৈরবের ও নন্দীর মূর্ত্তি সকল খোদিত আছে। কোন কোন কুলুঙ্গীর শিলালিপিতে ঐ মন্দির নির্ম্মাণের সময় উৎকীর্ণ আছে। পদ্মকুণ্ডের মধ্যে ও একটী মন্দির আছে। জলের মধ্যস্থিত ঐ মন্দিরের মেঝেতে কি কি অক্ষর না কি খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। শুনা গেল, অনেকে উহা দেখিয়াছেন। পদ্মকুণ্ডের পার্শ্বে পদ্মেশ্বর শিবের মন্দির। উহাতে শিবলিঙ্গ ও অন্যান্য কতিপয় মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। এই স্থানের নৈঋত কোণে কিয়দ্দূরে ভৈরব-তাল নামক একটী বৃহৎ সরোবর আছে। নগরের বায়ুকোণে কুলালকুণ্ড নামক আর একটী পুষ্করিণী বিদ্যমান। উহার পার্শ্বে

তুলজা দেবীর মন্দির। আর রেলপথের নিকট ভীমকুণ্ড ও উহার কিঞ্চিৎ দূরে সূর্য্যকুণ্ড নামক দুইটী জলাশয় আছে।

খাণ্ডোয়ার চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বতমালা। নগরীটীও প্রায় পর্ব্বতের উপত্যকায় নির্ম্মিত। স্থানটী বেশ স্বাস্থ্যকর। এখানে হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতি অল্প। নর্ম্মদীয়-ব্রাহ্মণ, গুর্জ্জরগৌড়-ব্রাহ্মণও দক্ষিণী ব্রাহ্মণ নামে যে তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে, তাহাদের কেহই প্রায় সংস্কৃতজ্ঞ নহে। ক্ষত্রিয় আছে, কিন্তু তাহারা রাজপুতের মত তেমন তেজস্বী নহে। ইহারা অস্ত্রহীন হইয়া লেখনীর সাহায্যে কোনরূপে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। এখানে বৈশ্য (বণিক্) ও নবশাকেরা ধনী ও সম্ভ্রান্ত। ইহারা ক্ষত্রিয়কে গণনার মধ্যেই আনে না। এতদ্ভিন্ন শূদ্র, অতিশূদ্র, ভিল্‌-প্রভৃতির বাস আছে। এখানে চারি পাঁচটী বাঙ্গালী বিষয়-কার্য্যোপলক্ষে আসিয়া বসতি করিতেছেন। ইহারা সকলেই শিক্ষিত ও সম্মানিত। একটী বাঙ্গালী বারিষ্টার, কোন য়ুরোপীয় মহিলার পাণিপীড়ন করিয়াছেন। এখানকার লোকেরা ইংরাজকেও যেরূপ সম্মান করে, বাঙ্গালীকেও সেই রূপ সম্মান করিয়া থাকে।

৯ই বৈশাখ শনিবার অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় অবন্তি অভিমুখে যাত্রা করিলাম। হরিদাস বাবুর ভ্রাতা স্বয়ং ষ্টেসনে আসিয়া টিকিট করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন। আমরা যখন ট্রেণে উঠিলাম, তখন হরিদাস বাবুও অন্যান্য স্থানীয় বাঙ্গালী-গণ ষ্টেসনে বেড়াইতে আসিয়া নানাবিধ শিষ্টাচারে আমাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন। খাণ্ডোয়া একটী জংসন। এখান হইতে

* এই গাড়ীতে ইন্দোরপ্রবাসী আর একটী বাঙ্গালী ছিলেন।

জি, আই, পি. রেলপথের একটী শাখা জব্বলপুরে গিয়া, ই, আই—রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে। আমরা ভোঁশোয়াল হইতে যে রেলপথ দিয়া খাণ্ডোয়া আসিয়াছিলাম, সেই রেলপথটী এখান হইতে বম্বে গিয়াছে। আর জি, আই, পি. রেলপথের অপর একটী শাখা এখান হইতে ইন্দোর হইয়া ফতেয়াবাদে উপস্থিত হইয়াছে। ষ্টেসনের সীমা পরিত্যাগ করিয়া ই ধাম্পশকট ক্রমে মন্থর-গতি পরিহার করিল। যতক্ষণ সূর্য্যালোক ছিল, বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার অপূর্ব্বশোভা নয়নগোচর হইতে লাগিল।

বিন্ধ্যপর্ব্বত ও নর্ম্মদানদী।

দক্ষিণাপথের বৃত্তান্ত বিবৃত করিতে হইলেই বিন্ধ্যপর্ব্বতের বর্ণনা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। এই পর্ব্বতমালা রাজমহলের সন্নিহিত ভাগীরথীতীর হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণাপথের কাম্বে উপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উক্ত মহাশৈল ই সীমান্তম্ভের ন্যায় আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দক্ষিণাপথকে বিভক্ত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে এই পর্ব্বতমালার সুবিস্তৃত বর্ণনা দৃষ্ট হয়। মহর্ষি বাল্মীকি বিন্ধ্যকে সহস্রশীর্ষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন*। প্রকৃতপক্ষেও ইহার অসংখ্য-শৃঙ্গমালা দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে;—বিন্ধ্য-শৈল এক সময় স্বীয় শৃঙ্গমালা বিস্তৃত করিয়া সূর্য্যের গমন-পথ রোধ করিতে প্রবৃত্ত হন। অনন্তর মিত্রাবরুণের পুত্র মহর্ষি মান

*সহস্রশিরসং বিন্ধ্যং নানাদ্রুমলতাবৃতম্।
নর্ম্মদাঞ্চ নদীং রম্যাং মহোরগনিষেবিতাম্॥ (রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্)

দক্ষিণাপথে গমনকালে বিন্ধ্যকে বলেন, "আমি যতদিন ফিরিয়া না আসি, ততদিন পর্য্যন্ত তুমি এই অবস্থায় ই অবস্থান কর"। বিন্ধ্য তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। মহর্ষি মানও আর ফিরিলেন না, বিন্ধ্যও স্বীয় সীমা অতিক্রম করিয়া সূর্য্যের পথ রোধ করিতে সমর্থ হইলেন না। সেই সময় হইতে অগ অর্থাৎ বিন্ধ্যপর্ব্বতকে স্তম্ভিত, অর্থাৎ হতদর্প করেন বলিয়া মহর্ষি মান অগস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ হন*। বিন্ধ্যপর্ব্বতের প্রথম পরাজয় মহর্ষি মান হইতে দ্বিতীয় পরাজয় ইংরেজ-জাতির নিকট। রেল-কোম্পানি এখন লৌহবর্ত্ম বিস্তার করিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের সর্ব্বাঙ্গ পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন।

ক্রমে ঘোর তিমিরপুঞ্জে চতুর্দ্দিক্ আবৃত হইতে লাগিল। কৃষ্ণ-পক্ষীয় নিশার অস্পষ্ট আলোকে বৃক্ষগুল্মপরিবৃত শৈলমালার অসম্পূর্ণ দৃশ্য ব্যতীত আর কিছুই নয়নগোচর হইল না। রাত্রি যতই অধিক হইতে লাগিল, বাষ্পশকট ও ততই ভীষণ অপেক্ষা ভীষণতর প্রদেশ দিয়া যাইতে লাগিল। পার্ব্বত্য-প্রদেশের শীতল বায়ু সেবন করিয়া আরোহিগণ ক্রমে নিদ্রাবিষ্ট হইয়া পড়িল। এ সময় চোর ও দস্যুদের হস্ত হইতে আরোহীদিগকে রক্ষা করিবার জন্য যমদূতের ন্যায় ভীষণদর্শন একজন পুলিশ-প্রহরী গাড়ীর পার্শ্বে পার্শ্বে বিচরণ করিয়া আরোহীদিগকে সতর্ক করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আমরা নর্ম্মদাসেতুর নিকট উপস্থিত হইলাম। নর্ম্মদা সেই বৈদিক কালের পুণ্যনদী। বৈধকার্য্যের জলশুদ্ধির সময় অন্যান্য পবিত্র নদীর সহিত এই নদীরা নাম উচ্চারণ করিতে

* মহাভারত—বনপর্ব্ব পাঠ করুন।

† গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিংকুরু।

হয়। মৎস্যপুরাণের মতে কলিঙ্গদেশের পশ্চাদ্‌ভাগস্থ অমরকণ্টক পর্ব্বত হইতে এই নদী নিঃসৃত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছেন*। আবার কোন কোন পুরাণের মতে নর্ম্মদা বিন্ধ্যগিরি হইতে সমুৎপন্ন হইয়া তমসানদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মতটী ই সত্য, কারণ এখনও উঁহার উৎপত্তিস্থান দৃষ্ট হয়। রেবারাজ্যের অন্তর্গত অমরকণ্টক-পর্ব্বতের শিখরদেশে নর্ম্মদার উৎপত্তিস্থান। পর্ব্বতশিখরস্থ একটী ক্ষুদ্র জলাশয় হইতে এই নদী উৎপন্ন হইয়াছেন। ঐ স্থানটী রক্ষা করিবার জন্য কতিপয় তীর্থপুরোহিত সেখানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়া থাকেন। যেখান হইতে নর্ম্মদা বহির্গত হইয়াছেন, সেই স্থানটী নাকি জনশূন্য ভীষণ অরণ্যময়। পূর্ব্বে পরিব্রাজক কিংবা একান্ত ক্লেশসহিষ্ণু তীর্থযাত্রীরা ই কেবল ঐ স্থানে গমন করিতেন। এখন অনেকেই ঐ স্থান সন্দর্শন করিতে গিয়া থাকেন। নর্ম্মদার উৎপত্তি বিষয়ে স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে লিখিত আছে :—প্রথম রাজা পুরূরবা বহুকালব্যাপি তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করিলে তিনি নর্ম্মদাকে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইবার জন্য অনুরোধ করেন। তাহাতেই ইনি ভূতলে আগমন করেন। তাহার পর সোমবংশীয় রাজা হিরণ্যরেতাঃ তপস্যাদ্বারা মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিলে তাঁহার অনুরোধে দ্বিতীয়বার ইনি ধরাতলে আগমন করিয়াছিলেন। অন্য সময়ে ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা পুরূকুৎস তপশ্চরণ দ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া নর্ম্মদাকে

---

* কলিঙ্গদেশে পশ্চার্দ্ধে পর্ব্বতে হমরকণ্টকে।
পুণ্যা চ ত্রিষু লোকেষু রমণীয়া মনোরমা।
সদেবাসুরগন্ধর্ব্বা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
তপস্তপ্ত্বা মহারাজ সিদ্ধিঞ্চ পরমাং গতাঃ। (মৎস্যপুরাণম্)

স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আনয়ন করেন *। নর্ম্মদা অতিশয় পুণ্যদায়িনী †। শাস্ত্রে লিখিত আছে :—এই নদীতে স্নান দান ও পিতৃকার্য্য শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করিলে উহা অক্ষয় হয়। মধ্যভারতের অধিবাসীরা নর্ম্মদার প্রতি অতিশয় ভক্তিমান্। যখন বাষ্পশকট নর্ম্মদা উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইতে লাগিল, তখন আরোহীরা অপরাধীর ন্যায় কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিল। আমরাও অচিরোদিত চন্দ্রালোকে নর্ম্মদার স্ফটিকনিভ সলিলপ্রবাহ প্রত্যক্ষ করিয়া প্রণিপাত করিলাম।

মৌ-ষ্টেসন।

গভীর রজনীতে বাষ্পশকট মৌ-ষ্টেসনে পৌঁছিল। মৌকে সাধারণতঃ লোকে মৌ-ছাউনী বলে। ষ্টেসনের অনতিদূরে ইংরেজরাজের একটী সৈন্যাবাস আছে। ঐ স্থানে বহুসংখ্যক ইংরেজ ও দেশীয়-সৈন্য বাস করে। এখানে অনেক আরোহী অবতরণ করিল। কারণ ইহার ষোলক্রোশ দূরে সুপ্রসিদ্ধ ধারানগরী বিদ্যমান। যাঁহারা সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, এক সময় ধারানগরী কিরূপ সমৃদ্ধ ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর বহু পূর্ব্বে এখানে ভোজবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী ছিল। ভোজনরপতিগণ পরাক্রান্ত, বিদ্বান্ ও গুণগ্রাহী ছিলেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী ও উহার পরিবর্ত্তিকালে ধারানগরীতে সুবিখ্যাত বিদ্বৎসমিতি ছিল। "দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা" নামক সংস্কৃত-কাব্যের

---

* স্কন্দপুরাণ—রেবাখণ্ড পাঠ করুন।

† পুণ্যা কনখলে গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী।
গ্রামে বা যদি বারণ্যে পুণ্যা সর্ব্বত্র নর্ম্মদা। (মৎস্যপুরাণম্)

রচয়িতা ঐ বিদ্বৎসমিতির অন্যতম সদস্য ছিলেন। মুসলমান রাজ্য-কালে দিল্লির সম্রাট্‌গণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ধাররাজ্য ধ্বংসপ্রায় হয়। তদানীন্তন রাজবংশীয়গণ এখান হইতে পুণায় গিয়া বাস করেন। শিবাজীর অভ্যুদয়কালে তাঁহারা শিবাজীর সৈন্যের কার্য্যে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে বাজীরাও—পেশবা পূর্ব্বোক্ত সৈনিকপদে অধিরূঢ় আনন্দ রাও নামক এক ব্যক্তিকে ধাররাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। তাঁহারই অধস্তন পুরুষগণের হস্তে এখন ধাররাজ্য শাসিত হইতেছে। ধারেশ্বরগণ আপন রাজ্যের রাজস্ব গ্রহণ ও ফৌজদারী, দেওয়ানী—প্রভৃতি বিচারাদি স্বয়ংই সম্পন্ন করেন। কেবল অপরাধীর প্রাণদণ্ড দিতে হইলে ইংরেজ-রেসিডেন্টকে জানাইতে হয়।

একজন মধ্যপ্রদেশপ্রবাসী বাঙ্গালী বলিলেন "হিন্দুরাজত্বকালে বিন্ধ্যপর্ব্বতমালার উপরিভাগে ধারানগরী অবস্থিত ছিল। অদ্যাপি উহার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এখনও সেখানে অনেক কারুকার্য্যখচিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ ও সুদীর্ঘ জলাশয় সকল বিদ্যমান আছে। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লির সম্রাটের প্রতিনিধি দিলওয়ান্‌খাঁ প্রাচীন ধারানগরীর শ্বেত ও লোহিত-বর্ণ-প্রস্তর-সকল ভাঙ্গিয়া লইয়া মাণ্ডুতে রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। ইহা সমতল ভূমিতে অবস্থিত। এই রাজধানীতে যে সকল প্রাসাদ, অট্টালিকা ও দেবমন্দিরাদি আছে, উহার কিয়দংশ মুসলমানগণের কতক পরবর্ত্তী হিন্দুরাজগণের নির্ম্মিত। বর্ত্তমান সহরটী মৌ-ষ্টেসন হইতে বড়োদা যাইবার রাজপথের পার্শ্বদেশে অবস্থিত। ঐ সহরটী দৈর্ঘ্যে দেড় মাইল ও প্রস্থে অর্দ্ধ মাইলের অধিক নহে। উহার চতুর্দ্দিক্ মৃণ্ময়-প্রাচীরবেষ্টিত। বর্ত্তমান সহরেও কয়েকটী

মনোহর অট্টালিকা ও লোহিত প্রস্তরে নির্ম্মিত দুইটী মস্‌জিদ আছে। বলা বাহুল্য ঐ দুইটী সুন্দর মস্‌জিদের উপকরণ সেই প্রাচীন তোমরবংশীয় রাজগণের প্রাসাদও দেবমন্দির হইতে সংগৃহীত। ধাররাজ্যে প্রায় দুই লক্ষ লোকের বাস। তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। বর্ত্তমান ধাররাজের ২৭৬ জন অশ্বারোহী ৮৩০ পদাতি, দুইটী কামান ও ২১ জন গোলন্দাজ আছে। ধার-রাজের সম্মানার্থ ইংরেজ গবর্মেণ্ট হইতে ১৫টী তোপ নির্দ্দিষ্ট আছে। ঐ প্রদেশে ধাররাজ ব্যতীত আরও কয়েকটী ভূমিঞা ও ভীল সর্দ্দার আছেন। তাঁহারা ধাররাজ অপেক্ষা কিছু অল্প ক্ষমতাসম্পন্ন। ঐ সকল ভূম্যধিকারী আপন আপন ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজস্ব গ্রহণ এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারাদি স্বয়ংই সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

রজনীর শেষাংশে মৌ অতিক্রম করিয়া রেলশকট ইন্দোর ষ্টেসনে পৌঁছিল। বহুসংখ্যক আরোহী এখানে অবতরণ করিল। আমার উজ্জয়িনী সন্দর্শন করিবার বাসনা হৃদয়ে অত্যন্ত বলবতী। আমি স্থির করিয়াছি উজ্জয়িনী না দেখিয়া অগ্রে অন্য কোথায়ও যাইব না, সুতরাং আমি আর ইন্দোরে অবতরণ করিলাম না তাহার পর পুনরায় বাষ্পশকট ছুটিল। প্রায় রাত্রি চারি ঘটিকার সময় ফতেয়াবাদ ষ্টেসনে পৌঁছিল। ফতেয়াবাদ একটী ঐতিহাসিক স্থান। এখানে যোধপুরের রাঠোররাজ যশোবন্ত সিংহের সহিত দিল্লির সম্রাট্ ঔরঙ্গজীবের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। ফতেয়া-বাদ হইতে জি, আই, পি, রেলপথের একটী শাখা রতলামে গিয়াছে। অপর শাখাটী উজ্জয়িনী, ভূপাল, ঝাঁসি হইয়া কাণপুরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের সহিত মিলিত হইয়াছে। উজ্জয়িনীর যাত্রী-দিগকে এখানে শকট পরিবর্ত্তন করিতে হয়। আমি এখানে

নামিয়া উজ্জয়িনীর গাড়ীতে উঠিলাম। ফতেয়াবাদে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতে হয়। উজ্জয়িনীর পাণ্ডাগণ গাড়ীর নিকট আসিয়া অসংখ্য প্রশ্ন করিতে লাগিল। তাহাদের সকল জিজ্ঞাসার উত্তর করা সম্ভবপর নহে, সুতরাং দুই একটা কথা বলিয়াই নীরবে বসিয়া থাকিতে হইল। অল্প রাত্রি থাকিতে পুনরায় গাড়ী ছাড়িল এবং দেখিতে দেখিতে সেই দ্রুতগামী বাষ্পশকট সূর্য্যোদয়কালে উজ্জয়িনী ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। আমি একখানি একায় আরোহণ করিয়া প্রায় সাত ঘটিকার সময় সিপ্রাতীরে পৌঁছিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অবন্তিদেশ।

অবন্তিদেশ অতিপ্রাচীন। আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে আর্য্যাবর্ত্তে আর্য্যসভ্যতা বিস্তারের বহুকাল পরে দাক্ষিণাত্য দেশসমূহে আর্য্যগণের বসতি হইয়াছিল। উপরি উক্ত মতের সহিত বোধ হয় কাহারই মতভেদ হইতে পারে না। কেন না, আর্য্যগণের পুরাতন নিবাস প্রত্নৌকস্ * ও উত্তরকুরুবর্ষ †। সেখান হইতে

---

* অনুপ্রত্নস্যৌকসো হুবে তুবিপ্রতিং নরম্।
যং তে পূর্ব্বং পিতা হুবে। ঋক্ ১।৩০।৯

† ওকো অস্য মূজবন্ত ওকো অস্য মহাবৃষাঃ।
যাবজ্জাতস্তক্মংস্তাবানসি বহ্লীকেষু ন্যোচরঃ॥
গান্ধারিভ্যো মূজবদ্ভ্যোঽঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ।
প্রৈষ্যন্ জনমিব শেবধিং তক্মানং পরিদদ্মসি॥
অথর্ব্বসংহিতা ৫।২২।

ক্রমে দক্ষিণাভিমুখে গমন করিতে হইলে বাহ্লীক, গান্ধার, পঞ্চনদ, কুরুক্ষেত্র, মধ্যদেশ, উত্তরকোশল, কাশি, বিদেহ, মগধ, অঙ্গ, দক্ষিণ-কোশল—প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া গমন করিতে হয়। অতএব পূর্ব্বোক্ত নদীমাতৃক দেশসমূহ পরিত্যাগ করিয়া যে প্রথমেই তাঁহারা অরণ্যানীসঙ্কুল বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, উহা বোধ হয় না। তবে বৈদিক কালেই যে অবন্তিপ্রভৃতি জনপদে ও আর্য্যগণ বাস করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। কারণ বেদ, রামায়ণ, মহাভারতাদি ই উহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। যখন সাগরতীরে বসিয়া কপিরাজ সুগ্রীব সমবেত বানরগণেরপ্রতি সীতা অন্বেষণের নিমিত্ত নানাদেশ পর্য্যটনের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি অন্যান্য দেশের সহিত অবন্তির নাম করেন *। আবার যখন কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধারম্ভের প্রাক্কালে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ভারতবর্ষের পর্ব্বত, নদী, ও দেশ সমূহের বিষয় বর্ণন করেন, তখনও অবন্তির উল্লেখ করিয়াছিলেন†। এতদ্ভিন্ন অধিকাংশ পুরাণে এই অবন্তিনাম পরিলক্ষিত হয়। ইহার অপর নাম মালব। কেহ কেহ বলেন "এই দেশের মালব নাম পরে হইয়াছিল"

* আব্রবন্তীমবন্তীংশ্চ সর্ব্বমেবানুপশ্যত।
বিদর্ভানৃষ্টিকাংশ্চৈব রম্যান্ মাহিষকানপি ॥
অধিগচ্ছ দিশং পূর্ব্বাং সশৈলবনকাননান্।
ব্রহ্মমালান্ বিদেহাংশ্চ মালবান্ কাশিকোশলান্ ॥
(রামায়ণ—কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্)

† অত ঊর্দ্ধং জনপদান্ নিবোধ গদতো মম।
কুন্তলোঽবন্তয়শ্চৈব তথৈবাপরকুন্তয়ঃ ॥
অথাপরে জনপদা দক্ষিণা ভরতর্ষভ।
মালবা মল্লবাশ্চৈব তথৈবাপরবল্লভাঃ ॥
(মহাভারত—ভীষ্মপর্ব্ব)

কিন্তু উক্ত কথা সম্পূর্ণ অমূলক নহে। কারণ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থসমূহে মালব নামও দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু উহা অবন্তির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয় নাই, প্রত্যুত ভিন্ন স্থলে উল্লিখিত হইয়াছে। ঐ সকল লেখা দেখিলে আপাততঃ মনে হয়, অবন্তি ও মালব দুইটী বিভিন্ন দেশ কিন্তু তাহা নহে। মহাভারতে যেরূপ ভাবে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে মালব নাম দৃষ্ট হয়, তাহাতে মনে হয় অবন্তি হইতে বহুদূর দক্ষিণে মালব নামক এক পরাক্রান্ত জাতি বাস করিত। তাহারা ই অবন্তি জনপদে বাস করায় ঐ দেশ মালবনামে পরিচিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহারা রামায়ণ ও মহাভারত রচনার পরবর্ত্তী কালে ঐ দেশ অধিকার করিয়াছিল। প্রাচীন আভিধানিক হেমচন্দ্রের মতে অবন্তি ও মালব শব্দ একার্থকও দেশবাচক। পুরাকালে এই অবন্তি দেশ কোন্ কোন্ রাজার অধিকারে আসিয়াছিল, উহার তেমন বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস পাওয়া যায় না। মহাবংশ-নামক বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে;—খৃষ্টের জন্মগ্রহণের ২৬৩ বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র অশোক অবন্তি-প্রদেশে রাজ্য করেন। উহার বহুকাল পরে অর্থাৎ খৃষ্টের জন্মগ্রহণের কিছুকাল পূর্ব্বে এই প্রদেশ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বপুরুষগণের হস্তগত হয়।

মহারাজ বিক্রমাদিত্য।

বর্ত্তমান সময় হইতে কিঞ্চিদূন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহারাজ বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসনে বিরাজিত ছিলেন। ইদানীন্তন কালে যে সকল নৃপতি ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালন

করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে ইনি অতিশয় প্রসিদ্ধ। ভারতীয় শিক্ষিত নরনারীগণের মধ্যে এরূপ লোক নিতান্ত বিরল, যাঁহারা বিক্রমাদিত্যের নাম শুনেন নাই। কিন্তু দৌর্ভাগ্যক্রমে সংপ্রতি কতিপয় ঐতিহাসিকের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা এ হেন সুবিখ্যাত নরপতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে চাহেন না। আমরা অত্যন্ত বিস্ময়বিহ্বল-চিত্তে ঐ সকল ঐতিহাসিকের গবেষণার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া সংপ্রতি উক্ত ভূপতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম। বিক্রমাদিত্য নামক যে একজন নৃপতি ছিলেন, ইহা প্রমাণ করিবার জন্ত বিশেষ আয়াসের প্রয়োজন নাই। কারণ সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাসই উহার যথেষ্ট প্রমাণ। তথাপি যদি কেহ লিখিত বৃত্তান্ত ব্যতিরেকে ঐ রাজার অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতে না চাহেন, তাঁহাদের প্রতীতির জন্ম কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। সকলেই জানেন মহাকবি কালিদাস মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বয়স্ত ছিলেন। তজ্জন্য আমরা যেখানে কালিদাস, সেই খানেই বিক্রমাদিত্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। সেই জগদ্বিখ্যাত মহাকবি "অভিজ্ঞানশকুন্তল" নামক নাটকের প্রস্তাবনায় সূত্রধারের মুখে বলিয়াছেন; "আর্য্যে! রসভাবজ্ঞ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের এই পণ্ডিত-মণ্ডলীপরিবৃত-সভা। অতএব অদ্য আমরা কালিদাস-প্রণীত অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের অভিনয় দ্বারা এই সমিতির আরাধনা করিব*"। যদি বিক্রমাদিত্য নামক কোন রাজা না থাকিতেন তাহা হইলে কালিদাস ঐরূপ লিখিবেন কেন?

---

* "সূত্রধারঃ। আর্য্যে রসভাববিশেষদীক্ষাগুরোর্বিক্রমাদিত্যস্য অভিরূপভূয়িষ্ঠা পরিষৎ। অস্যাং খলু কালিদাসগ্রথিতবস্তুনা অভিজ্ঞানশকুন্তলনামধেয়েন নাটকেনোপস্থাতব্যমস্মাভিঃ"। (অভিজ্ঞানশকুন্তলম্)

তাহার পর প্রশ্ন হইতেছে, তিনি কোন সময় বর্ত্তমান ছিলেন? আমাদের দেশে সংবৎ নামক একটী অব্দগণনা প্রচলিত আছে। কথিত আছে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জন্মদিন হইতে ঐ অব্দ-গণনা আরম্ভ হয়। এখন ১৯৫৪।৫৫ সংবৎ চলিতেছে। অতএব বর্ত্তমান সময় হইতে ১৯৫৪ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত নরপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ স্থির করা একান্ত অসঙ্গত নহে। এই রাজার আবির্ভাব কাল লইয়াও বিবিধ প্রকার বিতর্ক হইয়া থাকে। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন "মহারাজ বিক্রমাদিত্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন"। প্রকৃতপক্ষে ঐ মতটী সমীচীন নহে। কারণ উক্ত নৃপতি যে ১৯৫৪ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হন, সংবৎ নামক অব্দ-গণনাই উহার প্রমাণ। তদ্ভিন্ন আরও প্রমাণ আছে। দক্ষিণাপথের নাসিকনগরী হইতে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত শিলালিপি খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ। উহাতে "শকারি" নাম দৃষ্ট হয়। সকলেই জানেন বিক্রমাদিত্যের নামান্তর শকারি। কারণ তিনি অনেক শকবংশীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ভূপতিকে সংগ্রামে নিহত করিয়াছিলেন। আর অভিধান হইতে ও উহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। জটাধর নামক একজন প্রাচীন আভিধানিক তাঁহার কৃত অভিধানে সাহসাঙ্ক, শকারি ও বিক্রমাদিত্য * এই তিনটী শব্দ একার্থক বলিয়াছেন। অতএব ইহাদ্বারা স্থির হইল শকারি এবং বিক্রমাদিত্য একই নরপতি। তিনি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে মহারাজ বিক্রমাদিত্য কোন্ বংশে

* সাহসাঙ্কঃ শকারিঃস্যাদ্ বিক্রমাদিত্য ইত্যপি ইতি জটাধরঃ।

জন্ম গ্রহণ করেন? আমরা এ বিষয়েও প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছি। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে;—মৌর্য্যবংশীয় মগধাধিপতি মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত পারস্যাধিপ সুলুক্যের কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক বৌদ্ধধর্ম্মে অতিশয় অনুরক্ত হন। তাঁহার পুত্র মহারাজ বিন্দুসার। বিন্দুসারের পুত্র অশোক। মহারাজ অশোক মহাপরাক্রান্ত ভূপতি ছিলেন। তিনি হিমালয় হইতে কুমারিকা অন্তরীপ ও বাহ্লিক হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত স্বীয় রাজচ্ছত্রের অন্তর্গত করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম অতিবিস্তৃতি লাভ করে। ভারতের প্রতিজনপদ প্রতি-নগর ও প্রতিগ্রামে বৌদ্ধ-বিহার ও বৌদ্ধ-মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সহস্র সহস্র প্রচারক বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রচারের নিমিত্ত পৃথিবীর নানাদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। অদ্যাপি অসংখ্য গিরিশৃঙ্গ ও স্তম্ভসমূহে পালিভাষায় উৎকীর্ণ অশোকের অনুশাসন বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। সে সময়ে ভারতের রাজা প্রজা সকলেই প্রায় বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের অতিবিস্তারে বৈদিক আচারের পক্ষপাতী ব্রাহ্মণগণ শঙ্কিত হইলেন। তাঁহারা অর্ব্বুদ-পর্ব্বতে গমন পূর্ব্বক একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞবেদী হইতে চারিপ্রকার ক্ষত্রিয়উৎপন্ন হয়*। উহাদের নাম যথা;—

* ঐ চারিপ্রকার ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি বিবরণ রূপক দ্বারা প্রচ্ছন্ন। ফলতঃ মগধাধিপ অশোকের সাম্রাজ্যকালে বৈদিকধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় হইল দেখিয়া তদানীন্তন আর্য্যধর্ম্মের পক্ষপাতী ব্রাহ্মণগণ শকজাতির মধ্য হইতে বহুসংখ্যক বীরপুরুষকে আহ্বানপূর্ব্বক ক্ষাত্রধর্ম্মে দীক্ষিত করেন এবং উহাদের চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া চারিটী দেশের আধিপত্য গ্রহণের নিমিত্ত উৎসাহিত করেন। আর ঐ ক্ষত্রিয়গণকে বৌদ্ধধর্ম্ম ধ্বংসের নিমিত্ত উপদেশ দেন এবং কাহাকেও সূর্য্যবংশ, কাহাকেও চন্দ্রবংশ, কাহাকেও অগ্নিবংশ, কাহাকেও যদুবংশ বলিয়া বর্ণন করেন। শেষে ঐ অভিনব ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় দ্বারা বৌদ্ধ-

পরমার, চপহানি (চোহান), শুক্ল, পরিহারক। ইহাদের মধ্যে পরমারবংশীয় ভূপালগণ অবন্তিরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। উল্লিখিত পরমারবংশে গন্ধর্ব্বসেননামক এক নৃপতি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি উজ্জয়িনী নগরীতে দীর্ঘকাল রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া স্বীয় পুত্র শঙ্খের প্রতি রাজ্যভার অর্পণপূর্ব্বক তপস্যার্থ বনে গমন করেন। কথিত আছে;—দেবরাজ ইন্দ্র উক্ত নরপতির উগ্রতপস্যায় ভীত হইয়া তাঁহার সমাধিভঙ্গের নিমিত্ত বীরমতীনাম্নী কোন দেবাঙ্গনাকে প্রেরণ করেন। অপূর্ব্ব লাবণ্যবতী বীরমতীর সৌন্দর্য্য-দর্শনে গন্ধর্ব্বসেন তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকেই পত্নী-রূপে পরিগ্রহ করেন। সেই বীরমতীর গর্ভে বিক্রমাদিত্যের জন্ম হয়। বিক্রমাদিত্যও যে সে ব্যক্তি ছিলেন না। কথিত আছে;—শিবদৃষ্টি নামক এক ব্রাহ্মণ শিষ্যগণের সহিত বনে গিয়া দীর্ঘকাল কঠোর তপশ্চরণ করেন এবং ঐ উগ্র তপস্যার ফলে কালক্রমে তিনি শিবত্ব লাভ করেন। সেই শিবত্বপ্রাপ্ত শিবদৃষ্টিই বৌদ্ধধর্ম্মের বিনাশ ও আর্য্যধর্ম্মের পুনর্ব্বার উন্নতি সাধনের নিমিত্ত গন্ধর্ব্বসেন হইতে বীরমতীর গর্ভে বিক্রমাদিত্য নামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মকালে নভোমণ্ডল হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইয়াছিল। বিক্রমাদিত্যের বয়ঃক্রম যখন পঞ্চম বর্ষ, তখন তিনি তপস্যার্থ বনে গমন করেন। বোধ হয় এই তপস্যার অর্থ শিক্ষা। দ্বাদশ বৎসরে তিনি তপস্যা অথবা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া উজ্জয়িনী নগরীতে প্রত্যাগত হন। উজ্জয়িনী প্রাচীন নগরী হইলেও মহারাজ বিক্রমাদিত্য ইহাকে

ধর্ম্মাবলম্বী নরপতিগণ নিহত ও বৌদ্ধধর্ম্ম বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত হয়। এরূপ কৌশল অবলম্বন করায় বৈদিকধর্ম্মের রক্ষা ও ব্রাহ্মণগণের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। অদ্যাপি রাজপুতগণের মধ্যে শকজাতির অনুরূপ অনেক আচার ব্যবহার দৃষ্ট হয়।

অধিকতর সমৃদ্ধিশালিনী করেন। তাঁহার প্রযত্নে সহস্র সহস্র প্রাসাদ, অট্টালিকা ও রাজপথ শিপ্রাতীরস্থ ঐ নগরীর শোভা সম্পাদন করিয়াছিল। কথিত আছে;—স্বয়ং মহাদেব তাঁহার নিমিত্ত একখানি দিব্য সিংহাসন প্রেরণ করেন। উহা দ্বাত্রিংশৎটী পুত্তলিকাদ্বারা সুশোভিত ছিল। ঐ সিংহাসনই শেষে "বত্রিশ সিংহাসন" নামে খ্যাতিলাভ করে। বিক্রমাদিত্য পার্ব্বতীরও অতিশয় ভক্ত ছিলেন। তজ্জন্য স্বয়ং পার্ব্বতী রাজার দেহ-রক্ষার্থ বেতালকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মহাদেব তাঁহার উপাস্যদেব ছিলেন। তজ্জন্য প্রত্যহ তিনি প্রাচীন মহাকালেশ্বরের মন্দিরে গিয়া দেবদেব পিনাকীকে বিবিধ উপকরণ দ্বারা পূজা করিতেন। রাজা যে মহতী ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত করেন, উহা একটী প্রশস্ত উদ্যান-মধ্যস্থ সৌধোপরি অবস্থিত ছিল। উহার চতুর্দ্দিকে নানারত্নখচিত ধাতুময় স্তম্ভসকল বিরাজ করিত। তিনি নানাশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিয়া ঐ সভার সদস্যপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সভার মধ্যস্থলে মহারাজ বিক্রমাদিত্য দ্বাত্রিংশৎ-পুত্তলিকা-পরিশোভিত সিংহাসনে উপবেশন করিতেন। তাঁহার চতুর্দ্দিকে নানাদিগ্‌দেশীয় বিদ্বদ্বর্গ স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসন পরিগ্রহ করিয়া বিবিধশাস্ত্রের আলোচনায় সহৃদয় নরপতির পরিতোষ উৎপাদন করিতেন*।

ভবিষ্যপুরাণের উপরি উক্ত বর্ণনার স্থানে স্থানে দুই একটী কথা অতিরঞ্জিত কিংবা অলৌকিক হইলেও উহা দ্বারা আমরা

* ভবিষ্যপুরাণ—প্রতিসর্গপর্ব্ব—চতুর্যুগখণ্ডাপরপর্য্যায়-কলিযুগ-রবিশশি-ভূপবংশবর্ণন নামক ষষ্ঠ, সপ্তম অধ্যায়। (ক্ষেমরাজ-কৃষ্ণদাসকর্তৃক প্রকাশিত বম্বে বেঙ্কটেশ্বর মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত পুস্তক পাঠ করুন।)

অবগত হইতে পারি, কিঞ্চিৎ উন দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমাদিত্য নামে একজন বিদ্বান্ পরাক্রান্ত শৈব নরপতি উজ্জয়িনীর সিংহাসনে অধিরূঢ় ছিলেন। পুরাণে যে মহতী ধর্ম্মসভার উল্লেখ আছে, উহাই বোধ হয় তাঁহার প্রতিষ্ঠিত নবরত্নসভা। ইহার দ্বারা তিনি যে একজন বিদ্বান্ নৃপতি ছিলেন এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কারণ স্বয়ং বিদ্বান্ না হইলে কেহ বিদ্বান্‌কে আদর করিতে পারে না! আর কবিগণের প্রতি আদরাতিশয় দর্শনে তাঁহার গুণগ্রাহিতারও যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাণকার তাঁহার প্রতি "বৌদ্ধহন্তা" এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। উহাদ্বারা বুঝিতে পারা যায় তিনি অনেক বৌদ্ধ নরপতিকে নিহত করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কিম্বদন্তীরও অভাব নাই। তাঁহার জীবৎকালে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল আধিপত্য ছিল। অবন্তির সন্নিহিত মগধ, দক্ষিণ-কোশল, বিন্ধ্যারণ্য, উৎকল, কলিঙ্গ, কাঞ্চী প্রভৃতি স্থানে বিদ্বান্ বৌদ্ধ যতিগণ বৌদ্ধধর্ম্ম ও বৌদ্ধশাস্ত্র প্রচারে ব্রতী ছিলেন এবং তদানীন্তন ভারতের অধিকাংশ নৃপতিরই বৌদ্ধমতের প্রতি যথেষ্ট আস্থা ছিল। ঐরূপ সময়ে জন্ম গ্রহণপূর্ব্বক প্রতিদ্বন্দ্বী নৃপতিগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তিনি কিরূপ অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিগণই বুঝিতে পারেন। শাক্যমুনির প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বেদাচারকে বিলুপ্তপ্রায় করিয়াছিল, এমন সময়ে সহসা বিক্রমাদিত্যের ন্যায় ভূপতির আবির্ভাবে উহার দেহে যে পুনরায় বলের সঞ্চার হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। সে সময় ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ জ্ঞানালোকে আলোকিত। কোন কোন দেশ শক্তিত হিন্দুরাজাদের করায়ত্ত, কোন কোন দেশ বা শিক্ষিত

বৌদ্ধনৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল। ধর্ম্মবিষয়ে পরস্পর মতভেদ থাকিলেও সে সময়ে বিদ্যালোচনায় কেহই পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তজ্জন্য বিক্রমাদিত্য উজ্জয়িনীর সিংহাসন লাভ করিয়াই জ্ঞানানুশীলনে মনোনিবেশ করেন, তাঁহার নবরত্ন-সভা উহার দৃষ্টান্ত স্থল। বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহীর ধর্ম্ম নহে, উহা গৃহ-ত্যাগীর ধর্ম্ম। যাহাদের সংসারে পূর্ণ আসক্তি, প্রমদার লোল কটাক্ষ দর্শনের জন্য যাঁহাদের হৃদয় তৃষিত, পুত্রকন্যার সহাস্য মুখ দেখিয়া যাহারা জীবন সার্থক মনে করে, তাহাদের নিকট ইন্দ্রিয়সংযম, বাসনা-ত্যাগ ও নির্ব্বাণলাভের উপদেশ কেবল বিড়ম্বনামাত্র। কোন কোন স্থানে কেবল রাজশাসন ও প্রচলিত পদ্ধতি-রক্ষার অনুরোধেই বৌদ্ধধর্ম্ম অনুসৃত হইত, প্রকৃত প্রস্তাবে উচ্চশিক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত সাধারণ লোকের বোধ হয়, উক্ত ধর্ম্মমতের প্রতি আকর্ষণ তত অধিক ছিল না। সেই সময়ে ক্রমে শৈব মতেরও অভ্যুদয় হইতেছিল। রাজা বিক্রমাদিত্য স্বয়ং শৈব সুতরাং তাঁহার মন্ত্রী, অমাত্য, দূত, অন্যান্য কর্ম্মচারী এবং প্রজাসকল শিবোপাসনায় নিরত হইল। অন্যান্য দেশের ক্ষুদ্র নৃপতিগণও বিক্রমাদিত্যের অনুগামী হইতে লাগিলেন। বিক্রমাদিত্য যেমন বিদ্যারসজ্ঞ তেমনি আমোদপ্রিয় ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কালিদাসের ন্যায় মহাকবি আসিয়া তাঁহার বরস্যপদবীতে অধিরূঢ় হওয়ায় মণিকাঞ্চনের যোগ হইয়াছিল। কালিদাসের মনোহারিণী কবিতা রাজার চিত্ত আকর্ষণ করিল। রাজা উজ্জয়িনী রাজধানীতে নাট্যশালা নির্ম্মাণ করিলেন। বসন্তকালের প্রারম্ভে মহাকালের যাত্রামহোৎসবে ঐ রঙ্গালয়ে প্রতিবৎসর অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশীপ্রভৃতি অভিনব দৃশ্যকাব্যের অভিনয় হইতে লাগিল। উজ্জয়িনীর অধিবাসিগণ

অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করিল। সামাজিকগণ অভিনয় দর্শনে বিমোহিত হইয়া কালিদাস ও বিক্রমাদিত্যকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। এইরূপে বিক্রমাদিত্যের নাম দিগ্‌দিগন্তে প্রতিধ্বনিত হইল। তিনি অদ্বিতীয় সম্রাটের ন্যায় প্রভূত পরাক্রমও দক্ষতার সহিত রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহার যশঃসৌরভে ভারতবর্ষ পরিব্যাপ্ত হইল। নানাদিগ্‌দেশীয় পণ্ডিত ও গুণিগণ আসিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। রাজাও বদান্যতা-গুণে তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিয়া গুণজ্ঞতার পরিচয় দিতে লাগিলেন। এই রূপে তিনি প্রজাবৃন্দের প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার পার্থিব দেহ-ধ্বংস হইলেও তিনি কীর্ত্তি-দেহে বিরাজমান হইয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন।

আমরা উপরে যে বিক্রমাদিত্যের বিবরণ বিবৃত করিলাম, ইনি প্রথম বিক্রমাদিত্য। ইহার পর বিক্রমাদিত্য নামধেয় অপর কয়েকজন ভূপতি উজ্জয়িনীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে ষষ্ঠ শতাব্দীর বিক্রমাদিত্যদ্বয় সবিশেষ প্রসিদ্ধ। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদ্ বলেন "স্থাণ্বীশ্বরের অধীশ্বর সেই প্রসিদ্ধ সম্রাট্ হর্ষদেব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণপূর্ব্বক উজ্জয়িনীর সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন"*। উক্ত মত একান্ত অসমীচীন নহে, কারণ বাণভট্ট কৃত হর্ষচরিত পাঠে জানা যায়, মালবরাজ, হর্ষদেবের ভগিনীপতি কান্যকুব্জের অন্যতম রাজা গ্রহবর্ম্মাকে নিহত করিয়া রাজ্ঞী রাজশ্রীকে (হর্ষ-

* ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করুন।

দেবের ভগিনীকে) কারারুদ্ধ করেন*। হয়ত ঐ বৈর-প্রতিশোধের নিমিত্ত হর্ষদেব মালবরাজকে পরাজিত করিয়া বিক্রমাদিত্য নাম-গ্রহণপূর্ব্বক উজ্জয়িনীর সিংহাসন অধিকার করিয়া থাকিবেন। ইহার অব্যবহিত পরেই যশোবর্ম্মদেব বিক্রমাদিত্য নামে উজ্জয়িনীর সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক নৃপতি বিক্রমাদিত্য আখ্যায় আপনাদিগকে পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। ভবিষ্যপুরাণ-মতে ইহার কিছুদিন পরে নিম্নলিখিত আঠারটী দেশ ভিন্ন ভিন্ন নৃপতিকর্ত্তৃক শাসিত হইত। পশ্চিমে সিন্ধুতীর, দক্ষিণে সেতুবন্ধ, উত্তরে বদরীস্থান, পূর্ব্বে কপিল। এই চতুঃসীমার অন্তর্গত ইন্দ্রপ্রস্থ, পাঞ্চাল, কুরুক্ষেত্র, কপিল, বৃন্দাবন, অন্তর্বেদী, আজমের, মরুধন্বন্, গুর্জ্জর, মহারাষ্ট্র, দ্রাবিড়, কলিঙ্গ, অবন্তি, উড়ুপ, বঙ্গ, গৌড়, মগধ, কোশল নামক আঠারটী দেশ আঠারটী ভূপতির অধিকৃত ছিল। ঐ সময় শকভূপতিগণ পূর্ব্বোক্ত নৃপতিগণের রাজ্যে নানাভাষা ও নানাধর্ম্মের সংবাদ অবগত হইয়া বহুসৈন্য সহিত আগমনপূর্ব্বক ঐ সকল রাজ্য লুণ্ঠন ও অধিকার করিয়াছিল। এই সময় রাজা শালিবাহন উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরূঢ় হন। তিনি শকভূপতিদিগকেও অন্যান্য আততায়ীদিগকে দণ্ডিত করিয়া তাড়াইয়া দেন। শালিবাহন অত্যন্ত পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। তিনি দিগ্বিজয়প্রসঙ্গে যখন হূনদেশে গমন করেন, তখন খৃষ্টধর্ম্মপ্রচারক ঈশক্রুষ্টের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি ঈশক্রুষ্টের মুখে ধর্ম্মমত শ্রবণ করিয়া সন্তোষ ও প্রীতিপ্রকাশপূর্ব্বক আপনি এই দেশেই ধর্ম্ম প্রচার

* বাণভট্ট-কৃত হর্ষচরিত পাঠ করুন।

করুন, আর ভারতবর্ষে আপনার যাইবার প্রয়োজন নাই" এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন। তাহার পর, ভোজরাজ মালবের অধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি ও পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। ভোজরাজ দিগ্বিজয়ার্থ বাহীকদেশ পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। ঐ দেশে ম্লেচ্ছাচার দেখিয়া ধর্ম্মনাশ ভয়ে প্রত্যাবৃত্ত হন। সিন্ধুতীরে শিষ্যগণে পরিবেষ্টিত মহামদ নামক একজন মহামদীয় ধর্ম্মপ্রচারকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল*। উজ্জয়িনীর কয়েকটী প্রসিদ্ধ ভূপতির বিষয় মাত্র উল্লেখ করা গেল, ইহা ব্যতীত এখানে কত কত নৃপতির উত্থান পতন ঘটিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে?

স্বর্গতে বিক্রমাদিত্যে রাজানো বহুধাভবন্।
তথাষ্টাদশ রাজ্যানি তেষাং নামানি বৈ শৃণু॥

নানাভাবাঃ স্থিতাস্তত্র বহুধর্ম্মপ্রবর্ত্তকাঃ।
এবমব্দশতং জাতং ততস্তে বৈ শকাদয়ঃ॥

. . . .

একদা তু স ভূপালো হিমতুঙ্গং সমাযযৌ।
হূনদেশস্য মধ্যেতু গিরিস্থং পুরুষং শুভম্॥
দদর্শ বলবান্ রাজা গৌরাঙ্গং শ্বেতবস্ত্রকম্।
কোভবানিতি তং প্রাহ সহোবাচ মুদান্বিতঃ॥
ঈশপুত্রঞ্চ মাং বিদ্ধি কুমারীগর্ভ-সম্ভবম্।
ম্লেচ্ছধর্ম্মস্য বক্তারং সত্যব্রতপরায়ণম্॥

. . . .

ভূপতি দ'শমো যো বৈ ভোজরাজ ইতি স্মৃতঃ।
দৃষ্টা প্রক্ষীণমর্য্যাদাং বলী দিগ্বিজয়ং যযৌ॥

. . . .

মহামদ ইতি খ্যাতঃ শিষ্যশাখাসমন্বিতঃ।
মহামদশ্চ তৈঃ সার্দ্ধং সিন্ধুতীরমুপাযযৌ॥

(ভবিষ্যপুরাণ—প্রতিসর্গপর্ব্ব)

ভারতের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়।

(নবরত্নসভা)

"বিশ্ববিদ্যালয়" শব্দটী আধুনিক হইলেও উহার প্রতিপাদ্য বস্তু নূতন নহে। যে সময়ে ঋষিগণ কোন পুণ্যনদীর তীরে অথবা নির্ঝরসন্নিহিত শৈল-নিতম্বে আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া বটুগণকে উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত এই ত্রিবিধ স্বরে বেদ শিক্ষা দিতেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্ব না থাকিলেও বৈদিক সময়ের কিছুদিন পরেই যে উহার সৃষ্টি হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষে কখন কি রূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সৃষ্টি হয়, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। আমরা প্রাচীন বৌদ্ধ-সংস্কৃত-গ্রন্থ ও পালি-ভাষায় বিরচিত পুস্তকসমূহ পাঠে জানিতে পারি, প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম ভাগে তক্ষশিলায়* একটী বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে নিখিল শাস্ত্রবেত্তা ঋষিগণ অধ্যাপক ছিলেন। দুঃখের বিষয় সকলের বিবরণ অবগত হওয়া যায় না, কেবল মহর্ষি আত্রেয় ও অন্যান্য দুই একটী ঋষির নামমাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায়†। কিন্তু যাঁহারা তক্ষশিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন

---

* তক্ষশিলা অতিপ্রাচীন নগরী। ইহা প্রাচীন গান্ধার দেশের অন্তর্গত। বর্ত্তমান রাবলপিণ্ডী হইতে অধিক দূরবর্ত্তী নহে। বাল্মীকি-রামায়ণ ও মহাভারতে ইহার বর্ণনা দৃষ্ট হয়। তক্ষবংশীয় রাজগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। চীন-পরিব্রাজক হুয়েনসাঙ্ লিখিয়াছেন "এই নগরের শোভা অতিমনোরম ছিল। রাজধানীর উত্তরপশ্চিম অংশে নাগরাজ এলাপত্রের একটী সরোবর ছিল। বিবিধ বর্ণের পদ্মপুষ্পে এই জলাশয়টী সর্ব্বদা শোভিত থাকিত।" অশোকের সময়ে ইহা মহারাজ অশোকের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হয়। এখন ৬ বর্গ মাইল ব্যাপিয়া ইহার ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে।

† সংস্কৃত বৌদ্ধজাতক গ্রন্থ পাঠ করুন।

করিয়া জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের কাহার কাহারও বৃত্তান্ত স্থানে স্থানে লিপিবদ্ধ আছে। সংস্কৃত জাতকনামক গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, জীবকনামা একজন চিকিৎসা-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তাঁহার জন্মভূমি মগধ। তিনি একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ। তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নত জ্ঞানচর্চ্চা হয়, এই সংবাদ অবগত হইয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে করিতে সেখানে উপস্থিত হন। তখন তক্ষশিলার মঠসমূহে বেতন গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। কারণ তখন নানা দেশের রাজকুমার ও ধনি-পুত্রগণ ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন। তত্রত্য অধ্যাপক জীবককে উহা জানাইলে তিনি স্বীয় দুর্দ্দশার বিষয় নিবেদন করিয়া ভৃত্যত্ব স্বীকারপূর্ব্বক অধ্যয়নের প্রার্থনা বিজ্ঞাপন করেন। করুণহৃদয় অধ্যাপক মহর্ষি আত্রেয়+ জীবকের

+ চরকসংহিতায় প্রারম্ভে লিখিত, আছে;—প্রথম প্রজাপতি দক্ষকে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় দক্ষের নিকট উক্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। পরে ইন্দ্র অশ্বিনীকুমার হইতে আয়ুর্ব্বেদ পরিগ্রহ করেন। তাহার পর পৃথিবীতে রোগ প্রাদুর্ভূত হওয়াতে অঙ্গিরা জমদগ্নি ভরদ্বাজ ভৃগু আত্রেয় প্রভৃতি ঋষিগণ হিমালয়-সন্নিহিত স্থানে এক সভা করেন এবং উহাতে স্থির হয়, আরোগ্যই ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষের প্রধান সাধন। পৃথিবীতে রোগের আবির্ভাবে উক্ত পুরুষার্থ-চতুষ্টয় বিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছে। অতএব ইন্দ্রই এই বিপদের উদ্ধারকর্ত্তা, সংপ্রতি তাঁহার শরণাগত হওয়া আবশ্যক। তাহার পর তাঁহারা ভরদ্বাজকে ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন। ভরদ্বাজ ইন্দ্রের নিকট হইতে আয়ুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া আসিয়া অগ্নিবেশ প্রভৃতি ছয়জন ঋষিকে উহা শিক্ষা দেন। অগ্নিবেশ প্রভৃতি ঋষিগণ স্ব স্ব নামে তন্ত্র রচনা করিয়া আত্রেয় প্রভৃতি শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। বোধ হয় চরক সংহিতায় বর্ণিত আত্রেয় ও এই আত্রেয় একই ব্যক্তি হইবেন। তাহা হইলে হিমালয়-প্রদেশস্থ তক্ষশিলায়ই বোধ হয় ঋষিদের সভা হইয়াছিল।

প্রার্থনায় সম্মত হইলে তিনি ঐ স্থান হইতে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হন, এবং মগধদেশে মঠ নির্ম্মাণ করিয়া চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যাপন করেন। তাঁহার ছাত্রগণ রোগীদের গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া রোগপ্রতীকারের ব্যবস্থা ও ঔষধাদি প্রদান করিয়া বেড়াইতেন। বোধ হয় সেই সময় হইতেই ভ্রমণশীল চিকিৎসকের সৃষ্টি হয়। তিনি অতিবৃদ্ধ বয়সে বুদ্ধদেবের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। আর যে শাক্যমুনি স্বপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোকে জগৎ আলোকিত করিয়া গিয়াছেন, তিনিও তক্ষশিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি সদ্ধর্ম্ম প্রচারের পূর্ব্বে এই স্থানে আগমনপূর্ব্বক দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রায় ২৫২৬ বৎসর পূর্ব্বে ভগবান্ শাক্যসিংহ আবির্ভূত হন, তখন তক্ষশিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ অভ্যুদয়*। সর্ব্বপ্রধান বৈয়াকরণ মহর্ষি পাণিনি ও তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি অন্যূন ২২৭৫ বৎসর পূর্ব্বে গান্ধার প্রদেশের শালাতুরগ্রামে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণবংশে দাক্ষীনাম্নী জননীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। পাণিনি পুষ্পপুরে আগমনের পূর্ব্বে তক্ষশিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তেবাসী ছিলেন। আর মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তিনি জন্মভূমি ইলাবৃতবর্ষ হইতে প্রয়াগে আগমনকালে ঐ স্থানে কিয়ৎ-কাল অবস্থান করিয়া বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে আর একটী বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। উহা মগধের অন্তর্গত "নরেন্দ্র বিহার-বিশ্ববিদ্যালয়"। নরেন্দ্র অর্থাৎ ভারত-

* যদিও ললিতবিস্তরে ভগবান্ শাক্যসিংহের তক্ষশিলা-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের বিষয় বর্ণিত হয় নাই। কিন্তু জাতকগ্রন্থে সুস্পষ্ট বর্ণনা থাকায় ঐ বিষয়ে সন্দেহ করা যায় না। কারণ ললিতবিস্তর অপেক্ষাও জাতক প্রামাণিক।

সম্রাট্ অশোকের কৃত বিহার (মঠ) সেখানে ছিল বলিয়া উহার "নরেন্দ্র-বিহার" নাম হয়। শেষে পালি-ভাষায় উচ্চারণবৈষম্যে উহা 'নালন্দ-বিহার' নামে খ্যাত হইয়াছিল। বৌদ্ধেরা বিশ্ববিদ্যালয়কে "সঙ্ঘারাম" নামে অভিহিত করিতেন। ঐ স্থানে একটী সুবৃহৎ ছাত্রাবাস ছিল, তাহাতে নিয়ত দশসহস্র বিদ্যার্থী বাস করিত। প্রসিদ্ধ দার্শনিক নাগার্জ্জুন, আর্য্যদেব, কুমারলব্ধ, শীলভদ্র, চন্দ্র-কীর্ত্তি প্রভৃতি বিখ্যাত অসংখ্য মনীষী ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থান করিয়া অধ্যাপনা কার্য্য সম্পন্ন করিতেন*।

এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরই উজ্জয়িনী-বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা "নবরত্নসভা" নামে প্রসিদ্ধ। রত্নসদৃশ নয়টী প্রধান মনীষী উহার সদস্য ছিলেন বলিয়া উহা নবরত্নসভা নামে আখ্যাত হইত। এই নবরত্নসভার ন্যায় সুবিশ্রুত সভা ভারতবর্ষে আর যে কখনও বিদ্যমান ছিল, উহার কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই সভায় যে সকল সুধী বিরাজিত ছিলেন, তাঁহারা এক একজন ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত ভাষায় যে সকল গ্রন্থ অধীত ও অধ্যাপিত হয়, উহার অনেকগুলি গ্রন্থ এই নবরত্নসভার পণ্ডিতগণের বিরচিত। এক সময়ে নবরত্নসভাকে ভারতবর্ষীয় বিদ্বন্মণ্ডলী নিকষপাষাণ-সদৃশ মনে করিতেন। এখানে না আগমন করিলে কাহারই জ্ঞানের পরিমাণ নির্ণীত হইত না। তজ্জন্য নানাদিগ্‌দেশ হইতে নিখিল কবিগণ এবং পণ্ডিতবর্গ বহু আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক আসিয়া নবরত্নসভায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন এবং এখানে আসিয়া বিনি

* See Buddhist records of the western world. Vol. I and II.

কবিত্ব প্রকাশ অথবা শাস্ত্রীয় বিচারে কৃতকার্য্য হইতেন। তিনিই অন্যান্য দেশে গিয়া পূজিত হইতে পারিতেন। এই জন্যই নবরত্নসভা ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধবনিতার নিকট এত সুপরিচিত। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় ঈদৃশ সুপ্রসিদ্ধ সভার কোন ইতিবৃত্ত নাই। জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামক একখানি সংস্কৃত জ্যোতিষগ্রন্থে নবরত্নসভার নিম্নলিখিত নয়জন পণ্ডিতের নাম উল্লিখিত হইয়াছে যথা;—ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি*। কিন্তু আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম এই নয়জন পণ্ডিতের কোন প্রকারেই সমসাময়িকত্ব প্রমাণ করা যায় না। অথচ সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাস এই নয়জন পণ্ডিত এক সময়ে নবরত্নসভা অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন। বোধ হয় জ্যোতির্ব্বিদাভরণের ঐ শ্লোকটী পাঠ করিয়াই সাধারণের ঐরূপ ধারণা উৎপন্ন হইয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, অনুসন্ধান দ্বারা আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, ক্রমে তাহা বিবৃত করিতেছি। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে;—বিক্রমাদিত্য নামক নরপতি একজন ছিলেন না, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে কতিপয় নরপতি বিক্রমাদিত্য নাম গ্রহণ করিয়া উজ্জয়িনীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। প্রথম বিক্রমাদিত্য নবরত্নসভার সৃষ্টি করিলেও পরবর্ত্তী নৃপতিগণের অধিকার কালেও উহা বিলুপ্ত হয় নাই। যখন যে পণ্ডিত পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার স্থানে সেই শাস্ত্রে পারদর্শী অপর কোন

* ধন্বন্তরিক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু বেতালভট্ট-ঘটকর্পর-কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য॥
(জ্যোতির্ব্বিদাভরণম্)

বিখ্যাত পণ্ডিত বোধ হয়, সেই নাম ধারণপূর্ব্বক নিযুক্ত হইয়াছেন। এই রূপে যত কাল উজ্জয়িনীতে রাজধানী ছিল, তত দিন ঐ নবরত্নসভা প্রসিদ্ধি ও গৌরবের পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ঐ সভায় চিরকালই নয় জন বরিষ্ঠ পণ্ডিত প্রধান সদস্য থাকিতেন। অতএব জ্যোতির্ব্বিদাভরণোক্ত নয় জন পণ্ডিত যে, কোন সময়ে নবরত্ন-সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তবে তাঁহাদের আবির্ভাবকাল এক নহে। ঐ সকল পণ্ডিতের গ্রন্থগুলি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলেও এই মতের যাথার্থ্য অবগত হওয়া যায়। ঐ সকল মনীষীর জীবনবৃত্তান্ত জানিবার জন্য অনেকেই কৌতূহল প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু এমন কোন গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, যাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের ধারাবাহিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে।

তবে তাঁহাদের স্বরচিত গ্রন্থাদিও জনশ্রুতি হইতে যাহা সঙ্কলন করিতে পারিয়াছি, এস্থলে তাহা বর্ণন করিতেছি। কিংবদন্তীগুলি অতিরঞ্জিত হইলে ও অনেক সময় উহা হইতে ও কিছু কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তজ্জন্য উহা পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নবরত্ন-চরিত।

মহাকবি কালিদাস। কালিদাস ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান মহাকবি। তাঁহার ভাষা, তাঁহার ভাব, তাঁহার উপমা সংস্কৃত-ভাষার গরীয়সী সম্পদ্। তিনি কাব্য-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়া যে রূপ শব্দ-বিন্যাসপ্রণালী আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, উহাই যাবতীয় কাব্য-সংক্রান্ত ভাষার উপজীব্য। পরবর্ত্তী অধিকাংশ কবি তাঁহারই কবিতাকে আদর্শ করিয়া নূতন নূতন পথে বিচরণ করিয়াছেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের আবির্ভাব-কালের ন্যায় মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাব-কাল লইয়াও প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে বিবিধ বিতর্ক দৃষ্ট হইয়া থাকে*। আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি মহাকবি কালিদাস মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বয়স্য ছিলেন। এবিষয়ে কিম্বদন্তী অথবা প্রমাণের একান্ত অভাব নাই। অতএব কালিদাস বর্ত্তমান সময় হইতে কিঞ্চিদূন ১৯৩০।৩১ বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এরূপ অনুমান করিলে বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত হয় না। যদিও তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত-সংক্রান্ত কোন লিখিত বৃত্তান্ত প্রাপ্ত

* কলিকাতা "সাহিত্যসভা" হইতে প্রকাশিত সাহিত্য-সংহিতা-নামক মাসিক পত্রের ১ম ভাগ ৪র্থ সংখ্যায় (১৩০৭ সাল শ্রাবণ) মল্লিখিত "কালিদাসের আবির্ভাবকাল" শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করুন।

হওয়া যায় না, কিন্তু ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই কালিদাস সম্বন্ধে দুই একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু উহা ব্যতীত তাঁহার জীবনী-বিষয়ে কেহই বিশেষ কোন প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন না। তবে যে তিনি উজ্জয়িনী নগরীতে তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় যাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার লেখা হইতে উহা আবিষ্কার করা তত কঠিন নহে। কালিদাস উজ্জয়িনী নগরীতে দীর্ঘ কাল বাস করিয়াছিলেন বলিয়া যে, উক্ত নগরীই তাঁহার জন্মভূমি একথা নিশ্চয়রূপে বলা যায় না। বরং উহার বিপরীত সিদ্ধান্তই মনোমধ্যে সমুদিত হইয়া থাকে। প্রায় সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, খ্যাতিলিপ্সু নরপতিগণ স্বদেশীয় পণ্ডিতগণের অপেক্ষা বৈদেশিক বিদ্বদ্বর্গের প্রতিই অধিকতর সমাদর দেখাইয়া থাকেন। অতএব কালিদাস যে, ভিন্ন প্রদেশ হইতে আগমন করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, উহাই অধিকতর সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। আমি কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মিথিলায় গমন করি। তদানীন্তন মিথিলেশ মহারাজ লক্ষ্মীশ্বরসিংহ-বাহাদুরের সভাস্থ প্রধান নৈয়ায়িক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বিশ্বনাথঝাঁ মহাশয় অতিদৃঢ়তা সহকারে বলেন "কালিদাসের জন্মভূমি মিথিলা"। উক্ত পণ্ডিত মহোদয় মিথিলায় প্রচলিত কালিদাস-সংক্রান্ত একটী কিম্বদন্তীর উল্লেখ করেন। আমি উক্ত জনশ্রুতিটী ও প্রচলিত অন্যান্য কিম্বদন্তীগুলি যথাক্রমে বিবৃত করিতেছি।

প্রথম কিম্বদন্তী। কথিত আছে:—মিথিলায় দরভঙ্গা নগরীর কয়েক ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্ব ভাগে বাগ্‌মতী নদীর তীর হইতে কিয়দ্দূরে ... নামক একটী পল্লীগ্রাম ছিল। অদ্যাপি নাকি উক্ত

গ্রামের চিহ্ন বিদ্যমান আছে। একদিন সেই পল্লীবাসীরা এক স্থানে সমবেত হইয়া নানাবিধ হাস্য পরীহাস করিতেছে, এমন সময়ে তাহাদের এক জন বলিল "আমাদের মধ্য হইতে যে কেহ রাত্রি দ্বিপ্রহর-কালে বাঘ্বতীর শ্মশানে যাইতে পারিবে, আমরা সকলে উদর পূর্ণ করিয়া তাহাকে চিড়া দধির ফলাহার দিব।" এই উচ্চৈট্-গ্রাম হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে বাঘ্বতী নদীর তীরে একটী মহাশ্মশান ছিল। উহার চতুর্দ্দিকে দুই তিন ক্রোশের মধ্যে লোকালয় ছিল না। অধিকন্তু শ্মশানপার্শ্বে বৃহৎ-বৃহৎ-পুরাতন-বৃক্ষ-সঙ্কুল একটী অরণ্যানী ছিল। নরকপাল ও অস্থিরাশিপরিব্যাপ্ত ঐ শ্মশানক্ষেত্র, শৃগাল-কুকুরাদির ভীষণ রবে নিতান্ত ভয়াবহ বোধ হইত। রাত্রিকালে দূরে থাকুক, দিবসেও কেহ একাকী ঐ স্থানে যাইতে সাহসী হইত না। বাঘ্বতী-শ্মশানের নাম শুনিয়াই সকলে নীরব হইল। যাওয়ার কথা সুদূর পরাহত, সেই স্থানের ভীষণ দৃশ্য স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় অনেকের হৃৎপিণ্ড বিকম্পিত হইতে লাগিল। সেই সময়ে একটী ব্রাহ্মণযুবা ভাবিল "ফলাহার ত প্রায়ই ঘটেনা, যদিই ভাগ্যক্রমে উপস্থিত হইয়াছে, তবে ছাড়ি কেন? বাঙ্মতীর শ্মশানে একাকী গেলে কি হইবে, আমি যাইব"। তাহার পর, সে সকলের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলিল "তোমরা যদি চিড়া দধির ফলাহার দেও, তবে আমি যাইতে পারি"। সমবেত ব্যক্তিবর্গ যুবকের দুঃসাহসের কথা শুনিয়া উপহাস করিতে লাগিল। কিন্তু যখন সে দৃঢ়চিত্তে অঙ্গীকার করিল, তখন তাহাদের কথঞ্চিৎ বিশ্বাস হইল। গ্রামবাসিগণ বলিল "তুমি যে শ্মশানে যাইবে তাহার প্রমাণ কি? আমরা ত তোমার সঙ্গে যাইব না। যুবক বলিল "তোমরা বাঘ্বতীর তীরস্থ শ্মশান-কালীর মন্দিরে চিড়া

দধি রাখিয়া আইস, আমার ক্ষমতা থাকে, সেখানে গিয়া আহার করিয়া আসিব। পল্লীবাসীরা তাহাই করিল, সেই শ্মশান-সন্নিহিত অরণ্যানী-মধ্যে যে এক অতিপুরাতন কালীর মন্দির ছিল, ঐ মন্দিরে যথেষ্ট চিপিটক এক হাঁড়ী দধি লবণ শর্করা রাখিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া আসিল, এবং রাত্রি দ্বিপ্রহর পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ যুবাকে আটকাইয়া রাখিল, তাহার পর নিশীথকাল উপস্থিত জানিয়া ছাড়িয়া দিল।

প্রথমে কাহারই মনে হয় নাই যে, সত্য সত্যই ঐ যুবা শ্মশানে যাইতে পারিবে। শেষে যখন সে গ্রাম পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রান্তরের মধ্য দিয়া শ্মশানভূমি অভিমুখে ধাবিত হইল, তখন সকলে বিস্ময়েও ভয়ে অভিভূত হইল এবং তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য দুই চারি জন অগ্রসর হইল কিন্তু তখন সে অন্ধকারে মিশিয়া নয়নপথের অতীত হইয়া গিয়াছে। গ্রাম্য লোকেরা অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল, কেহ উত্তর করিল না, শেষে সকলেই আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিল "আহা, চিড়া দধির লোভে দরিদ্রের প্রাণবিয়োগ হইল, আমরা কেন তাহাকে যাইতে দিলাম, নিশ্চয় শ্মশান-সঞ্চারী প্রেত ও পিশাচগণ প্রাপ্তমাত্র তাহাকে বিনাশ করিবে"। এদিকে যুবা কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া দ্রুতবেগে সেই অরণ্য-মধ্যস্থ কালিকার মন্দিরে উপনীত হইল এবং দ্বার উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক নিরুদ্বেগে সেই চিপিটকরাশি ও দধিভাণ্ড আত্মসাৎ করিয়া প্রত্যাগমন-কালে মনে করিল 'আমি যে এখানে আসিয়া ছিলাম উহার একটা চিহ্ন রাখিয়া যাওয়া আবশ্যক'। তাহার পর, সে সেই দধিলিপ্ত হস্ত দ্বারা কালী-মূর্ত্তির দুই গণ্ডস্থলে দুইটি চপেটা-ঘাতের চিহ্ন রাখিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইল। তখন করুণাময়ী

কালীর মনে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন "হায় এই দুঃসাহসী যুবা জলাহারের লোভে বড়ই অদ্ভুত সাহসের পরিচয় দিয়াছে, অতএব ইহার প্রতি দয়া করা কর্ত্তব্য"। তাহার পর, সেই দেবী তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "ওহে যুবক! আমি তোমার সাহসের পরিচয় পাইয়া পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর, আমি এখনই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব"। যুবক বলিল "দেবি! সত্য সত্যই যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে আপনি আমাকে বিদ্যা এবং কবিত্বশক্তি প্রদান করুন"। দেবী "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। যুবক আর দেবীকে দেখিতে পাইল না। সে ভাবিতে ভাবিতে গৃহে আসিয়া সমুদয় ব্যাপার প্রকাশ করিল। গ্রামবাসিগণ যুবকের কথা শুনিয়া বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইল। পরদিন প্রভাতে যুবকের গৃহে লোক ধরেনা, বহু ব্যক্তি আসিয়া বহু প্রশ্ন করিতে লাগিল। যুবক সকলকে বিদায় দিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিল। সে ব্যাকরণ, কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন, স্মৃতি, জ্যোতিষ, বেদ, উপনিষদ্ যাহা পাঠ করিতে লাগিল, তাহাতেই অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিল। মিথিলার নানা স্থানের পণ্ডিতগণ আগমনপূর্ব্বক তাহার বিদ্যার পরিচয় গ্রহণ করিয়া চমৎকৃত হইলেন। অবশেষে পণ্ডিতগণ বলিলেন "ভগবতী কালীর কৃপায় এই যুবক অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়াছে, অতএব ইহার "কালিদাস" নাম হইল"।

দ্বিতীয় কিম্বদন্তী। কথিত আছে:—কোন রাজার বিদ্যোত্তমা নাম্নী একটী বিদুষী কন্যা ছিল। ঐ রাজকুমারী পণ করিয়াছিলেন "যিনি শাস্ত্রীয় বিচারে তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারিবেন, তিনি তাঁহারই সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইবেন"। রাজবালার

সৌন্দর্য্য ও বিদ্যার খ্যাতিতে নানা প্রদেশের রাজকুমারগণ আগমন করিতে লাগিলেন কিন্তু শাস্ত্রীয় বিচারে সকলেরই পরাজয় ঘটিল। তাঁহারা লজ্জিত ও অবমানিত হইয়া গৃহে প্রস্থান-কালে দেখিতে পাইলেন 'একটী নির্ব্বোধ লোক বৃক্ষের যে শাখায় উপবেশন করিয়াছে, তাহারই মূলচ্ছেদন করিতেছে'। ইহাতে রাজকুমারগণের মনে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল। তাঁহারা স্ব স্ব অবমাননার প্রতিশোধের নিমিত্ত ঐ মূর্খ ব্যক্তির সহিত বিদ্যাভিমানিনী রাজকুমারীর পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য মন্ত্রণা করিলেন। তাহার পর, তাঁহারা মধ্যস্থ পণ্ডিত-গণকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া সঙ্কেতে বিচার করিবার প্রস্তাব করাইলেন। রাজকুমারী উহাতে সম্মত হইলে যথাবিধি বিচার হইল এবং রাজকন্যা পরাজিত হইয়া সেই মূর্খ ব্যক্তিকে বর-মাল্য অর্পণ করিলেন। শেষে শয়ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখেন তাঁহার স্বামী নিতান্ত মূর্খ। ঐ সময়ে একটী উষ্ট্র শব্দ করিতে-ছিল, রাজকুমারী জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন্ জন্তু শব্দ করিতেছে" ? ঐ মূর্খ ব্যক্তি বলিল "উষ্ট"। তাহা শুনিয়া নৃপনন্দিনী হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। উহাতে অপ্রতিভ হইয়া ঐ ব্যক্তি পুনরায় বলিল "উট্র"। তখন রাজকুমারী আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগি-লেন "যে ব্যক্তি "উষ্ট্র" শব্দ উচ্চারণ করিতে গিয়া একবার 'র' একবার 'ষ' বিলুপ্ত করে, তাহারই করে আমি অর্পিতা হইয়াছি। হায় বিধাতা রুষ্ট বা তুষ্ট হইলে কি না করিতে পারেন* ? তাহার

* "উষ্ট্রে লুম্পতি রবা ষবা তস্মৈ দত্তা বিবিড়নিতম্বা।
কিং ন করোতি স এব হি রুষ্টঃ কিং ন করোতি স এব হি তুষ্টঃ॥

পর, তিনি মূর্খ স্বামীকে বিদায় করিয়া দিয়া গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিলেন। এই ঘটনায় ঐ মূর্খের মনে অত্যন্ত অনুতাপ হইল। সে বিষণ্নহৃদয়ে ঐ স্থান হইতে বহির্গত হইয়া অনন্যচিত্তে সরস্বতীর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইল। বাগ্‌দেবী ঐ মূর্খের উপাসনায় প্রসন্ন হইয়া উহাকে বর প্রদান করিলেন। তহাতে ঐ ব্যক্তি অনন্যসাধারণ বিদ্যা ও কবিত্ব লাভ করিল। কিন্তু তখনও বধূর কৃত অপমান তাহার স্মৃতিপথ হইতে অন্তর্হিত হয় নাই। তজ্জন্য সে একদিন রাত্রিতে কোন কৌশলে শ্বশুরালয়ের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া তাহার পত্নী যে গৃহে শয়ন করেন, উহার দ্বারদেশে করাঘাত করিল। তাহার পত্নী সংস্কৃত-ভাষায় বলিলেন "কে ?" সে আত্ম-পরিচয় দিল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কি জন্য ?" সে বলিল "অস্তি কশ্চিৎ বাগ্‌বিশেষঃ" কোন বিশেষ কথা আছে। পত্নী সহসা স্বামীর মুখে সংস্কৃত-ভাষা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন কিন্তু একবার প্রতারিত হইয়াছেন সুতরাং বিশেষ পরীক্ষা না করিয়া কি করিয়া গ্রহণ করেন ? তিনি বলিলেন "যদি অস্তি, কশ্চিৎ, বাক্, বিশেষঃ এই চারিটী পদ অবলম্বন করিয়া চারিখানি কাব্য লিখিয়া আমাকে শুনাইতে পার, তাহা হইলে আমি তোমার প্রণয়িনী হইব"। সে তাহাই করিল, অল্প দিনের মধ্যে উক্ত চারিটী পদ অবলম্বনে যথাক্রমে কুমারসম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশ ও ঋতুসংহার নামক চারিখানি কাব্য রচনা করিয়া পত্নীর করে অর্পণ করিল*।

---

* অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা (কুমারসম্ভবম্)
কশ্চিৎ কান্তা-বিরহ-গুরুণা (মেঘদূতম্)
বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ (রঘুবংশম্)
বিশেষসূর্য্যঃ স্পৃহণীয়চন্দ্রমাঃ (ঋতুসংহারম্)

রাজকুমারী ঐ সকল কাব্য পাঠে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া স্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহার সেবায় আত্মসমর্পণ করিলেন। ঐ মূর্খ ব্যক্তিই অবশেষে জগদ্বিখ্যাত মহাকবি কালিদাস হইয়াছিলেন।

তৃতীয় কিম্বদন্তী। কথিত আছে;—এক সময় বিক্রমাদিত্যের সহিত মহাকবি কালিদাসের কথঞ্চিৎ মনোমালিন্য ঘটে, তাহাতে মহারাজ বিক্রমাদিত্য বলেন "তুমি আমার রাজধানীতে যেরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারিয়াছ, অন্য কোন স্থানে গেলে এরূপ সম্মান-লাভ কদাচ ঘটিবে না। কালিদাস উহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ উজ্জয়িনী পরিত্যাগপূর্ব্বক দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং তিনি ভ্রমণ করিতে করিতে কর্ণাট-রাজ্যে সমুপস্থিত হইলেন। তদানীন্তন কর্ণাট-নরপতি অতিশয়-বিদ্বান্ ও গুণগ্রাহী ছিলেন। তাঁহার একটী দারুণ প্রতিজ্ঞা ছিল। যে কবি অভিনব কবিতা শুনাইয়া তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারিবেন, তাঁহাকে তিনি সম্মুখস্থ সমস্ত রাজ্য অর্পণ করিবেন। তজ্জন্য মন্ত্রিগণ আশঙ্কা-প্রযুক্ত দ্বারস্থ বল্লনকবিকে গোপনে বলিয়া রাখিয়াছিলেন "কোন ভাল কবি আসিলে যেন রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না দেওয়া হয়। তবে রাজার বিশ্বাসের জন্য মধ্যে মধ্যে দুই একটী কষ্ট-কবিকে যেন রাজার নিকট উপস্থিত করা হয়"। কালিদাস বল্লনকবির নিকট গমন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কবিতা রচনা করিতে পার?" কালিদাস বলিলেন "হাঁ পারি"। তাহার পর, তিনি কবিতা রচনা করিতে বলিলে কালিদাস মনে মনে চিন্তা করিলেন "রাজধানীতে যে সকল পণ্ডিত থাকেন তাঁহারা সকলেই প্রায় ঈর্ষ্যা-কলুষিত-চিত্ত, স্বীয় প্রতিপত্তির হানি হইবে আশঙ্কায় ভাল পণ্ডিতকে প্রায়ই

রাজার নিকট উপস্থিত হইতে দেন না। যাহা হউক ইহার নিকট আত্মগোপন করিতে হইবে। শেষে, তিনি একটী ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিলেন। উহাতে কোনই ভাব নাই, অধিকন্তু চতুর্থ চরণ যেন মিলাইতে না পারিয়াই "চ বা তু হি" দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিলেন*। বল্লনকবি কবিতা পাঠ করিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং নিঃশঙ্কচিত্তে কালিদাসের সহ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া রাজাকে আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "বল্লন-কবি! তোমার হাতে ও কি?" বল্লন, "শ্লোক" রাজা, "কোন্ কবির?" বল্লন, "ইহার" রাজা, (কালিদাসের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) আপনার? কালিদাস, "হাঁ" রাজা, "তবে পড়ুন" কালিদাস "পড়িতেছি কিন্তু ঘন ঘন চামর ব্যজনে পদ্মনয়নাদের হস্তেরকঙ্কণের যে ঝণৎকার-রব হইতেছে, ক্ষণকালের জন্য উহা নিবারণ করুন†"। রাজা ব্যজনকারিণীদের বিরত হইতে বলিলে কালিদাস একটী নূতন কবিতা পাঠ করিলেন। উহার মর্ম্ম এই ;—

"মহারাজ! বিধাতা আপনার যশঃ-স্বরূপ বিশুদ্ধ মুক্তাবলী ও আপনার গুণ এই দুইটী বস্তু গ্রহণ করিয়া একগাছি হার নির্ম্মাণের বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐ যশোরূপ-মুক্তার ছিদ্র (দোষ) ও গুণের অন্ত (সীমা) না পাইয়া উহা আকাশ-মণ্ডলে

* উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভূপাল! মুখং প্রক্ষালয়স্ব টঃ।
মৌক্তি তে নগরে কক্কুশ্চবৈ তু হি চ বৈ তু হি॥

† রাজন্নভ্যুদয়োঽস্তু বল্লনকবে! হস্তে কিমাস্তে তব
শ্লোকঃ কস্য কবেরমুষ্য ভবতো হূম্ পঠ্যতাং পঠ্যতে॥
কিন্ত্বাসামরবিন্দ-সুন্দর-দৃশাং দ্রাক্ চামরান্দোলনা
দুদ্বেল্লদ্ভুজবল্লী-কঙ্কণ-ঝণৎকারঃ ক্ষণং বার্য্যতাম্॥

নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। ঐ গুণ তড়িৎ ও যশোরূপ-মুক্তাবলীই তারকারূপে শোভা পাইয়া থাকে" *।

রাজা অপূর্ব্ব কবিতা শুনিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে পূর্ব্বদিকের সমুদয় রাজ্য নীরবে দান করিয়া উত্তরাভিমুখ হইয়া উপবেশন করিলেন। কালিদাস ভাবিলেন রাজা আমার কবিতা শুনিয়া সন্তুষ্ট হন নাই, প্রত্যুত বিরক্ত হইয়া অন্যদিকে মুখ করিয়া বসিলেন। তিনি আবার সেই দিকে গিয়া আর একটী নূতন কবিতা পাঠ করিলেন। রাজা সেদিকের রাজ্য ত্যাগ করিয়া আবার অপরদিকে মুখ করিয়া বসিলেন। এই রূপে যখন চারিদিকের রাজ্যই প্রদত্ত হইল, তখন রাজা ঊর্দ্ধ-মুখ হইয়া রহিলেন। কালিদাস ভাবিলেন রাজা অতিশয় কৃপণ, কিছু প্রদান করিতে হইবে ভয়ে আমার প্রতি ঐরূপ প্রতিকূল ভাব প্রদর্শন করিতেছেন। তাহার পর তিনি বলিলেন;—

"ওহে কর্ণাট-রাজ! প্রত্যুপকারের ভয়ে ঐরূপ বিমুখ হইবেন না, আমার সুধাসিক্ত বাক্যগুলি শ্রবণ করুন। আমরা পর্ব্বত, সমুদ্র, নদী, পৃথিবী বিন্ধ্যারণ্য, ঝঞ্ঝাবায়ু, চন্দ্র প্রভৃতিরও বর্ণনা করিয়া থাকি, তাহারা কি আমাদের কিছু প্রদান করে? †

---

* শ্রীমন্নাথ! ত্বদর্জ্জিতোজ্জ্বলযশঃ-সংশুদ্ধমুক্তাবলী
মাদাদৈব বিধির্বিবিক্তমমলং হারং ত্বদীয়ৈর্গুণৈঃ॥
নীরন্ধ্রামপি তাং বিলোক্য সহসা নাস্তং গুণানামপি।
উৎপিৎসু গগনাঙ্গণে সমকিরস্তাস্তে তড়িত্তারকাঃ॥

† মাগাঃ প্রত্যুপকারকাতরধিয়া বৈমুখ্যমাকর্ণয়
রে কর্ণাট-বসুন্ধরাধিপ! সুধাসিক্তানি সূক্তানি মে॥
বর্ণ্যন্তে কতিভূধরা-র্ণব-নদী-ভূগোল-বিন্ধ্যাটবী-
ঝঞ্ঝামারুত-চন্দ্রমঃ-প্রভৃতয়স্তেভ্যঃ কিমাপ্তং ময়া॥

এদিকে কালিদাসের কবিত্ব-শক্তি দেখিয়া বল্লনকবির মুখ শুকাইয়া গেল। তিনি মন্ত্রীর নিকট গিয়া সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে মন্ত্রী অন্তঃপুরে সংবাদ প্রেরণ করিলেন যে "একজন কবি আসিয়া সর্ব্বস্ব হরণ করিয়াছে" উক্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কর্ণাটরাজমহিষী অত্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া পড়িলেন। তিনি সুন্দরী দুহিতার সহিত স্বয়ং রাজসভায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন ;—

একজন কবি বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন*। একজন নদী-পুলিন হইতে,† অপর কবি বল্মীক হইতে উৎপত্তি লাভ করেন‡। সেই সকল কবি জগদ্গুরু, তাঁহাদিগকে নমস্কার করি। আধুনিক যে সকল কবি গদ্যপদ্য রচনা দ্বারা চিত্ত চমৎকৃত করেন, আমি (কর্ণাট-রাজমহিষী) তাঁহাদের মস্তকে বাম চরণ অর্পণ করি।

কালিদাস বিস্মিত হইলেন। তিনি ত এমন কোন অপরাধ করেন নাই, যাহাতে রাজমহিষী তাঁহার প্রতি ঐরূপ কঠোর বাক্য প্রয়োগ করিবেন। তাহার পর, তিনি সমুদয় রহস্য অবগত হইয়া বলিলেন ;—

আমি হস্তী অশ্ব কিছুই চাই না। আমার চিত্ত বিত্তের প্রতি কখনই ধাবিত হয় না। এই কৃশাঙ্গী রাজ-দুহিতা, যিনি মস্তকে হস্ত ন্যস্ত করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, ঐ বরবর্ণিনী আমার প্রতি কৃপা দৃষ্টি করুন§।

---

* পদ্মযোনি ব্রহ্মা। † মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। ‡ মহর্ষি বাল্মীকি।

§ ন যাচে গজালীং নবা বাজি-রাজীং
ন বিত্তেষু চিত্তং মদীয়ং কদাচিৎ।
ইয়ং সুস্তনী মস্তক-ন্যস্তহস্তা
লবঙ্গী কুরঙ্গী দৃগঙ্গীকরোতু॥

কালিদাসের প্রার্থনায় রাজা ও রাজমহিষী উভয়ে অত্যন্ত-পরিতুষ্ট হইয়া কালিদাসের করে সুন্দরী দুহিতা অর্পণ করিলেন। কালিদাস ও মনোরমা পত্নী লাভ করিয়া আনন্দে নিমগ্ন হইলেন। তাহার পর, রাজমহিষী কালিদাসের প্রতি ঐরূপ কঠোর বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে মনে লজ্জিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি আমার কবিতার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন ত? কালিদাস "হাঁ উত্তমরূপে বুঝিয়াছি"। মহিষী বলিলেন "না আপনি যাহা বুঝিয়াছেন, উহার প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। আমি বলিয়াছি অধুনা যে সকল কবি গদ্য পদ্য রচনা দ্বারা চিত্ত চমৎকৃত করেন, তাঁহাদের বামচরণ আমি মস্তকে ধারণ করি"*। মহিষীর বুদ্ধি-চাতুর্য্যে কালিদাস সন্তুষ্ট হইলেন এবং মহাপ্রতিপত্তির সহিত কর্ণাট-রাজ্যে বাস করিতে লাগিলেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য কর্ণাট-রাজ্যে কালিদাসের প্রভাবের সংবাদ পাইয়া পুনরায় মহাসমাদরে তাঁহাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করিলেন।

চতুর্থ কিম্বদন্তী। কথিত আছেঃ—কালিদাসের একটী অপূর্ব্ব-লাবণ্যবতী কন্যা ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে কবিবর ঐ কন্যাকে একটী বুদ্ধিমান্ বরে সম্প্রদান করেন এবং বিদ্যা-শিক্ষার্থ জামাতাকে গৃহে রাখেন। প্রথম ব্যাকরণ-শাস্ত্র পঠিত হইলেই কালিদাস জামাতাকে বেদান্ত-পাঠে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। বেদান্তের মায়াবাদ পাঠ করিয়া জামাতার সংসারের প্রতি বৈরাগ্য জন্মিল। তিনি পত্নীকে সংসার-বন্ধনের কারণ-স্বরূপ জানিয়া ক্রমে তাঁহার সাহচর্য্য পরিত্যাগ করিলেন। জামাতা কিশোরী ভার্য্যার চঞ্চল কটাক্ষ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য শয়নালয়ে প্রবেশ পর্য্যন্ত

* কেষাং বামচরণং অহং মূর্দ্ধ্নি দধামি।

পরিত্যাগ করিলেন। তিনি বাহিরে চতুষ্পাঠীতেই আহার ও শয়ন করিতে লাগিলেন। এই রূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, কবি-তনয়া ও কৈশোর অতিক্রম করিয়া তরুণ বয়সে পদার্পণ করিলেন। এই উদ্দাম-যৌবনে স্বামি-বিরহ তাঁহার বিশেষ যাতনা-দায়ক হইয়া উঠিল। পরিবারস্থ লোকেরা বহু চেষ্টায় ও জামাতাকে বশ করিতে পারিলনা। তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক দূরে দূরে থাকিতেন। কালিদাস এ সকল সংবাদ জানেন না। তাঁহার রাজধানীতে অসাধারণ প্রভাব, গৃহে সকল বস্তুই বিদ্যমান। কন্যার ও আদরের অভাব নাই। নিত্য নূতন বস্ত্রালঙ্কারে তিনি সুসজ্জিত হইতেছেন। কবি-মাত্রেই কিছু উদাসীন, বিশেষ কালিদাসের ঔদাসীন্যের মাত্রাটা একটু অধিক ছিল। তিনি প্রত্যহ বহুক্ষণ রাজসভায় অবস্থান করিতেন, আর অবশিষ্ট সময় নিজের নির্জন গৃহে বসিয়া কল্পনা দেবীর আরাধনায় নিরত থাকিতেন। এক দিন বসন্ত-কালের অপরাহ্নে কবি নিজগৃহে বসিয়া কবিতা লিখিতেছেন। মৃদু মন্দ সমীরণ বিকশিত পুষ্পের সৌরভ বহন করিয়া চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। সন্নিহিত আম্র-শাখায় বসিয়া কোকিল কুহু কুহু রব করিতেছে। বিরহ-বিধুরা কালিদাস-তনয়া ঐ গৃহের বারান্দায় একাকিনী হস্তোপরি বামগণ্ড ন্যস্ত করিয়া কি যেন চিন্তা করিতেছেন। ঐ সময় একটী মার্জ্জার-দম্পতী সহসা প্রাঙ্গণে আসিয়া উপনীত হইল। তন্মধ্যে মার্জ্জারটী বড় প্রেমিক, কখন ও গাত্র লেহন, কোন সময় বা বদন চুম্বন করিয়া সে প্রিয়তমার পরিতোষ উৎপাদন করিতে লাগিল। উহা দেখিয়া কবি-দুহিতার মনে বড়ই দুঃখ হইল। তিনি ভাবিলেন 'আহা! এই অশিক্ষিত তির্য্যগ্-

জাতি, ইহারাও কেমন দাম্পত্য-সুখ ভোগ করিতেছে। আমার স্বামী এমনই মূর্খ যে, বুদ্ধিবৃত্তি থাকিতেও এই প্রত্যক্ষ সুখে বঞ্চিত থাকিয়া নির্বোধের ন্যায় কল্পিত সুখের আশায় কাল যাপন করিতেছেন। অথবা তাঁহারই বা দোষ কি? তিনি যেরূপ উপদেশ লাভ করিয়াছেন, জীবনকে সেই ভাবে গঠিত করিতেছেন। পিতা জানিয়া শুনিয়া কেন তাঁহাকে বেদান্ত অধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন? এই সকল মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে তিনি মার্জারকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "দেখ মার্জার! তুমি আমার সাক্ষাতে ঐরূপ ধৃষ্টতা করিও না। পুনরায় তোমাকে ঐ রূপ করিতে দেখিলে আমি পিতাকে বলিয়া তোমার বেদান্ত পাঠে নিযুক্ত করিয়া দিব।

সহসা প্রাঙ্গণে দৃষ্টিপাত করিয়া কালিদাস লজ্জিত হইলেন এবং ঐরূপ মর্ম্মান্তিক তিরস্কারের কারণ কি, তাহা তাঁহার অবিদিত রহিলনা। পর দিন হইতে জামাতার বেদান্ত পাঠ বন্ধ করিয়া দিয়া কাব্য পাঠে নিযুক্ত করিলেন। ক্রমে জামাতার হৃদয় হইতে বৈরাগ্য প্রস্থান করিল। তিনি বাসনাক্ষয়ও মুক্তিলাভের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া পত্নীর দর্শনাকাঙ্খায় অধীর হইয়া উঠিলেন এবং বিনা আহ্বানে প্রণয়িনীর সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহার চরণপঙ্কজে আত্ম-বিক্রয় করিলেন।

পঞ্চম কিম্বদন্তী। কথিত আছে;—কালিদাস ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিয়মরক্ষায় সর্ব্বদা অবহিত থাকিতেন। তিনি ভ্রমেও অশুদ্ধ পদ ব্যবহার করিতেন না এবং অন্যের কৃত দুষ্ট-প্রয়োগ ও তাঁহার নিতান্ত অপ্রীতিকর বোধ হইত। এক দিন তিনি কোন বিশেষ তিথিতে একটী ব্রতের অনুষ্ঠানে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। উক্ত ব্রত-তিথির

আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত মৌন অবলম্বন করার বিধান আছে। গৃহে থাকিলে ভ্রমবশতঃ পাছে কথা বলিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় গৃহ হইতে দূরে কোন অরণ্যানী-সন্নিধানে বসিয়া জপ করিতে-ছিলেন। কালিদাসের আকৃতি নাকি বড় কুৎসিত ছিল। সেই সময় কোন দেশের এক রাজা শিবিকা আরোহণে ঐ বনের নিকট দিয়া যাইতে ছিলেন। পূর্ব্বে বস্তুলোক পাইলেই রাজারা বলপূর্ব্বক তাহার দ্বারা কাজ করাইয়া লইতেন সুতরাং কালিদাসকে পাইয়া ঐ নৃপতি কোন বনেচর ভাবিয়া শিবিকা বহনে নিযুক্ত করিলেন। কবি ও ব্রত-ভঙ্গ-ভয়ে কথা বলিতে পারিলেন না, নীরবে শিবিকা-বহন করিয়া চলিলেন। অনেক-দূর পর্য্যন্ত গিয়া রাজা দেখিলেন নূতন বাহকটী অন্য বাহকদের ন্যায় হুঁ হুঁ শব্দ অথবা স্কন্ধ পরিবর্ত্তন কিছুই করিতেছেনা, নীরবে তাঁহাকে বহন করিয়া যাইতেছে। রাজার মনে একটু করুণা উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন :—

"ওহে বর্ব্বর! তুমি যদি স্কন্ধে পীড়া অনুভব করিয়া থাক, তবে ক্ষণকাল বিশ্রাম কর*।

রাজা যে সংস্কৃত-বাক্য প্রয়োগ করিলেন, উহাতে ব্যাকরণ-দুষ্ট পদের ব্যবহার ছিল। কারণ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারে "বাধ্" ধাতু আত্মনেপদী সুতরাং "বাধতি" এইরূপ পদ হয় না কিন্তু রাজা অজ্ঞতা-নিবন্ধন "বাধতি" প্রয়োগ করিয়া ফেলিয়াছেন। কালিদাস এতক্ষণ অনায়াসে শিবিকা বহন করিয়া যাইতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার তত কষ্ট হয় নাই কিন্তু সহসা "বাধতি"র ন্যায় অপ-প্রয়োগ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করায় তিনি বড় বাধা পাইলেন।

* ক্ষণং বিশ্রাম্যতাং জাল্ম! স্কন্ধস্তে যদি বাধতি।

তিনি সূর্য্য দেখিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার ব্রততিথি উত্তীর্ণ হইয়াছে, এখন কথা বলিলে ও ব্রত-ভঙ্গের সম্ভাবনা নাই। তাহার পর তিনি বলিলেন :—

"শিবিকা বহনে ও আমার তত ক্লেশ হইতেছে না, আপনি বাধতি প্রয়োগ করায় যেরূপ কষ্ট হইতেছে"*।

রাজা বাহকের মুখে সংস্কৃত-ভাষা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শিবিকা হইতে অবরোহণ করিয়া বাহকের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। কালিদাস আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলে তিনি কাতরভাবে তাঁহার চরণে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। কালিদাস ক্ষমা করিলে তিনি ঐ শিবিকায় করিয়া তাঁহাকে গৃহে রাখিয়া গেলেন।

ষষ্ঠ কিম্বদন্তী। কথিত আছে ;—কালিদাস যখন বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভায় অবস্থান করিতেন, সেই সময় ধারানগরীতে ভোজরাজ ও একটী পণ্ডিতসভা প্রতিষ্ঠিত করেন। ঐ সভায় কয়েকটী শ্রুতিধর পণ্ডিত ছিলেন। রাজা ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি আমার সভায় কোন নূতন কবিতা পাঠ করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাকে লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। নবাগত কোন ব্যক্তি, নূতন কবিতা রচনা করিয়া ঐ সভায় পাঠ করিলে প্রথম শ্রুতিধর উহা শুনিয়াই অবিকল আবৃত্তি করিতেন। দ্বিতীয় শ্রুতিধর উভয়ের মুখে শুনিয়া উহা পাঠ করিতে পারিতেন। তৃতীয় শ্রুতিধর তিন জনের মুখে শুনিয়া তৎক্ষণাৎ অনায়াসে উহা উচ্চারণ করিতেন। সুতরাং ভোজরাজের সভায় কাহারই

* ন তথা বাধতে স্কন্ধো যথা বাধতি বাধতে ॥

কবিতার নূতনত্ব রক্ষিত হইতনা। কিছু দিন গত হইলে এই কথা কালিদাসের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি চতুর শ্রুতিধরগণের কৌশল ব্যর্থ করিবার জন্য মনে মনে একটা কল্পনা স্থির করিয়া ভোজরাজের সভায় আগমনপূর্ব্বক নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটী পাঠ করিলেন ;—

ত্রিভুবন-বিজয়ী ধার্ম্মিক সত্যবাদী ভোজরাজ কল্যাণ প্রাপ্ত হউন। আপনার পিতা আমার নিকট হইতে এক কোটি নিরানব্বইটী রত্ন ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আপনি আমাকে শীঘ্র উহা প্রদান করুন। কারণ এই পণ্ডিতগণের সকলেই উহা জানেন। আর যদি কেহ উহা না জানেন, আমার কবিতা যদি নূতন হয়, তবে আপনার প্রতিশ্রুত লক্ষ মুদ্রাই প্রদান করুন*।

বলা বাহুল্য ভোজরাজ কালিদাসকে লক্ষ সুবর্ণ-মুদ্রা প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সপ্তম কিম্বদন্তী। কথিত আছে :—একদা নবরত্নসভায় নানা-দিগ্-দেশীয় পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়াছেন। রাজা বিক্রমাদিত্য পণ্ডিতমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "আমি অদ্য একটী সমস্যা পূরণ করিতে দিব। যিনি সর্ব্বোৎকৃষ্টরূপে পূরণ করিতে পারিবেন, তাঁহাকে সহস্র মুদ্রা পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। সমস্যাটী এই ;—

"কোথায় জপ, কোথায় তপ, কোথায়ই বা সমাধি" ? †

---

* স্বস্তি শ্রীভোজরাজস্ত্রিভুবন-বিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী,
পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতিযুতা রত্নকোটির্মদীয়া।
তাং ত্বং মে দেহি তূর্ণং সকলবুধজনৈর্জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ,
নো বা জানন্তি কেচিন্নবকৃতমিতি চেদ্ দেহি লক্ষং ততো মে॥

† ক্ব জপঃ ক্ব তপঃ ক্ব সমাধিবিধিঃ।

সভায় পণ্ডিতবর্গের অনেকেই এই সমস্যার পূরণ করিলেন কিন্তু কাহারই কবিতা রাজার মনোমত হইল না। শেষে কালিদাস নিম্নলিখিতরূপে উক্ত সমস্যার পূরণ করেন।

দ্বিজরাজ জিনি যার সুন্দর বদন,
মৃগরাজ-সম কটি শোভে অনুক্ষণ।
গজরাজ নিন্দি যার গতি মনোহর,
যদি সে প্রমদা-হৃদি রহে নিরন্তর।
কোথা জপ, কোথা তপ, কোথায় বা ধ্যান,
কোথায় বা রহে বল সমাধি-বিধান ?

রাজা কালিদাসের কৃত সমস্যা-পূরণে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই অঙ্গীকৃত অর্থ প্রদান করেন।

উপরি উক্ত কিম্বদন্তীসমূহ ব্যতীত ও কালিদাস সংক্রান্ত বহু জনশ্রুতি প্রচলিত আছে † কিন্তু উহার অধিকাংশই অশ্লীলতা-দোষযুক্ত বলিয়া এখানে উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। এই সকল কিম্বদন্তী যদিও অতিরঞ্জিত, তথাপি আমরা উহা হইতে জানিতে পারি—কালিদাস মিথিলায় জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি অলৌকিক

* দ্বিজরাজমুখী মৃগরাজ-কটিঃ
গজরাজ-বিনিন্দিত-মন্দগতিঃ।
যদি সা প্রমদা হৃদয়ে বসতি
ক্ব জপঃ ক্ব তপঃ ক্ব সমাধি-বিধিঃ।

† উদ্ধৃত কিম্বদন্তীর দুই তিনটী নবীন ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপক নবদ্বীপ-নিবাসী পরমারাধ্য স্বর্গীয় ৺কৃষ্ণকান্তশিরোমণি মহাশয়ের মুখে শ্রুত হইয়াছিলাম। তিনি আরও কয়টী জনশ্রুতির বর্ণনা করিয়াছিলেন। বাহুল্য ভয়ে সে সমুদয়ের উল্লেখ করা গেল না।

প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। বাল্যকালে তাঁহার বিদ্যা-শিক্ষা ঘটে নাই। শেষে অল্প সময় শাস্ত্রালোচনা করিয়া তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ও ভারতবর্ষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হইয়াছিলেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি উজ্জয়িনী রাজধানীতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ঐ নগরীর শোভা ও সৌন্দর্য্যে তিনি নিতান্ত মুগ্ধ ছিলেন। কবি লিখিয়াছেন;—সৌন্দর্য্যশালিনী উজ্জয়িনী নগরী দেখিয়া মনে হয়, স্বর্গবাসিগণ পুণ্যফলের ক্ষয় হইলে পৃথিবীতে আগমনকালে অবশিষ্ট পুণ্যদ্বারা স্বর্গের একখণ্ড ক্রয় করিয়া আনিয়াছেন। তিনি উজ্জয়িনীর প্রাসাদবাসিনী সুন্দরী ললনাদের লোল কটাক্ষের সহিত ও একান্ত অপরিচিত ছিলেন না। কবি মেঘদূতে মেঘকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "উত্তর দিকে যাইতে উজ্জয়িনী হইয়া যাওয়ায় যদিও পথ বাঁকা হইবে, তথাপি তুমি উজ্জয়িনীর সৌধ-মালা সন্দর্শনে বিমুখ হইও না। বিদ্যুৎ ঝলসিতে দেখিয়া সৌধ-বাসিনী প্রমদারা যখন তোমার প্রতি মধুর কটাক্ষপাত করিবে, যদি তুমি তাহা না প্রত্যক্ষ কর, তাহা হইলে চক্ষুমান্ হইয়াও নয়নবিরহিতের ন্যায় দর্শন-সুখে বঞ্চিত হইবে *। বোধ হয় কবি আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের অনেক দেশপর্য্যটন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বমেঘ ও রঘুবংশের ষষ্ঠসর্গ পাঠে উহা বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়। অনেকের মতে তিনি সত্তর খানি গ্রন্থ রচনা

* বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং,
সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মাস্মভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
বিদ্যুদ্দামস্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি।

(মেঘদূতম্)

করেন কিন্তু সংপ্রতি যে কয়েক খানি সংস্কৃতগ্রন্থ * কালিদাসের নামে প্রচলিত আছে। আমরা পরস্পর রচনা ও ভাবের তারতম্য দৃষ্টে সবগুলি প্রথম কালিদাসের রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। আমাদের মনে হয়, ঋতুসংহার কালিদাসের প্রথম কাব্য। তাহার পর, তিনি যথাক্রমে মালবিকাগ্নিমিত্র, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী, প্রণয়ন করেন। মেঘদূত তাঁহার সর্ব্বশেষ কাব্য। তজ্জন্য উহাতে রচনা ও কল্পনা-শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। উপসংহারের বক্তব্য কালিদাস এক ব্যক্তি ছিলেন না। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের বয়স্য ব্যতীত ও ভোজরাজীয় কালিদাস-প্রভৃতি কালিদাস নামে আখ্যাত কতিপয় কবি বিভিন্ন গ্রন্থসমূহ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহারা অপেক্ষা কৃত আধুনিক কালে প্রাদুর্ভূত হন।

বররুচি। কথিত আছে;—বররুচি নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন ছিলেন কিন্তু এক জ্যোতির্ব্বিদাভরণের বচন ব্যতীত এ বিষয়ে অন্যকোন বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বররুচি সময়ে সময়ে কালিদাসের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সমস্যা পূরণ করিতেন এই রূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। ঐসকল জনশ্রুতির যাথার্থ্য-বিষয়ে ঘোর সন্দেহ। যাহা হউক অনুসন্ধান দ্বারা যাহা জানা গিয়াছে, উহা নিম্নে লিখিত হইল। অভিধান-চিন্তামণি, মেদিনীকোষ ও ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানের মতে কাত্যা-

* যথা;—কুমারসম্ভব, মেঘদূত, রঘুবংশ, ঋতুসংহার, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্ব্বশী, অভিজ্ঞানশকুন্তল, নলোদয়, পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গারতিলক, দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা, শ্রুতবোধ, শৃঙ্গাররসাষ্টক, রসমঞ্জরী, কৌতুকতরঙ্গিণী, বীরমিত্রোদয়, জ্যোতির্ব্বিদাভরণ।

য়নের নামান্তর বররুচি। প্রাচীন সংস্কৃত-গ্রন্থে কতিপয় কাত্যায়নের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। প্রথম বৈদিক-কালে বিশ্বামিত্র বংশীয় কাত্যায়ন আবির্ভূত হন। তিনি কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্র ও প্রতিহারসূত্রের রচয়িতা। অপর কাত্যায়ন মনুপ্রভৃতি বিংশতিজন ধর্মশাস্ত্রকারের অন্যতম। ইনি কাত্যায়নসংহিতা প্রণয়ন করেন। আমাদের বর্ণনীয় গ্রন্থকার এ উভয়ের কেহই নহেন। তাঁহার নাম কাত্যায়নবররুচি অথবা বররুচি। সোমদেবভট্টের কথাসরিৎসাগর পাঠে কাত্যায়নবররুচির এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পুষ্পদন্ত নামক একজন মহাদেবের অনুচর গৌরীর অভিসম্পাতে মর্ত্ত্যলোকে কৌশাম্বী নগরীতে সোমদত্তনামক ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনিই কাত্যায়নবররুচি নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহার জন্মকালে আকাশবাণী হইয়াছিল যে "এই শিশু শ্রুতিধর হইবে এবং বর্ষপণ্ডিতের নিকট সমস্ত বিদ্যা লাভ করিবে। ব্যাকরণ-শাস্ত্রে ইহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিবে এবং বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিষয়ে রুচি জন্মিবে বলিয়া বররুচি নামে বিখ্যাত হইবে"। বয়োবৃদ্ধি সহ, বররুচি অসাধারণ মেধাবী হইয়া উঠেন। একদিন তিনি কোন নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া মাতার নিকট সেই নাটকের আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং উপনয়নের পূর্ব্বে ব্যাড়ির মুখে প্রাতিশাখ্য শুনিয়া তাহা সমুদয় কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। এই কাত্যায়নই শেষে বর্ষপণ্ডিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং ব্যাকরণ-শাস্ত্রের তর্কে পাণিনিকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। কাত্যায়ন স্বয়ং বলিয়াছেন;—বর্ষপণ্ডিতের অনেক বিদ্যার্থীর মধ্যে পাণিনি নামে এক

জড়বুদ্ধিসম্পন্ন শিষ্য ছিল। সে বহুদিন গুরুশুশ্রূষা করিয়া ক্লান্ত হইয়াছিল কিন্তু তাহার কোনরূপ শাস্ত্রে অধিকার জন্মে নাই। উহা দেখিয়া বর্ষপণ্ডিতের ভার্য্যা তাহাকে তপস্যার্থ হিমালয়-প্রদেশে প্রেরণ করেন। সে কঠোর তপস্যাদ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সর্ব্ববিদ্যার মুখস্বরূপ এক অভিনব ব্যাকরণ প্রাপ্ত হয়। তাহার পর, সে প্রত্যাগত হইয়া আমাকেই ব্যাকরণের বাদে আহ্বান করিল। আমাদের উভয়ের ব্যাকরণের বিবাদে সপ্ত দিবস অতীত হইল। অষ্টম দিবসে আমি তাহাকে পরাজিত করিলাম। সেই সময় সহসা আকাশ হইতে মহাদেব হুঙ্কারধ্বনি করিলেন। সেই ঘোররবে আমাদের ঐন্দ্র ব্যাকরণ বিনষ্ট হইয়া গেল। পাণিনি-সম্প্রদায় জয় লাভ করিল। আমরা মূর্খ হইয়া পড়িলাম *।

জৈন হেমচন্দ্রের রচিত "স্থবিরাবলীচরিত" নামক একখানি সংস্কৃতগ্রন্থ পাঠে বররুচি-সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিবরণ অবগত হওয়া যায়। পাটলিপুত্রনগরে নবম নন্দের সুবিখ্যাত সভায় কবি বররুচি অবস্থান করিতেন। তিনি প্রত্যহ ১০৮টী নূতন কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে শুনাইতেন। ঐ সকল কবিতা শুনিয়া

* অথ কালেন বর্ষস্য শিষ্যবর্গো মহানভূৎ।
তত্রৈকো পাণিনির্নাম জড়বুদ্ধিতরোঽভবৎ।

* * * *

* * * *

তেন প্রণষ্টমৈন্দ্রং তদ্ অস্মদ্ব্যাকরণং ভুবি।
জিতাঃ পাণিনীয়াঃ সর্ব্বে মূর্খীভূতা বয়ং পুনঃ।

(কথাসরিৎসাগরঃ)

রাজা সন্তুষ্ট হইতেন কিন্তু মন্ত্রী কখনও উহার প্রশংসা করিতেন না। তজ্জন্য বররুচির ভাগ্যে কখনও কিছু প্রাপ্তি ঘটিত না। একদিন বররুচি মন্ত্রী শকটারের গৃহিণীর নিকট গিয়া সমুদয় নিবেদন করিলেন এবং তিনি যাহাতে শকটারকে একটু বলিয়া দেন, তজ্জন্যও প্রার্থনা জানাইলেন। শকটার যতই দৃঢ়-চিত্ত হউন না কেন, এই বার গলিতে হইল। তিনি গৃহিণীর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না, রাজার সমক্ষে বররুচির কবিতার প্রশংসা করিলেন। নন্দরাজ উহাতে প্রীত হইয়া কবিকে ১০৮টী দীনার (সুবর্ণ-মুদ্রা) প্রদান করিলেন। এই রূপে বররুচি প্রত্যহ রাজাকে ১০৮ নূতন কবিতা শুনাইয়া ১০৮টী করিয়া দীনার পাইতে লাগিলেন। একদিন মন্ত্রী রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'এখন প্রত্যহ আপনি বররুচিকে দান করেন কিন্তু পূর্ব্বে দিতেন না কেন?' রাজা বলিলেন 'তুমি প্রশংসা কর, তজ্জন্য দান করি'। শকটার বলিলেন ঐ সকল কবিতা পরের রচিত তাই বলিয়া প্রশংসা করি। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন "উহা যে বররুচির কবিতা নয়, তাহা কিরূপে জানিলে"? শকটার উত্তর করিলেন "উহা জানা আর কঠিন কি? বালিকারাও ঐ সকল কবিতা আবৃত্তি করিয়া থাকে"। শকটারের সাতটী কন্যা ছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ একবার, কেহ কেহ দুইবার, কেহবা তিনবার শুনিয়া যে কোন ব্যক্তির পঠিত কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিত। একদিন বররুচি নূতন কবিতা রচনা করিয়া পাঠ করিলে শকটারের কন্যাগণ রাজার সন্দেহ দূর করিবার জন্য যথাক্রমে ঐসকল কবিতা আবৃত্তি করিল। তখন মন্ত্রীর কথায় রাজার বিশ্বাস হইল, তিনি দান বন্ধ করিয়া দিলেন। উহাতে

বররুচি অত্যন্ত কুপিত হইলেন। তাহার পর, তিনি এক নূতন কৌশল আবিষ্কার করিলেন; একটী যন্ত্রে ১০৮টী দীনার পূর্ণ করিয়া গঙ্গাগর্ভে গুপ্ত ভাবে রাখিয়া আসিতেন, পরে সর্ব্ব সমক্ষে গঙ্গার স্তব করিতে আরম্ভ করিলে যন্ত্র-সাহায্যে সেই মুদ্রা ভাসিয়া উঠিত। বররুচি উহা গ্রহণ করিতেন। তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন, রাজা না দিলেও গঙ্গা তাঁহার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া দীনার প্রদান করেন। রাজা একদিন মন্ত্রীকে উহা বলিলেন। মন্ত্রী গোপনে চর পাঠাইয়া সমুদয় ব্যাপার জানিতে পারিলেন। একদিন বররুচি ছদ্মবেশে গিয়া গঙ্গাগর্ভে দীনার নিক্ষিপ্ত করিয়া আসিলে শকটারের নিযুক্ত গুপ্তচর উহা তুলিয়া লইয়া শকটারের হস্তে অর্পণ করিল। তাহার পর, রাজা শকটারের সহিত কবির ক্ষমতা পরীক্ষা করিতে আসিলে বররুচি গঙ্গার স্তব আরম্ভ করিলেন কিন্তু পূর্ব্ববৎ মুদ্রা ভাসিয়া উঠিল না। রাজার সমক্ষে এই ব্যাপারে বররুচি লজ্জায় মৃত-প্রায় হইলেন। শকটার মুদ্রাগুলি দেখাইয়া বলিলেন "এই লও, তোমার টাকা তোমায় দিলাম"। এই রূপে বররুচির কৌশল ধরা পড়ায় তিনি শকটারের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। তাহার পর, তিনি বৈরশোধনের আশায় কতকগুলি মূর্খ বালককে ছোলাভাজা দিয়া বশ করিলেন। তাহারা পথে পথে এই গান গাহিয়া বেড়াইতে লাগিল—'রাজা যাহা জানে না, শকটার তাহাই করিবে, নন্দের উচ্ছেদ সাধন করিয়া শ্রীরককে সিংহাসনে বসাইবে'। ক্রমে ঐ সংবাদ রাজার কর্ণগোচর হইল। রাজা ভাবিলেন 'বালক বালিকাতে যে কথা বলে তাহা অন্যথা হইবার নহে'। তখন তিনি

প্রকৃত ব্যাপার অবগত হইবার জন্য চর নিযুক্ত করিলেন। শকটার পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে রাজাকে উপহার দিবার জন্য কতকগুলি উৎকৃষ্ট অস্ত্র প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। চর রাজার নিকট ঐ সকল অস্ত্র নির্ম্মাণের সংবাদ দিল। রাজা মন্ত্রীর উপর অতিশয় কুপিত হইলেন। বিচক্ষণ মন্ত্রীর উহা অজ্ঞাত রহিল না। তিনি আপনার প্রিয় পুত্র শ্রীয়ককে বলিলেন "বৎস! আমারও আমাদের জ্ঞাতি কুটুম্বের আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত। যদি তুমি সকলকে বাঁচাইতে চাও, তাহা হইলে আমি যখন রাজাকে অভিবাদন করিব, তুমি তৎক্ষণাৎ আমার শিরশ্ছেদ করিবে" শ্রীয়ক কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "পিতঃ! আমার প্রতি এ কঠিন আদেশ কেন? নিতান্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তি ও যে এরূপ কার্য্য করিতে পারেনা"। শকটার পুত্রকে বুঝাইয়া বলিলেন "ইহা ব্যতীত উদ্ধারের অন্য উপায় নাই। রাজা বিষ প্রয়োগে আমার প্রাণসংহার করিবে। অতএব তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর"। তাহার পর, সময় উপস্থিত হইলে শ্রীয়ক পিতার আদেশ পালন করিলেন। রাজা সেই দারুণ ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া শ্রীয়ককে বলিলেন "এই রূপ দুষ্কর কার্য্য কেন করিলে?" শ্রীয়ক বলিলেন "ভৃত্য হইয়া যে প্রভুর অনিষ্ট চেষ্টা করে, পিতা হইলেও তাহাকে বধ করা কর্ত্তব্য। রাজা শ্রীয়কের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকেই প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু পিতৃতুল্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা থাকিতে তিনি প্রধান অমাত্যের পদ গ্রহণ করিতে পারেন না, ইহা রাজাকে জানাইলেন।

শকটারের জ্যেষ্ঠ পুত্র স্থূলভদ্র কোশানাম্নী এক বারবনিতার প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া বার বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছেন

রাজা তাঁহাকে ডাকাইয়া মুদ্রাধিকার গ্রহণ করিতে বলিলেন। বিবেকী স্থূলভদ্র ঐ উচ্চপদ গ্রহণে সম্মত হইলেন না। কারণ দীর্ঘকাল বারাঙ্গনা-সাহচর্য্যে তাঁহার কার্য্যক্ষমতা এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া ছিল। বিশেষতঃ পিতার আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার হৃদয়ে সংসার-বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল। তিনি সম্ভূতিবিজয় নামক এক বৌদ্ধ পরিব্রাজকের নিকট দীক্ষিত হইলেন। তখন শ্রীয়ক রাজদত্ত মুদ্রাধিকারের পদ গ্রহণ করিলেন। কি রূপে তিনি প্রতিশোধ লইবেন, এই চিন্তা সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয়ে জাগরুক রহিল। একদিন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভূতপূর্ব্ব প্রণয়িনী কোশার নিকট গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃশোকে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। দুষ্ট বররুচিই তাঁহার পিতার মৃত্যুর কারণ। কোশা যখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা অতএব পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লওয়া কোশার অবশ্য কর্ত্তব্য"। কোশা উহাতে সম্মত হইল। বররুচি কোশার ভগিনী উপ-কোশাকে বড় ভাল বাসিতেন। কোশা উপকোশাকে বলিয়া বররুচিকে মদ্যপান শিখাইল। শকটারের মৃত্যুর পর, বররুচি রাজা নন্দের সভায় বেশ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। সভাস্থ সকলেই তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের প্রশংসা করে। একদিন বররুচি উপকোশার সহিত মদ্যপান করিয়াছেন—এই সংবাদ যথাসময়ে শ্রীয়কের নিকট পৌঁছিল। তিনি রাজাকে বলিলেন "বররুচি বড়ই দুর্ব্বৃত্ত, সে বারবনিতার সহিত মদ্যপান করে। কিয়ৎক্ষণ পরে বররুচি সভায় আগমন করিলে রাজা তাঁহাকে একটী পুষ্পের ঘ্রাণ লইতে বলিলেন। বররুচি যেই পুষ্পের ঘ্রাণ লইলেন, অমনি তাঁহার বমন হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে মদ্যগন্ধ বাহির হইয়া পড়িল।

ব্রাহ্মণের মদ্যপান রাজা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি বররুচিকে উষ্ণ গলিত সীসক পানের আদেশ করিলেন। সীসক পানে কবি বররুচি ইহলোক ত্যাগ করিলেন*। উপরি উদ্ধৃত বররুচি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। সম্ভবতঃ বররুচি নামধেয় অপর কোন পণ্ডিত নবরত্নসভায় অন্যতম সদস্য নিযুক্ত ছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদাভরণের রচয়িতা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। কেহ বলেন 'বাসবদত্তার রচয়িতা কবিবর সুবন্ধু, বররুচির ভাগিনেয় ছিলেন। এই কিম্বদন্তী নিতান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া বোধ হয় না। কেন না, সুবন্ধু তদীয় কাব্যে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন †। পাণিনীয় ব্যাকরণের বার্ত্তিক কাত্যায়ন-প্রণীত। কেহ কেহ বলেন কাত্যায়ন ও কাত্যায়ন-বররুচি একই ব্যক্তি। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি, ভাষ্য-মধ্যে কাত্যায়নের বার্ত্তিক উদ্ধৃত করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন বররুচির প্রণীত "প্রাকৃতপ্রকাশ" নামক একখানি প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ এবং "পত্রকৌমুদী" নামক এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। কাত্যায়ন-বিরচিত পালিব্যাকরণ আছে। উহার প্রণেতা ও কাত্যায়ন-বররুচি হওয়াই অধিক সম্ভব।

বরাহমিহির। পৃথিবীর বিদ্বদ্বর্গের মধ্যে বোধ হয় এরূপ ব্যক্তি নিতান্ত বিরল, যিনি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত বরাহমিহিরের নামও না শুনিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি

---

* অধ্যাপক ভ্যাঙ্কোবর কর্ত্তৃক সম্পাদিত—"ভূবিদ্যাবলীচরিত" পাঠকরুন।

† সা রসবত্তা বিহতা নবকা বিলসন্তি চরতি নো কং কঃ।
সরসীব কীর্ত্তিশেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে॥
(বাসবদত্তা ৪ পৃষ্ঠা)

ভারতবর্ষে আর কখন জন্ম গ্রহণ করেন নাই এবং ভবিষ্যতে যে জন্ম গ্রহণ করিবেন, তাহারও সম্ভাবনা অল্প। যদিও এই মহাপণ্ডিতের লিপিবদ্ধ কোন ধারাবাহিক জীবনবৃত্তান্ত পাওয়া যায় না কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ-সমূহ ও টীকাকারদের উক্তি হইতে কিয়দংশ সঙ্কলন করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণ বরাহমিহির সংক্রান্ত একটী সুন্দর গল্প করিয়া থাকেন। ঐ গল্পের উৎপত্তি কেন হইয়াছে? তাহা আমরা অবগত হইয়াছি। ভবিষ্যপুরাণে মিহিরাচার্য্য-সংক্রান্ত একটী উপাখ্যান আছে উহাই বঙ্গদেশীয় গল্পের মূল*। উক্ত গল্পের সহিত আমাদের বর্ণনীয় বরাহমিহিরের কোন সম্বন্ধ নাই।

জ্যোতির্ব্বিদাভরণে উক্ত আছে:—বরাহমিহির উজ্জয়িনীর অধীশ্বর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন, তদ্ভিন্ন ভারতবর্ষের সর্ব্বদেশেই ঐ কিম্বদন্তী শ্রুত হওয়া যায়।

* পূর্ব্বকালে দক্ষিণাপথের কাঞ্চীপুর নগরীতে এক গণকব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি এক দিন তাঁহার যজমান রাজা সত্যব্রতকে বলিলেন "মহারাজ অভিজিৎ নামক মুহূর্ত্তে পুষ্যা-নক্ষত্রের যোগ হইয়াছে। অতএব আপনি ঐ সময়ে যদি হাট বসান, তাহা হইলে বহুবিত্ত লাভ হইবে"। রাজা দৈববিদের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ঢেরী পিটিয়া জনসাধারণকে জানাইলেন, "এই হাটে বণিক্‌গণ যাহা ক্রয় করিবে না, সে সমুদয় আমি উচিত মূল্যে গ্রহণ করিব'। তাহা শুনিয়া শূদ্রগণ নানা দ্রব্য লইয়া হাটে উপস্থিত হইত, বৈশ্যগণ সে সমস্তই ক্রয় করিত। ক্রমে ঐ হাটের প্রভূত উন্নতি হইল। একদিন কোন লৌহকার লৌহনির্ম্মিত এক দরিদ্র মূর্ত্তি লইয়া হাটে উপস্থিত হইল এবং তাহার বিনিময়ে শতমুদ্রা প্রার্থনা করিল। কোন ব্যক্তি ঐ দরিদ্র-মূর্ত্তি না লওয়ায় রাজা স্বয়ই শত মুদ্রা দিয়া উহা গ্রহণ করিলেন। ঐ দরিদ্র-মূর্ত্তি ধনাগারে স্থাপন করায় নিশীথ কালে ক্রমে কর্ম্ম ধর্ম্ম লক্ষ্মী প্রভৃতি রাজার সাক্ষাতেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাহার পর, সত্য যাইতে উদ্যত হইয়া রাজাকে বলিলেন "যেখানে দরিদ্র পুরুষ সেখানে কর্ম্ম তিষ্ঠিতে

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, উজ্জয়িনীতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া নবরত্ন-সভা বিরাজিত ছিল। অতএব বরাহমিহির যে, কোন সময়ে নবরত্ন-সভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বহুবিধ গবেষণাদ্বারা স্থির করিয়াছেন 'বরাহমিহির অন্যতম প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন জ্যোতিষী আর্য্যভটের পরে জন্ম গ্রহণ করেন। কারণ তিনি তদীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থ পঞ্চসিদ্ধান্তিকায় আর্য্য-ভটের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন'। তাঁহার লেখা হইতেও জানা যায় তিনি ৪২৭ শকাব্দে (অর্থাৎ ৫০৫ খৃষ্টাব্দে) উক্ত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা গ্রন্থ রচনা করেন। এবং ৫০৯ শকাব্দে (অর্থাৎ ৫৮৭ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু হয়। যদি যৌবনের প্রারম্ভে তিনি ঐ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্যূন ১৪২৩ বৎসর পূর্ব্বে বরাহমিহির জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন. এরূপ নির্ণয় করিলে বোধ হয় অযুক্ত হয় না। বৃহজ্জাতকের টীকাকার ভট্টোৎপল লিখিয়াছেন "বরাহমিহির

পারে না। যেখানে কর্ম্ম নাই, সেখানে ধর্ম্মই বা কি প্রকারে থাকিবে? আবার ধর্ম্ম ব্যতীত লক্ষ্মী অবস্থান করিতে পারেন না। লক্ষ্মী ব্যতীত আমিই বা কিরূপে থাকিব? অতএব আমি এখান হইতে চলিলাম"। উহা শুনিয়া রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন "সত্য! কর্ম্ম ধর্ম্ম, লক্ষ্মী আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমি তত দুঃখিত হই নাই কিন্তু আপনি আমাকে ত্যাগ করিলে আমি কাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকিব? অতএব আপনি আমায় ত্যাগ করিবেন না"। রাজার কাতর প্রার্থনায় সত্য ফিরিয়া আসিলেন এবং উঁহার সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্ম ধর্ম্ম প্রভৃতিও ফিরিলেন। তাহার পর, লক্ষ্মী যখন গৃহে প্রবেশ করেন, তখন রাজা ধীরভাবে বলিলেন "দেবি! আপনি বড় চঞ্চলা, যদি অচঞ্চলভাবে আমার গৃহে বিরাজ করেন, তবেই আগমন করুন, নচেৎ আগমনের প্রয়োজন নাই। লক্ষ্মী তাহাতেই সম্মত হইয়া রাজভবনে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা সেই গণক-ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া তাঁহার গণনার পুরস্কার লক্ষস্বর্ণ-মুদ্রা দান করিলেন। সেই গণকব্রাহ্মণের একটী পুত্র হইল। তিনি উঁহার পুত্র নাম রাখিলেন এবং উঁহার অধ্যাপনে সমুদয় বর্ণ

শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত ছিলেন*। ভারতবর্ষের সর্ব্বদেশেই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের বসতি আছে কিন্তু এক বিহার এবং অযোধ্যা-প্রদেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশে ইহারা বিভিন্ন নামে পরিচিত। অনেকেই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের ইতিহাস অবগত নহেন, তজ্জন্য প্রসঙ্গক্রমে এখানে উক্ত ব্রাহ্মণের ইতিবৃত্ত বিবৃত করা গেল।

সাম্বপুরাণে উক্ত আছে—দ্বাপরযুগের শেষে যখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার সিংহাসনে বিরাজিত, সেই সময় একদিন দেবর্ষি নারদ দ্বারকায় আগমন করেন। প্রত্যুম্নপ্রভৃতি যদুবংশীয় রাজকুমারগণ সকলেই দেবর্ষিকে দেখিয়া অভ্যুত্থান ও প্রণামাদি দ্বারা ভক্তি প্রদর্শন করিলেন কিন্তু কৃষ্ণের অন্যতম পুত্র সাম্ব কোন প্রকার সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। অধিকন্তু মুনিকে দেখিয়া কথঞ্চিৎ অবহেলা প্রকাশ করিলেন। উহাতে নারদ ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মনে মনে বিবেচনা করিলেন "সাম্ব স্বীয় সৌন্দর্য্যগর্ব্বে গর্ব্বিত, আমাকে

মুদ্রা ব্যয় করিলেন। ঐ পুত্র জ্যোতিঃশাস্ত্রে সবিশেষ পারদর্শী হইয়াছিলেন। একদিন তিনি সূর্য্যের আরাধনা করিয়া সূর্য্যের প্রসাদে সূর্য্যমণ্ডলেই মোক্ষ লাভ করিলেন। পরজন্মে ঐ গণকব্রাহ্মণের পুত্র উজ্জয়িনী নগরীতে এক জ্যোতির্ব্বিদের গৃহে মিহিরাচার্য্য নামে জন্ম গ্রহণ করিলেন। পিতা জন্মমাত্র গণ্ডান্তাশ্রিত সেই বালককে অল্পায়ু জানিয়া নিশীথকালে একটী কাষ্ঠেরকটাহে স্থাপন করিয়া নদীতে ভাসাইয়া দিলেন। সেই সদ্যোজাত পুত্র নদীর প্রবাহে কটাহ সহিত সমুদ্রে গিয়া পড়িল। রাক্ষসীরা সেই সময়ে সমুদ্রে জলক্রীড়া করিতেছিল, তাহারা সুন্দর পুত্রটীকে লইয়া গিয়া প্রতিপালন করিল। বিবিধ লঙ্কায় অবস্থান করিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন, জাতক ফলিত গ্রহগণনা প্রভৃতি সমস্তেরই শিক্ষা হইল। পাঠান্তে তিনি তত্রত্য রাজার সাহায্যে জন্মভূমি ভারতবর্ষে আগমন করিলেন। ম্লেচ্ছগণ জ্যোতিঃশাস্ত্র নষ্ট করিয়াছিল, তিনি তাহার পুনরুদ্ধার করিলেন। (ভবিষ্যপুরাণ প্রতিসর্গপর্ব্ব ৮ম অধ্যায়।)

* Cf. Colebrooke, Algebra, P. X. L. V. foot note.

নিতান্ত অবজ্ঞা করিতেছে, অতএব ইহাকে শিক্ষা দিতে হইবে। তাহার পর, একদিন তিনি শ্রীকৃষ্ণকে নির্জনে বলিলেন "প্রভো! সাম্ব অতিশয় রূপবান্ যুবা, তজ্জন্য আপনার যুবতী পত্নীগণ সাম্বের প্রতি অনুরাগিণী, সর্ব্বদা উঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষা করে।" শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "মুনিবর! আপনি যাহা বলিলেন, উহাতে আমি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলাম না"। নারদ বলিলেন "প্রভো! দেখিবেন যাহাতে আপনার বিশ্বাস হয়, আমি তাহা করিব।" কিছুদিন পরে নারদ পুনরায় একদিন দ্বারকায় আগমন করিলেন। তখন কেবল বসন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃপুর-মহিলাগণের সহিত জলক্রীড়া করিয়া রৈবতকোদ্যানে অবস্থিতি করিতেছেন। নানাবিধ প্রস্ফুটিত কুসুমের সৌরভে উপবনের সর্ব্বত্র আমোদিত, চতুর্দ্দিকে ভ্রমরঝঙ্কার ও কোকিলের কুহুরব শ্রুত হইতেছে। অপরাহ্নে উদ্যানস্থ দীর্ঘিকায় হংসশ্রেণী ক্রীড়ানিরত। জলকণসংসর্গী মৃদুমন্দ সমীরণ বিকসিত কমলের সৌরভে সুবাসিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই সময় কৃষ্ণের প্রণয়িনীগণ সুমধুর পুষ্পাসব পানে প্রমত্ত হইয়া নানাপ্রকার হাবভাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রমুদিত করিতেছেন। ঐ সময় নারদ আসিয়া সাম্বকে বলিলেন "কুমার! তুমি শীঘ্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ দেও, আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব।" সাম্ব নারদের কথানুসারে সহসা রৈবতকোদ্যানে আগমন করিবামাত্র নারদও তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এদিকে কন্দর্পের ন্যায় রূপবান্ যুবা সাম্বকে দেখিয়া সেই মদ-বিহ্বলা কৃষ্ণের রমণীগণ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। উহা দেখিয়া ভগবান্ কৃষ্ণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং কেবল অচঞ্চলা সাধ্বী পত্নী রুক্মিণী, সত্যভামা ও

জাম্ববতী ব্যতীত আর সকলকেই অভিসম্পাত দিলেন। ভগবান্ বলিলেন "যেহেতু তোমাদের চিত্ত আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্যের প্রতি আসক্ত হইয়াছে, অতএব তোমরা আয়ুশেষে পতিলোকে গমন করিতে পারিবে না এবং তোমরা দস্যুহস্তে পতিত হইয়া বিড়ম্বিত হইবে।" সেই অভিসম্পাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বর্গারোহণ করিলে অর্জ্জুনের সাক্ষাতেই পঞ্চনদ (পঞ্জাব) দেশীয় দস্যুগণ শ্রীকৃষ্ণের রমণীগণকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। এদিকে ভগবান্ সাম্বকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "যেহেতু তোমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া এই রমণীগণ চঞ্চল হইয়াছে, অতএব তুমি কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইবে।" সাম্ব তৎক্ষণাৎ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইলেন। তাহার পর, তিনি নারদের শরণাগত হইলে নারদ তাঁহার নিকট সূর্য্যের মাহাত্ম্য ও রূপ বর্ণন করিলেন এবং আরোগ্যদাতা ভাস্করের আরাধনা করিতে উপদেশ দিলেন।

সাম্ব নারদের উপদেশে চন্দ্রভাগানদীর তীরে এক বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া অতিশয় ভক্তি ও যত্নের সহিত সূর্য্যপ্রতিমা অর্চ্চনা করিলেন এবং উহার ফলে অচিরে কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। মিত্র অর্থে সূর্য্য, তাঁহার পূজার নিমিত্ত প্রতিষ্ঠিত উদ্যান বলিয়া ঐ স্থানের নাম "মিত্রবন" হইল। তাহার পর, সাম্ব নারদকে বলিলেন "আপনার প্রসাদে পুনর্ব্বার পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ভগবান্ সূর্য্যের মূর্ত্তিও সন্দর্শন করিলাম। এখন একবিষয়ে আমার বড় চিন্তা উপস্থিত হইয়াছে, ভগবান্ সূর্য্যের প্রতিমা, কে পূজা করিবে এবং কেই বা ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকিবে? অতএব এমন কোন গুণযুক্ত ব্রাহ্মণের নাম করুন, যাঁহাকে আমি এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারি"। নারদ বলি-

লেন "এই সকল ব্রাহ্মণ সূর্য্য-পূজার দ্রব্য গ্রহণ করে না। কারণ এই প্রতিগ্রহ বড়ই গুরুতর। অতএব প্রতিগ্রহসমর্থ অপর কোন শাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। অতএব ভগবান্ সূর্য্যেরই শরণাগত হও, তিনিই তোমাকে এ বিষয়ে উপদেশ দিবেন"। সাম্ব নারদের বাক্যানুসারে সূর্য্যের নিকট উহা নিবেদন করিলেন। ভগবান্ সূর্য্য বলিলেন "বৎস সাম্ব! আমার পূজার নিমিত্ত শাকদ্বীপ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে হইবে। শাকদ্বীপ অতি পুণ্যময় জনপদ। সেই দেশ, ধর্ম্মাত্মা নরপতি প্রিয়ব্রত কর্ত্তৃক শাসিত। সেখানে কেবল চারিবর্ণের বাস। তত্রত্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্রগণ অতিশয় সদাচার-নিরত। ঐ জনপদে বর্ণসঙ্করের বাস নাই। সেখানে আমার মূর্ত্তির পূজা হইয়া থাকে। সেখানকার ব্রাহ্মণগণ চারিবেদেই অভিজ্ঞ। সেই বেদজ্ঞ সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণেরা আমার ভক্ত এবং আমার অর্চ্চনায় সমাসক্ত। আমি শ্বেতদ্বীপে বিষ্ণু, কুশদ্বীপে মহেশ্বর, পুষ্করদ্বীপে ব্রহ্মা এবং শাকদ্বীপে ভাস্কররূপে পূজিত হইয়া থাকি। অতএব আমার অর্চ্চনার নিমিত্ত শাকদ্বীপ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন কর।

সাম্ব তাহা শুনিয়া পুনরায় দ্বারকায় গমনপূর্ব্বক সূর্য্যের আজ্ঞা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জানাইলেন। তিনি উহা শুনিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করিলেন। তাহার পর, তাঁহার নিকট হইতে গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক সাম্ব শাকদ্বীপে উপনীত হইলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন তেজস্বী ব্রাহ্মণগণ ধূপ দীপ গন্ধ চন্দনও নৈবেদ্যাদি দ্বারা ভগবান্ সূর্য্যের অর্চ্চনায় রত আছেন। সাম্ব তাঁহাদিগকে প্রণিপাতপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন "আমি দ্বারকাধিপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পুত্র সাম্ব, আপনাদিগকে লইতে আসিয়াছি। চন্দ্রভাগা-

তটে আমি যে সূর্য্যপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি, আপনারা ব্যতীত অপর কেহ তাহার অর্চ্চনার অধিকারী নহে, অতএব উঠুন চলুন, আমরা যাই। ব্রাহ্মণগণও সাম্বকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "আপনি যাহা বলিলেন যথার্থ, ভগবান্ সূর্য্যও আমাদিগকে ঐরূপ আদেশ করিয়াছেন।" এই বলিয়া সেই বেদজ্ঞ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের অষ্টাদশকুল সপরিবারে গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক মিত্রবনে আগমন করিলেন। সাম্ব নানাবিধ স্তুতিবাক্যে তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া মিত্রবনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন*। এই মিত্রবন যে প্রদেশের অন্তর্গত শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ ঐ প্রদেশকে "মূলস্থান" নামে অভিহিত করিতেন। কালক্রমে উহা "মূলতান" নামে প্রসিদ্ধ হইল। মূলতান পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত। চীনদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হুয়েন্থসাঙ্ খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতভ্রমণ কালে মূলতানের অন্তর্গত সাম্বপুরে গমন করিয়াছিলেন। তত্রত্য শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের অধিষ্ঠিত সুবৃহৎ সূর্য্যমন্দিরে তিনি এক সুবর্ণময়ী সূর্য্যপ্রতিমা অবলোকন করেন। তিনি লিখিয়াছেন "ভারতবর্ষীয় সর্ব্বপ্রদেশের ভূপতিগণ ঐ সূর্য্যমন্দিরে সূর্য্যের অর্চ্চনার নিমিত্ত গমন করিতেন এবং পূজার দ্রব্য প্রেরণ করিতেন। এক সময়ে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের প্রযত্নে ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই সূর্য্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তাঁহাদের সুমধুর বেদধ্বনিতে ঐ সকল সূর্য্যমন্দির সর্ব্বদা মুখরিত হইত। অধিকাংশস্থলে এই প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ অন্যান্য ব্রাহ্মণের

* সাম্বপুরাণ ২য় ৩য় ৪র্থ অধ্যায়। ক্ষেমরাজ কৃষ্ণদাসকর্ত্তৃক প্রকাশিত মুম্বই বেঙ্কটাচলেশ যন্ত্রালয় মুদ্রিত পুস্তক পাঠ করুন।

মধ্যে মিশিয়া গিয়াছেন। যে স্থলে ইহারা অবিমিশ্রভাবে অবস্থান করিতেছেন, সেখানেও ইহাঁদের আর সে অবস্থা নাই *।

বরাহমিহির ব্রাহ্মণজাতির কোন্ শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা প্রকটিত করিবার জন্য শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল। এখন তাঁহার জন্মভূমি ও বংশের বিষয় অনুসন্ধান করা যাউক। সকলেই বলেন "বরাহমিহিরের পিতা আদিত্যদাসদৈবজ্ঞ মগধপ্রদেশের অন্তর্গত পাটলিপুত্রনগরের অধিবাসী ছিলেন।" উক্ত জনশ্রুতি অসঙ্গত নহে। কারণ ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে সকল শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা হয়, অন্য ব্রাহ্মণের সহিত মিশিয়া গিয়াছেন, নয় নামান্তর প্রাপ্ত হইয়াছেন *। কেবল মগধ ও অযোধ্যা প্রদেশেই ইহারা স্বনামে পরিচিত হইয়া থাকেন। মগধ বা বিহারে এক সময়ে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের অসাধারণ প্রভুত্ব ছিল। শাহাবাদ ও পাটনা জেলা হইতে কয়েক খানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের অনেক কীর্ত্তিকলাপের

---

* বাঙ্গালাদেশে ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের বাস আছে। যে সকল জ্যোতিঃশাস্ত্র ব্যবসায়ী শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ বাঙ্গালাদেশে আসিয়া বাস করেন, বর্ত্তমান গ্রহবিপ্রগণ তাঁহাদেরই অধস্তন পুরুষ। তজ্জন্য ইঁহারা অদ্যাপি সূর্য্যাদি-গ্রহগণের পূজা করেন এবং বৈধ কার্য্যে সূর্য্যার্ঘ্যদান ও সূর্য্যের মূর্ত্ত্যন্তর গণেশ-পূজায় গণেশঘট প্রভৃতি গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা দ্বারাই ইঁহাদের সেই পূর্ব্বস্মৃতির ক্ষীণচিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। তবে বাঙ্গালাদেশের গ্রহবিপ্রমাত্রেই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ নহেন। গৌড়েশ্বর রাজা শশাঙ্কের আহ্বানে যে সকল সরযূপারী ব্রাহ্মণ বাঙ্গালা দেশে আসিয়া উক্ত নরপতির গ্রহযজ্ঞ সম্পন্ন করেন এবং উক্ত রাজার দান গ্রহণ করিয়া এদেশে বাস করেন তাঁহারাও জ্যোতিঃশাস্ত্রের ব্যবসায় ও গ্রহের দান গ্রহণ করায় "গ্রহবিপ্র" নামে পরিচিত হইয়াছেন। সকলেই জানেন সরযূপারী ব্রাহ্মণগণ কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণের একটী শাখা।

উল্লেখ আছে। এক সময়ে এক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ, মগধেশ্বরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। আর শাহাবাদ-জেলার অন্তর্গত ভরদ্বাজ-গোত্রীয় কোন বিদ্বান্ শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণকে মগধের এক জন রাজা যে প্রচুর ভূমি দান করিয়াছিলেন, তাম্রফলকে উৎকীর্ণ উক্ত দান-পত্রখানিও পাওয়া গিয়াছে। এখনও মগধপ্রদেশের অন্তর্গত গয়া, শাহাবাদ, পাটনা, গাজীপুর ও গোরক্‌পুরে অনেক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের বসতি দৃষ্ট হয়। গয়াতীর্থে ইহারাই পৌরহিত্য করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের পরমগৌরবভূমি অযোধ্যার মহারাজ স্যার্ প্রতাপনারায়ণ সিংহ কে, সি, আই, ই, মহোদয়ের উর্দ্ধতন পুরুষ পুরন্দরমিশ্রও মগধ হইতে গিয়া অযোধ্যায় বসতি করেন। বর্ত্তমান বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যায় যে সকল ক্ষত্রিয় রাজা আছেন, তন্মধ্যে ডুমরাওনের মহারাজই কুলগৌরবে ও ঐশ্বর্য্যে প্রধান। কারণ এখন একমাত্র ডুমরাওন-রাজবংশের সহিতই রাজপুতানার ক্ষত্রিয় নৃপতিগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ হইয়া থাকে। উক্ত ডুমরাওন-রাজবংশের কুলগুরু ও কুল-পুরোহিত উভয়ই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণ। অতএব এই শাকদ্বীপীয়-ব্রাহ্মণ-প্রধান মগধই যে, আদিত্যদাসের জন্মভূমি ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। তবে আদিত্যদাসের নিবাস মগধে হইলেও তদীয় তনয় বরাহমিহিরের বাসভূমি বোধ হয় মগধে ছিল না। সম্ভবতঃ তাঁহার পিতা মগধ হইতে গিয়া তদানীন্তন ভারতবর্ষের রাজধানী অবন্তী বা উজ্জয়িনীতে উপনিবিষ্ট হইয়াছিলেন। সেখানেই বরাহমিহিরের জন্ম হয়। তিনি স্বচরিত গ্রন্থে এই প্রকার আত্মপরিচয় দিয়াছেন। "বরাহ-মিহির আদিত্যদাস-দৈবজ্ঞের পুত্র এবং বাল্যকালে তাঁহারই নিকট

উপদেশ লাভ করেন। তাহার পর কাপিৎথক নামক স্থানে সূর্য্যকে আরাধনা করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হন। তিনি অবন্তীতে বাস করিতেন এবং মুনিগণের মত সম্যক্‌রূপে অবলোকন করিয়া এই মনোহর হোরা-শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন*"। অতএব ইহা দ্বারা আমরা অবগত হইতে পারি, বরাহমিহির অবন্তীনগরেই জন্ম গ্রহণ করেন এবং সেখানেই শিক্ষা লাভ করেন এবং তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও অসীম শাস্ত্রজ্ঞান অবলোকন করিয়া লোকে মোহিত হইয়াছিল এবং তিনি যে সূর্য্য-দেবের অনুকম্পায় ঐ প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন, লোকের মনে এই রূপ ধারণা হইয়াছিল। শৈশবেই তাঁহার প্রতিভা প্রকাশ পায়, যখন কাপিৎথক নামক বিদ্বজ্জন-বহুল পল্লীতে অধ্যয়ন আরম্ভ করেন, তখনই তিনি অত্যন্ত ভক্তির সহিত কৌলিক উপাস্য দেব সূর্য্যের অর্চ্চনা করিতেন এবং সেই সময় হইতেই দিন দিন তাঁহার প্রতিভার উন্মেষ হয়। কালক্রমে তিনি ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্‌ হন। বরাহ-মিহির যে সকল জ্যোতিষশাস্ত্রীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে পঞ্চসিদ্ধান্তিকা, বৃহজ্জাতক, লঘুজাতক, বৃহদ্‌বিবাহপটল, লঘুবিবাহ-পটল, বৃহদ্‌যোগযাত্রা, লঘুযোগযাত্রা-প্রভৃতি আটখানি গ্রন্থই প্রধান। পঞ্চসিদ্ধান্তিকা ও বৃহৎসংহিতার পরিচয় দেওয়া অনা-

* আদিত্যদাসতনয়স্তদবাপ্তবোধঃ
কাপিৎথকে সবিতৃলব্ধবরপ্রসাদঃ।
আবন্তিকো মুনিমতান্যবলোক্য সম্যগ্‌
হোরাং বরাহমিহিরো রুচিরাং চকার॥

(বৃহজ্জাতকম্‌ ২৫। ৫)

বশ্যক। ঐরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত রচিত হয় নাই। গণিত ও বিজ্ঞান-সংক্রান্ত এরূপ গ্রন্থ প্রতীচ্য-ভাষায় ও একান্ত বিরল। মহারাজ বিক্রমাদিত্য শক-বিজেতা ও বৈদিকধর্ম্মের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। অতএব তাঁহার সভায় বরাহমিহিরের ন্যায় বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদের সম্মান লাভ নিতান্ত স্বাভাবিক। জ্যোতির্ব্বিদাভরণের এক স্থানে লিখিত আছে;—"যে অসাধারণ বিক্রমশালী রাজা বিক্রমাদিত্য মহাসংগ্রামে রুমদেশের অধিপতি শকরাজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে উজ্জয়িনী নগরী গ্রহণ করিয়া ছিলেন এবং ঐ শকরাজকে আনয়নপূর্ব্বক নানাস্থানে ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সেই পৃথিবীশ্বর বিক্রমাদিত্য যখন অবন্তী নগরীর রাজপদে অধিষ্ঠিত, তখন প্রজার সুখ-সম্পদের ইয়ত্তা ছিল না এবং সর্ব্বত্রই বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হইত*"। এই লেখা দ্বারা বোধ হয়, রুমদেশের অধিপতি কোন শকরাজ ভারতবর্ষে প্রবেশপূর্ব্বক অবন্তী রাজধানী আক্রমণ করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে পরাভব করিয়া পুনরায় অবন্তী গ্রহণ করেন এবং ঐ নরপতি সম্ভবতঃ বৈদিক-ধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন, বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে তাড়াইয়া দিয়া বৈদিক আচার পুনঃ প্রবর্ত্তিত করেন।

---

* যো রুমদেশাধিপতিং শকেশ্বরং জিত্বা গৃহীত্বোজ্জয়িনীং মহাহবে।
আনীয় সংভ্রাম্য মুমোচ তং ত্বহো শ্রীবিক্রমার্কঃ সমসহ্যবিক্রমঃ॥
তস্মিন্ সদা বিক্রমমেদিনীশে বিরাজমানে সমবন্তিকায়াম্।
সর্ব্ব-প্রজামণ্ডল-সৌখ্যসম্পদ্ বভূব সর্ব্বত্র চ বেদকর্ম্ম।
(জ্যোতির্ব্বিদাভরণম্)

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, বরাহমিহির পরমসৌর ছিলেন। কারণ সূর্য্যোপাসনাই শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের কৌলিক ধর্ম্ম। তজ্জন্ত তিনি কোন্ ব্রাহ্মণ, কোন্ দেবতার উপাসক, প্রসঙ্গ ক্রমে উহারও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণই সূর্য্য-পূজার অধিকারী" *। বরাহমিহির, বৃহৎসংহিতায় জ্যোতিঃ-শাস্ত্র ও জ্যোতিঃ-শাস্ত্র-ব্যবসায়ী গ্রহবিপ্রের প্রশংসাস্থলে মহর্ষি গর্গ ও অন্যান্য ঋষির বচন সকল উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন "যে রাজা বেদবেদাঙ্গ-কুশল এবং হোরা-গণিত-শাস্ত্রবিৎ দৈববিদ্‌কে পূজা না করেন, তাঁহার অধঃপতন নিশ্চিত। জ্যোতির্ব্বিদ্-শূন্য প্রদেশে বাস করিবে না, কারণ জ্যোতির্ব্বিদই মানবের চক্ষুঃ-স্বরূপ। জ্যোতির্ব্বিদ্, যে স্থানে বাস করেন, সেখানে পাপ তিষ্ঠিতে পারে না। যে দৈববিদ্-ব্রাহ্মণ জ্যোতিঃশাস্ত্র রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছেন এবং উহার অর্থ অবগত আছেন, তিনি শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে অগ্রভুক্ ও পংক্তিপাবন। ম্লেচ্ছ এবং যবনগণ পর্য্যন্ত এই শাস্ত্র অবগত হওয়ায় ঋষিবৎ পূজা পাইয়া থাকে, অতএব জ্যোতিঃ শাস্ত্রে কৃতী দৈববিদ্ ব্রাহ্মণগণ যে পূজিত হইবেন, উহা বলাই বাহুল্য"। † বরাহমিহির যে সকল গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, জগতে যতই বিদ্যা-চর্চ্চা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, ততই উহার

---

* "বৃহৎসংহিতা" পাঠকরুন।

† কৃৎস্নাঙ্গোপাঙ্গ-কুশলং হোরাগণিতনৈষ্ঠিকম্।
যো ন পূজয়তে রাজা স নাশমুপগচ্ছতি।
* * * *
ম্লেচ্ছা হি যবনাস্তেষু সম্যক্ শাস্ত্রমিদং স্থিতম্।
ঋষিবৎ তেহপি পূজ্যন্তে কিং পুনর্দৈববিদ্ দ্বিজঃ।
(বৃহৎসংহিতায়াং সাম্বৎসরসূত্রস্য দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ)

আদর ও গৌরব বাড়িবে। ভট্টোৎপল তাঁহার গ্রন্থসমূহের টীকাকার। তিনি যথার্থই বরাহমিহিরের একজন ভক্ত ছিলেন। বরাহমিহির সংক্রান্ত অনেক কথা বলা হইল না, বাহুল্য ভয়ে এখানেই শেষ করিলাম।

ধন্বন্তরি। "জ্যোতির্ব্বিদাভরণ" পাঠে জানা যায়, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভায় ধন্বন্তরি নামে একটী চিকিৎসাবিদ্ পণ্ডিত অথবা রত্ন ছিলেন। এ বিষয়ে কিম্বদন্তীর ও অভাব নাই কিন্তু এই ধন্বন্তরি কে এবং কোন্ দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, উহা অবগত হইবার জন্য সকলেই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা হরিবংশে এক ধন্বন্তরির বিবরণ প্রাপ্ত হই, তিনি সমুদ্র-মন্থন কালে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্ম-বৈবর্ত্তপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণেও উক্ত ধন্বন্তরির বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি শঙ্করের শিষ্য মন্ত্রতত্বজ্ঞ এবং দেববৈদ্য ছিলেন। ভাবপ্রকাশ নামক প্রসিদ্ধ বৈদ্যক-গ্রন্থে এক ধন্বন্তরির বিবরণ আছে। উহা পাঠে অবগত হওয়া যায়, পূর্ব্বোক্ত স্বর্গীয় দেববৈদ্য ধন্বন্তরিই দেবরাজ ইন্দ্রের প্রার্থনায় ভূমণ্ডলস্থ ব্যাধি-পীড়িত প্রাণিগণের রক্ষার নিমিত্ত কাশীতে ক্ষত্রিয়-গৃহে দিবোদাস নামে জন্ম গ্রহণ করেন। দিবোদাস শেষে কাশীর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই কাশীরাজ দিবোদাস মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করেন। এই কাশীরাজ ধন্বন্তরিই ধন্বন্তরি-সংহিতার প্রণেতা।

ভবিষ্যপুরাণে এক ধন্বন্তরির বিবরণ আছে। উহা পাঠে জানা যায়, পুরাকালে সিংহলদ্বীপে পরীক্ষিৎ নামে এক নরপতি রাজ্য করিতেন। তাঁহার কন্যা ভানুমতীর রূপ-লাবণ্যের সীমা ছিল না।

তিনি কৈশোর অতিক্রম করিয়া যৌবনের প্রারম্ভেই সূর্য্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। সূর্য্যদেব সেই সুন্দরী রাজকুমারীর ভক্তিভাবে এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, মধ্যাহ্নকালে স্বয়ং সেই কুমারীর গৃহে আসিয়া প্রত্যহ পূজা গ্রহণ করিতেন। একদা রবিবারে সেই রাজদুহিতা সাগরে স্নান করিতে গিয়াছেন, এমন সময় নারদমুনি সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি সেই মনোরমা রাজবালাকে জলমধ্যে একাকিনী দেখিতে পাইয়া তাঁহার বসন ধারণপূর্ব্বক নির্ভয়ে বলিতে লাগিলেন "রাজকুমারি! আমি তোমাকে দেখিয়া মোহিত হইয়াছি, অতএব তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, আমার করে কর অর্পণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ কর। রাজবালা সেই প্রৌঢ় দেবর্ষির প্রস্তাবে লজ্জায় গ্রীবা ঈষৎ নত করিয়া মৃদুমধুর বাক্যে বলিতে লাগিলেন "মুনিবর! দয়া করিয়া আমার অঞ্চল ছাড়িয়া দিউন, আর আমার কয়টী কথা শুনুন। দেখুন আমি কিশোরবয়স্কা কুমারী, আর আপনি পুত্রের পিতা। সুরলোকে কত দেবাঙ্গনা আপনাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল, ভাবুন না, সেই মেনকা রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরা-কুলই বা কোথায়, আর আমার ন্যায় সামান্ত মানব-কুমারীই বা কোথায়? আহা সুরবালাদের দেহে যেমন মনোহর সৌরভ আছে, আমাদের দেহে উহা কোথা হইতে আসিবে? অতএব আপনাকে পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত করিতেছি। নারদমুনি রাজকুমারীর মৃদু-মধুর প্রত্যাখ্যানে অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে মহাদেবের নিকট উপনীত হইলেন। এ দিকে তাঁহার দেহ কুষ্ঠ-রোগে আক্রান্ত হইল। ভগবান্ শঙ্কর নারদের দুরবস্থা দেখিয়া ভগবান্ সূর্য্যকে স্তব করিলেন। সূর্য্যদেব নারদের দেহ রোগমুক্ত করিয়া মহাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"দেবদেব! আজ্ঞা করুন, আপনার আর কোন্ অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইবে"। মহাদেব বলিলেন "আপনি ব্রাহ্মণরূপে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়া রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করুন"। ভগবান্ সূর্য্য তাহাই করিলেন। অবশেষে তাঁহার পত্নী ভানুমতীর সহিত তপস্যা করিয়া পুনরায় সূর্য্যমণ্ডলে আরোহণ করিলেন। তাহার পর, মহাদেব দেবরাজকে বলিলেন "ইন্দ্র তুমি সূর্য্যকে সেবা করিয়া দেবগণের বাঞ্ছা পরিপূর্ণ কর"। দেবরাজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। তিনি বিবিধ বিধানে ভগবান্ ভাস্করকে অর্চ্চনা করিয়া স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগবান্ ভাস্কর ইন্দ্রের স্তুতি-বাক্যে প্রসন্ন হইয়া বলিলেন "কলির প্রভাবে ভূমণ্ডলের লোক রোগপীড়িত হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে রোগ হইতে মুক্ত করিবার জন্য কাশীতে ধন্বন্তরি নামে জন্মগ্রহণ করিব, ইহাতে দেবগণের অভীষ্ট-সিদ্ধি হইবে"। এই বলিয়া ভগবান্ সূর্য্য কাশীধামে কল্পদত্ত নামক ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে আবির্ভূত হইলেন এবং অন্যান্য বিপ্রগণকে ও রাজপুত্র সুশ্রুতকে শিষ্য করিয়া কল্পবেদ নির্ম্মাণ করিলেন। রোগদ্বারা ক্ষয়িত দেহকে কায় বলে, তাহার জ্ঞান যাহাতে বিদ্যমান আছে, তাহাই "কল্পবেদ"। ধন্বন্তরি কলিযুগে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার দর্শন মাত্রে রোগক্ষয় হইত। রাজকুমার সুশ্রুত ধন্বন্তরি-প্রণীত কল্পবেদ অধ্যয়ন করিয়া আট অধ্যায়-বিশিষ্ট সুশ্রুত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ছিলেন*।

উপরি উদ্ধৃত ভবিষ্যপুরাণোক্ত ধন্বন্তরি ও মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভার অন্যতম রত্ন কিনা সন্দেহ। আমরা

---

* ভবিষ্যপুরাণ-প্রতিসর্গপর্ব্ব পাঠ করুন।

পুরাণের অন্যান্য উক্তি পরিত্যাগ করিয়া কেবল কাশীনগরীস্থ কল্পদত্ত ব্রাহ্মণের পুত্রকেই যদি আমাদের প্রস্তাবোক্ত ধন্বন্তরি বলি, তাহা হইলে কথঞ্চিৎ মীমাংসা হয়।

ক্ষপণক। জ্যোতির্ব্বিদাভরণের মতে ক্ষপণক নবরত্ন-সভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। ক্ষপণক শব্দের সাধারণ অর্থ বৌদ্ধ-সংন্যাসী, বস্তুতঃ উহা কোন ব্যক্তি বিশেষের নাম নহে। অতএব বোধ হয়, একজন বিদ্বান্ বৌদ্ধসংন্যাসী নবরত্নসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনিই বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বিক্রমাদিত্যের সভায় ক্ষপণক আখ্যায় আখ্যাত হইয়াছিলেন। অনেকে বলিতে পারেন বিক্রমাদিত্য বৌদ্ধধর্ম্মের পরম শত্রু ছিলেন, তিনি কি প্রকারে উক্ত ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিকে স্বীয় সভায় সদস্য করিয়া সম্মানিত করিলেন? আমরা এস্থলে বলিতে পারি, পূর্ব্বকালের গুণগ্রাহী নরপতিগণ এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত উদার ছিলেন, তাঁহারা গুণের পূজক ছিলেন, সুতরাং ধর্ম্মবিষয়ে মতভেদ থাকিলেও অসাধারণ পণ্ডিত ক্ষপণককে, নবরত্নের অন্যতম রত্ন করিয়া সম্মানিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই ক্ষপণক, যে সে ব্যক্তি ছিলেন না। আমরা অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিয়াছি, ইনি সেই কালিদাসের প্রতি-দ্বন্দ্বী সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক দিঙ্নাগাচার্য্য। কথিত আছে, দিঙ্নাগ সর্ব্বদা কালিদাসের কবিতার দোষ উল্লেখ করিতেন, তজ্জন্য মহা-কবি কালিদাসও পূর্ব্বমেঘের চতুর্দশ শ্লোকে * প্রকারান্তরে দিঙ্-

* অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভি-
র্দৃষ্টোৎসাহ শ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥ ১৪॥
(মেঘদূত-মল্লিনাথটীকা দ্রষ্টব্য)

নাগের কথার অবতারণা করিয়া গিয়াছেন। মল্লিনাথ ও ব্যাখ্যায় উহা স্পষ্টরূপে বিবৃত করিয়াছেন।

দিঙ্নাগের জন্মভূমি, দক্ষিণাপথের কাঞ্চীপুর নগরীর সন্নিহিত সিংহবক্ত্‌নামক গ্রাম্। তিনি ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দিঙ্নাগ মহাপণ্ডিত বিশেষতঃ ন্যায়দর্শনে অসাধারণ কৃতী ছিলেন। এক সময় তিনি উৎকলের সমুদয় নৈয়ায়িককে ন্যায়দর্শনের বিচারে পরাস্ত করিয়া "তর্কপুঙ্গব" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পরে তিনি বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বসুবন্ধু-নামক একজন বৌদ্ধপণ্ডিতের শিষ্য হইয়াছিলেন এবং নাগদত্তের সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার উদ্দেশে বিদর্ভদেশে বাস করিতেন। মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া তাঁহার সভার অন্যতম সদস্যপদে বরণ করেন। সুপ্রসিদ্ধ তিব্বতভ্রমণকারী রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, মহোদয় তিব্বতপ্রদেশের রাজধানী লাসানগরীর পুস্তকালয়ে দিঙ্নাগাচার্য্য-বিরচিত "প্রমাণসমুচ্চয়" নামক দর্শনগ্রন্থ দেখিয়া আসিয়াছেন। সম্ভবতঃ দিঙ্নাগের আরও অনেক গ্রন্থ ছিল, কালক্রমে উহা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ঘটকর্পর। ঘটকর্পর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অন্যতম রত্ন। এই কবি যখন বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার সদস্য সুতরাং তাঁহার সমসাময়িক। ঘটকর্পরের জন্মভূমি কোথায় এবং তাঁহার প্রকৃত নাম কি? উহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে তিনি যখন মালবেশ্বরের সভাসদ্ ছিলেন, তখন তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় যে, উজ্জয়িনীতে অতিবাহিত হইয়াছিল উহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। জ্যোতির্ব্বিদা-

ভরণের মতে তাঁহার প্রকৃত নাম হরি *। হরি কিন্তু অমরসিংহের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, শবরস্বামীর বৈশ্যাপত্নী-গর্ভজাত সন্তান †। এই কবি সংক্রান্ত একটী কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যথা ;—

কবিবর হরি যমক অনুপ্রাস প্রভৃতি শব্দালঙ্কার-পূর্ণ কবিতা রচনায় অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। তিনি নিত্য নিত্য যমককবিতা রচনা করিয়া মহারাজ বিক্রমাদিত্যের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া পুরস্কৃত হইতেন। উত্তরোত্তর রাজসম্মান লাভে, ক্রমে তাঁহার গর্ব্বের মাত্রা বাড়িয়া গেল। তিনি একদিন রাজসভায় বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন "যে কবি যমক কবিতা রচনাদ্বারা আমাকে পরাজিত করিতে পারিবেন, আমি তাঁহার জন্য কুম্ভে করিয়া জল বহন করিব" ‡। এই প্রতিজ্ঞাবাক্য শ্রবণে সকলেই বিস্মিত হইল। তখন মহাকবি কালিদাস একটু অবজ্ঞাপূর্ণ হাসি হাসিয়া সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। কয়েক দিন পরে তিনি "নলোদয়" নামক একখানি যমক-কাব্য রচনা করিয়া লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। কলিদাসের কবিতার নিকট হরির কবিতা হীন বলিয়া প্রমাণিত হইল। কবি লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

---

* শঙ্কুঃ সুবাক্ বররুচির্মণিরংশুদত্তঃ,
বিষ্ণুস্ত্রিলোচনো হরির্ঘটকর্পরাখ্যঃ।
অন্যেঽপি সন্তি কবয়োঽমরসিংহপূর্ব্বাঃ।
যস্যৈব বিক্রমনৃপস্য সভাসদোঽমী॥
(জ্যোতির্বিদাভরণম্)

† "বৈশ্যায়াং হরিচন্দ্র-বৈদ্যতিলকো-জাতশ্চ শঙ্কুঃ কৃতী"।

‡ জীয়েয় যেন কবিনা যমকৈঃ পরেণ,
তস্মৈ বহেয়মুদকং ঘটকর্পরেণ॥

যদিও সভাসদ্‌গণ তাঁহার দ্বারা জল বহন করাইলেন না, কিন্তু নিয়ত ঘটকর্পর বলিয়া আহ্বান করিতে করিতে তাঁহার প্রকৃত নাম প্রচ্ছন্ন হইয়া গেল, কালক্রমে তিনি ঘটকর্পর নামেই প্রসিদ্ধ হইলেন। এই জনশ্রুতি ভিন্ন ঘটকর্পর সম্বন্ধে আর কিছুই জানা যায় না। তাঁহার একখানি (নীতিসার নামক) যমক কাব্য আছে, এস্থলে পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য উক্ত কাব্যেরও নলোদয়ের দুইটী কবিতা উদ্ধৃত হইল *।

শঙ্কু। পণ্ডিতবর শঙ্কু, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভায় অন্যতম সদস্য ছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদাভরণও চিরপ্রচলিত কিম্বদন্তী উহার সাক্ষী। তিনি একজন দার্শনিক ছিলেন এবং দর্শনশাস্ত্র সংক্রান্ত তাঁহার কতিপয় গ্রন্থ ছিল, এই জনশ্রুতি বিদ্যমান আছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয় নাই। তবে দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ কৃতিত্ব না থাকিলে তিনি কখনই নবরত্নসভায় প্রবেশলাভ করিতে পারিতেন না। বিশেষ জ্যোতির্ব্বিদাভরণ-প্রণেতা একটী কবিতায় শঙ্কুকে পণ্ডিতবর

---

* হংসপংক্তিরপি নাথ সংপ্রতি,
প্রস্থিতা বিয়তি মানসং প্রতি।
চাতকোঽপি তৃষিতোঽম্বু যাচতে ॥
দুঃখিতা পথিক! সা প্রিয়াচ তে ॥

(ঘটকর্পর-যমককাব্যম্)

ন সমা ন সমা ন সমা ন সমা,
গমমাপ চিরং বসন্তনতঃ।
ভ্রমদ ভ্রমদ ভ্রমদ ভ্রমদ
ভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ ॥

(কালিদাস-নলোদয়-কাব্যম্)

আখ্যায় আখ্যাত করিয়া প্রথমেই তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন *। তিনি যখন নবরত্নসভার সদস্য ছিলেন, সুতরাং অবশ্যই বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক একথা স্বীকার করিতে হইবে। কথিত আছে, শঙ্কু শবরস্বামীর বৈশ্যাপত্নীর সন্তান † এবং মধ্যভারতবর্ষ তাঁহার জন্মভূমি ছিল।

বেতালভট্ট। জ্যোতির্ব্বিদাভরণের মতে কবিবর বেতালভট্ট, মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার অন্যতম সদস্য ছিলেন। কথিত আছে, বেতালভট্ট ইতিহাসবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। রাজবংশের কীর্ত্তিকথা কবিতায় গ্রথিত করাই তাঁহার কার্য্য ছিল। এখন বেতালভট্টের গ্রন্থসকল বিলুপ্ত, একমাত্র জ্যোতির্ব্বিদাভরণও চিরপ্রচলিত জনশ্রুতিই উক্ত পণ্ডিতের অস্তিত্বের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, পুরাকাল হইতে রাজবংশের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনার জন্য এক জন অথবা ততোঽধিক মাগধ বা স্তুতিপাঠক বিদ্যমান থাকিত। বাল্মীকি রামায়ণ ও মহাভারতে পর্য্যন্ত উহার প্রমাণ রহিয়াছে। কালিদাসের সমসাময়িক বিক্রমাদিত্যের সভায় উক্ত স্তুতিপাঠক বা ভট্ট না থাকিলে কালিদাস তাঁহার রঘুবংশ কাব্যে উহার বর্ণন করিতেন না। সম্ভবতঃ এই

---

* শঙ্ক্বাদি পণ্ডিতবরাঃ কবয়স্ত্বনেকে,
জ্যোতির্ব্বিদঃ সমভবংশ্চ বরাহপূর্ব্বাঃ।
শ্রীবিক্রমস্য বুধসংসদি প্রাজ্যবুদ্ধে
স্তৈরপ্যহং নৃপসখঃ কিল কালিদাসঃ॥
(জ্যোতির্ব্বিদাভরণম্)

† "বৈশ্যায়াং হরিচন্দ্র-বৈদ্যতিলকো জাতশ্চ শঙ্কুঃ কৃতী"।

বেতালভট্টই বিক্রমাদিত্যের সভায় রাজকীয় ভট্ট বা স্তুতিপাঠক-পদে নিযুক্ত ছিলেন।

অমরসিংহ। কথিত আছে, সুপ্রসিদ্ধ অমরকোষ অভিধানের প্রণেতা মহাকবি অমরসিংহ মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন-সভার অন্যতম রত্ন ছিলেন। জ্যোতির্ব্বিদাভরণ ও এই মতের সাক্ষী। বুদ্ধগয়ায় যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার উৎকীর্ণ লিপি পাঠে এই জ্ঞাত হওয়া যায়, "বিক্রমাদিত্য অতি-প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। তাঁহার নবরত্নসভার অন্যতম উজ্জ্বল-রত্ন অমরসিংহ কর্ত্তৃক এই বুদ্ধমন্দির নির্ম্মিত হইল"। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, মহারাজ বিক্রমাদিত্য খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে আবির্ভূত হন। অতএব তাঁহার নবরত্ন সভার সদস্য অমরসিংহও যে, খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, এরূপ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। যদিও তাঁহার কোন প্রামাণিক জীবন-বৃত্তান্ত নাই, তবে একটী প্রমাণ দ্বারা অবগত হওয়া যায়, তিনি শবরস্বামীর শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত সন্তান *। অমরসিংহ বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার লেখা হইতেও উহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি তাঁহার অভিধানের প্রথমে যে মঙ্গলাচরণের শ্লোক রচনা করিয়াছেন, বঙ্গদেশীয় অধ্যাপকগণ উহার দুইপ্রকার ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। আমরা পাঠাবস্থায় যখন বৌদ্ধধর্ম্মের নাম পর্য্যন্ত জানিতাম না, তখনই অধ্যাপকের মুখে দুই প্রকার অর্থ শুনিয়াছি।

প্রথম অর্থ ;—যিনি জ্ঞান এবং দয়ার সাগর, যাঁহার গুণগ্রাম

* "শূদ্রায়ামমরঃ যড়েব শবরস্বামি-দ্বিজন্যাঙ্গজাঃ"

অতিনির্ম্মল ও যাঁহার মহিমার অন্ত নাই, হে পণ্ডিতগণ! আপনারা সম্পদ্ ও মোক্ষের নিমিত্ত সেই নিত্যবস্তু শিবকে সেবা করুন।

দ্বিতীয় অর্থ ;—যিনি জ্ঞান ও করুণার সাগর, যাঁহার গুণগ্রাম অতিপবিত্র ও যাঁহার মহিমার অন্ত নাই, হে পণ্ডিতগণ! আপনারা সম্পদ্ ও নির্ব্বাণ লাভের নিমিত্ত সেই নিত্যবস্তু ভগবান্ বুদ্ধকে সেবা করুন *।

এস্থলে প্রথমোক্ত অর্থ অপেক্ষা, শেষোক্ত অর্থই অধিকতর সঙ্গত। কেহ কেহ, প্রথমোক্ত শিবপক্ষে ব্যাখ্যা না করিয়া এ শ্লোকের শুধু বুদ্ধ-পক্ষেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু পণ্ডিত-সমাজে এই রূপ জনশ্রুতি প্রচলিত যে, গ্রন্থকার স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মা-বলম্বী কিন্তু তাঁহার প্রভু বিক্রমাদিত্য শৈব, এ অবস্থায় যদি গ্রন্থারম্ভে বুদ্ধের নাম করেন, তাহা হইলে রাজা কুপিত হন, আবার নিজের বিশ্বাস ও পরিত্যাগ করিতে পারেন না, সুতরাং স্পষ্টতঃ কোন দেবতার নাম উল্লেখ না করিয়া "সঃ" এই পদের ব্যবহার করিয়াছেন। শিব পক্ষে ব্যাখ্যা করিয়া রাজার মন সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, কিন্তু ছাত্রবর্গের নিকট বুদ্ধ-পক্ষেই ব্যাখ্যা করিতেন কিন্তু এ কথায় সহজে বিশ্বাস হয় না। কারণ অমর-সিংহ ঐরূপ কপট বৌদ্ধ ছিলেন না। তিনি অমরকোষের স্বর্গ-বর্গে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর প্রভৃতি সমস্ত দেবতার অগ্রে শাক্যসিংহ বা বুদ্ধদেবের পর্য্যায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ হইলে কদাচ ঐরূপ করিতে সাহসী হইতেন না। আর সুশিক্ষিত এবং গুণগ্রাহী নরপতি বিক্রমাদিত্যই বা বৌদ্ধ পণ্ডিতের প্রতি

* "যস্য জ্ঞানদয়াসিন্ধোরগাধস্যানঘা গুণাঃ।
সেব্যতামক্ষয়ো ধীরাঃ স শ্রিয়ে চামৃতায় চ"॥

বিদ্বেষ প্রকাশ করিবেন কেন? অনুসন্ধান দ্বারা জানা গিয়াছে, তাঁহার নবরত্নসভায় আরও অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন।

অমরসিংহ বোধ হয়, জীবনের অধিকাংশ সময়ই উজ্জয়িনী মহানগরীতে যাপন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, অমরকোষ ব্যতীত তিনি আরও কতিপয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় যত অভিধান গ্রন্থ আছে, অমরকোষ তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ঐরূপ একখানি সুন্দর অভিধান-গ্রন্থ রচনা করিয়া গ্রন্থকার সংস্কৃত-ভাষার অশেষ কল্যাণসাধন করিয়া গিয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

উজ্জয়িনীতে অবস্থিতি।

উজ্জয়িনী নগরীতে পৌঁছিয়া পুরাতত্ত্বের আলোচনায় অনেক ক্ষণ অতিবাহিত করিয়াছি, এখন প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, উজ্জয়িনী দর্শনের নিমিত্ত হৃদয়ে অত্যন্ত বাসনা হইয়াছিল। ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া কেমন এক অভিনব ভাব মনোমধ্যে সমুদিত হইল। ভাবিলাম, এই সেই ক্ষেত্র, যেখানে নানা জাতীয় সহস্র সহস্র নরপতির

সাহস ও বলবিক্রমের পরীক্ষা হইয়াছিল এবং মহাকবি কালিদাসও বরাহমিহিরের ন্যায় শত শত মনীষীর প্রতিভা ও জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশ সংঘটিত হইয়াছিল ? এখন সেই সৌধ-মালিনী উজ্জয়িনী আর পূর্ব্বের ন্যায় হাস্যমুখী নহেন, সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। অধুনা মহাকবি কালিদাসের মধুময়ী লেখনী চিরবিশ্রাম লাভ করিয়াছে। অভিজ্ঞানশকুন্তল অথবা বিক্রমোর্ব্বশী নাটকের অপূর্ব্ব অভিনয় আর এখন নাগরিক-গণের চিত্তবৃত্তি বিমোহিত করেনা। বরাহমিহিরের সেই জ্যোতিষিক যন্ত্রের সাহায্যে নভোমণ্ডলস্থ জ্যোতিষ্কগণের অবলোকন-ব্যাপার অনেক দিন নিরস্ত হইয়াছে। সংপ্রতি কেবল সেই ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী শিপ্রা এবং উহার দক্ষিণতীরস্থ উজ্জয়িনী নগরী পূর্ব্বগৌরবের নষ্টাবশেষ বক্ষে ধারণ করিয়া নিঃশব্দে বিরাজমান রহিয়াছেন। তথাপি এখানে আগমনের পর, প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীন অট্টালিকাশ্রেণী, নানাবিধ মঠ ও অভ্রস্পর্শি-উচ্চচূড়াবিশিষ্ট দেবমন্দির-পরিশোভিত শিপ্রাতীরের যে কি এক পরমরমণীয় দৃশ্য আমার নয়নপথে পতিত হইয়াছিল, উহা আমি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিবনা।

১০ই বৈশাখ সোমবার প্রাতঃকালে উজ্জয়িনীতে উপনীত হইলাম। সে দিন আমি ব্যতীত আরও অনেক তীর্থযাত্রী সেখানে অবতরণ করিল। পাণ্ডারা আমাকে নিজ নিজ যাত্রী করিবার জন্য পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিল। ঐ রূপ কলহে অনেক সময় নষ্ট হইতে লাগিল দেখিয়া আমার সহিত ফতেয়াবাদজংসনে যে পাণ্ডার প্রথম সাক্ষাৎকার হয়, আমি তাহারই অনুসরণ করিলাম। পাণ্ডা আমাকে সঙ্গে করিয়া বহুদিনের পরিত্যক্ত অতিপ্রাচীন এক প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকার উপরিভাগে উপস্থিত



উজ্জয়িনী শিপ্রা তীর্থ।

হইল। ঐ প্রকাণ্ড বাটীটীর কোথাও কোন মানুষের বাস নাই। সিপ্রার দিকে উত্তরাভিমুখে শ্রেণীবদ্ধ উন্মুক্ত-বাতায়ন গৃহগুলি যেন মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। আমি সেই মনুষ্য-পদ-সঞ্চার-রহিত বাটী দেখিয়া মনে মনে নিতান্ত শঙ্কিত হইলাম। পাণ্ডা একটা গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল "এই গৃহে আপনার আসবাব রাখুন, পাশের ঘরে পাক করিবেন। দেখুন না, এই সকল ঘরে কেমন হাওয়া খেলে। এখানে কোন ভয় নাই, আমি রাত দশটা পর্য্যন্ত আপনার কাছে হাজির থাকিব, আবার সকাল আটটা না বাজিতেই আসিয়া উপস্থিত হইব"। আমি ভাবিলাম, এ বাড়ীতে একটা খুন হইয়া গেলেও বাহিরের লোকের জানিবার সম্ভাবনা নাই, অতএব এখানে থাকা নিতান্ত অযুক্ত। পাণ্ডা আমাকে ঐ বাটীতে থাকিতে অসম্মত দেখিয়া বলিতে লাগিল, এ বাড়ীতে যৎকিঞ্চিৎ ভাড়া দিলেই চলিত, আপনি যখন থাকিতে নারাজ, আমি কি করিব? চলুন স্থানান্তরে যাওয়া যাউক। তাহার পর, সেখান হইতে অবরোহণ করিয়া রামঘাটের ঠিক উপরে এক শেঠের ভবনে উপস্থিত হইল। শেঠের নূতন দোতলা খোলার বাড়ীটী ঠিক ঘাটে যাইবার রাস্তার বাম পার্শ্বে অবস্থিত। বাড়ী-টীর দেয়াল মেঝে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। রাস্তার ধারে বারাণ্ডায় একটী দোকান আছে। উহার একাংশে ময়দা, চাউল ডাউল লবণ তৈল হরিদ্রা লঙ্কা প্রভৃতি, অপর অংশে নানাবিধ মসলা সাজান থাকে। শেঠের সহিত একটী থাকার ঘর ও একটী পাকের ঘরের ভাড়ার বন্দোবস্ত ঠিক হইলে সে বলিল "রাজপুতানার একটী বিধবা রাণী তীর্থ-দর্শনে আসিয়াছেন। তিনি তাঁহার লোক লস্কর সহ উপরে আছেন। অদ্যাই সন্ধ্যার ট্রেনে তিনি

এখান হইতে চলিয়া যাইবেন, তখন আপনি উপরে একটী থাকার ঘর পাইবেন। তিনি না যাওয়া পর্য্যন্ত আপনাকে এই নীচের বারান্দায়ই থাকিতে হইবে"। গ্রীষ্মকাল, পরিষ্কার বারান্দা সুতরাং কোন অসুবিধার সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তাহার কথায়ই সম্মত হইলাম। প্রাতঃকৃত্য ও হস্তমুখ প্রক্ষালন শেষ করিয়া স্নানের জন্য প্রস্তুত হইলাম। পাণ্ডার উপদেশ অনুসারে শিপ্রা-ভেটের জন্য একটী নারীকেল ও তীর্থ-শ্রাদ্ধের সমুদয় দ্রব্য দেখিয়া লইলাম।

শিপ্রাস্নান।—অবন্তী বা উজ্জয়িনী যে শুধু ভারতবর্ষের একটী রাজধানী ছিল বলিয়াই প্রসিদ্ধ, তাহা নহে। ইহা একটী মহা-তীর্থ। বৈদিক কালে অথবা উহার অব্যবহিত পরেই বোধ হয় অবন্তী মহাতীর্থ প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈদিক কালে ঋষিগণ যে সকল পুণ্য-নদীর তীরে তপস্যা করিতেন অথবা যে সকল ক্ষেত্রে অসা-ধারণ ধর্ম্মপরায়ণ নরনারীগণের বিশেষ কীর্ত্তিকলাপ অনুষ্ঠিত হইত, কালক্রমে উহাই তীর্থ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কোন্ ব্রহ্মর্ষির ব্রহ্ম-চিন্তায় এই ক্ষেত্র প্রথম পবিত্র হইয়াছিল, কোন্ মহর্ষির শিষ্য-গণের বেদধ্বনিতে ইহা প্রথম মুখরিত হইয়াছিল, কোন্ রাজর্ষির যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান দ্বারা ইহা প্রথম গৌরবান্বিত হইয়াছিল, উহার বিশ্বাস-যোগ্য কোন প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। স্কন্দ-পুরাণে লিখিত আছে; ভারতবর্ষে যে সাতটী মহাতীর্থ মোক্ষ-প্রদ বলিয়া কথিত, অবন্তী তাহার মধ্যে একটী*। সম্ভবতঃ

* অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকাঃ।
(স্কন্দপুরাণম্)

অবন্তী তীর্থের নামেই এই দেশ প্রথম অবন্তী আখ্যায় আখ্যাত হয়। কালিদাস এই দেশকে অবন্তি ও নগরীকে উজ্জয়িনী ও বিশালা নামে বর্ণন করিয়াছেন*। বরাহমিহির বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত, পৌলিশসিদ্ধান্ত, রোমকসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত এবং পৈতামহসিদ্ধান্ত—এই পাঁচখানি সিদ্ধান্ত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া যে সুপ্রসিদ্ধ 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা' গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, উহাতে অবন্তীও উজ্জয়িনী এই উভয় নামেরই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন "অবন্তী হইতে ৫৫৬⅔ যোজন উত্তরে গমন করিলে ভূমধ্য বা সুমেরু প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং লঙ্কা হইতে ৮০০ যোজন উত্তরে গমন করিলে ও ভূমধ্য বা সুমেরু প্রাপ্ত হওয়া যায়†। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে সুমেরু হইতে ৫৫৬⅔ যোজন দক্ষিণে ও লঙ্কা হইতে ২৪৩⅓ উত্তরে অবন্তী নগরী অবস্থিত। উক্ত গ্রন্থকার আরও লিখিয়াছেন "লঙ্কা হইতে সমসূত্রপাত উত্তরে উজ্জয়িনী, তজ্জন্য উভয় স্থানে এক কালে মধ্যাহ্ন উপস্থিত হয় কিন্তু বিষুব দিন (১০ই আশ্বিন ১০ই চৈত্র‡ ব্যতীত) অপর সকল দিনের পরিমাণ এই উভয় স্থানে

---

* প্রাপ্যাবন্তীমুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্
পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্॥

মেঘদূতম্

† ষড়শীতিং পঞ্চশতীং ত্রিভাগহীনং চ যোজনং গত্বা।
ক্ষিতিমধ্যমুদগবন্ত্যা লঙ্কায়া যোজনাষ্টশতীম্॥১॥

‡ বিগত ১৮২১ শক হইতে এক বিংশতি অয়ন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে সুতরাং উক্ত শক হইতে ৬৬ বৎসর ৮ মাস পর্য্যন্ত ৯ই আশ্বিন ও ৯ চৈত্র বিষুব দিন হইবে।

সমান নহে*"। সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্য তদীয় "সিদ্ধান্তশিরোমণি" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"গণিত দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, নিরক্ষদেশ (লঙ্কা) হইতে অবন্তী পৃথিবীর ষোড়শ অংশের উপরি অবস্থিত। এই লঙ্কা ও অবন্তীর অন্তবর্ত্তী যোজনকে ষোড়শগুণ করিলেই ভূপরিধিমানের নিশ্চয় হইতে পারে +। উদ্ধৃত প্রমাণ সকল পাঠ করিয়া নিশ্চয় প্রতীতি হয় উজ্জয়িনী সুধু তীর্থ বা রাজধানী নহে, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের ও ইহা একটী প্রধান ক্ষেত্র ছিল।

অনন্তর পাণ্ডার সহিত শিপ্রাতীরে গমন করিলাম। অবন্তী যেমন মহাতীর্থ শিপ্রা ও তেমন পুণ্যনদী। শিপ্রানদীর উৎপত্তি-সংক্রান্ত পুরাণে একটী সুন্দর আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। "মহর্ষি বশিষ্ঠ যথাবিধি অরুন্ধতীর কর গ্রহণ করিয়া অতিশয় পরিতোষ লাভ করেন। সেই বিবাহে যজ্ঞাবশিষ্ট যে শান্তিজল মানস-পর্ব্বতের গুহায় পতিত হয়, উহা সাতভাগে বিভক্ত হইয়া হিমাদ্রির গুহায় শৃঙ্গে এবং সরোবরে নিপতিত হয়। তাহাই শিপ্রানদীরূপে পরিণত হইয়াছিল। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু শিপ্রানদীকে ভূমণ্ডলে প্রেরণ করেন"। শিপ্রানদীর পৌরাণিক ইতিবৃত্ত এই রূপ কিন্তু

---

* উজ্জয়িনী লঙ্কায়াঃ সন্নিহিতা যোত্তরেণ সমসূত্রে।
তন্মধ্যার্কো যুগপৎ বিষমো দিবসো বিষুবতোঽন্যঃ॥
পৈতামহসিদ্ধান্তঃ।

+ নিরক্ষদেশাৎ ক্ষিতিষোড়শাংশে,
ভবেদবন্তী গণিতেন যস্মাৎ।
তদন্তরং ষোড়শসংগুণংস্যা
দ্ভূমানমস্মাদ্বহু কিং তদুক্তম্॥
(সিদ্ধান্তশিরোমণিঃ)

এখন যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে অবগত হওয়া যায়, এই নদী অনতিদূরবর্ত্তী পারিযাত্র-পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া চর্ম্মণ্বতী নদীর সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। পাঠাবস্থা হইতে বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি এবং বহু স্রোতস্বতীর জলে অবগাহন করিয়াছি কিন্তু শিপ্রানদীর জলের ন্যায় বিমল জল কখনও নয়ন-পথে পতিত হয় নাই। দাড়িম-বীজের ন্যায় নির্ম্মল জল-প্রবাহ পার্ব্বত্য-ভূমিতে প্রবাহিত হওয়ায়, জলের পাঁচ ছয় হস্ত নিম্নে সঞ্চরমাণ ক্ষুদ্র মৎস্যগুলি পর্য্যন্ত অনায়াসে দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। শিপ্রার তীরদেশে রামঘাট, দত্তাত্রেয়-ঘাট, পিশাচ-মুক্তেশ্বরঘাট, গন্ধর্ব্ববতীঘাট, দশাশ্বমেধঘাট, মঙ্গলাঘাট, সিদ্ধনাথের ঘাট, ছত্রীঘাট প্রভৃতি বহুসংখ্যক প্রসিদ্ধ ঘাট আছে। প্রত্যেক ঘাটেই প্রায় পাষাণনির্ম্মিত সোপানাবলী ও বসিয়া সন্ধ্যা-পূজা করিবার জন্য ঘাটের উভয় পার্শ্বে গোলাকার স্থান নির্ম্মিত আছে। ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত হইতে প্রায় দ্বাদশ ঘটিকা পর্য্যন্ত অসংখ্য দণ্ডী, পরমহংস, ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ-মহিলা ও অন্যান্য পুরললনারা সন্ধ্যা পূজা ও স্তোত্র-পাঠে নিরত হইয়া শিপ্রাতীরের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়া থাকেন। অবন্তীতীর্থের তীর্থ-পুরোহিতগণ আদিগৌড় ব্রাহ্মণ, পাণ্ডারা যাজনকার্য্য করে না। আচমনান্তে শিপ্রাভেট প্রদান করিয়া সঙ্কল্পপাঠ-পূর্ব্বক অবগাহন করিলাম। নারিকেল নদীপ্রবাহে নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্ব-ক্ষণেই অনেক ব্রাহ্মণবটু প্রস্তুত হইয়া ছিল, যেই উহা জলে পতিত হইল, অমনি সকলে যুগপৎ লম্ফ দিয়া উহার উপর পড়িল। সেই সকল বালকের গৌরদেহ স্বচ্ছজলের মধ্যে প্রতিবিম্বিত হওয়ায় অতি সুন্দর দেখাইতে লাগিল। শিপ্রাস্নানের সঙ্কল্প মন্ত্রটী বড় উপাদেয়।

মন্ত্রের মধ্যে কালনির্ণয় (অর্থাৎ কোন্ কল্প, কোন্ মন্বন্তর, কোন্ অয়ন ইত্যাদি) জম্বুদ্বীপ, ভারতবর্ষ, অবন্তিদেশ, শিপ্রানদী, পূর্ব্ব-বর্ত্তী ও আধুনিক নরপতিগণের অধিকার, তীর্থ-মাহাত্ম্য, স্নানার্থীর কামনা ইত্যাদি অনেক কথার উল্লেখ আছে। স্নানান্তে নিয়মিত সন্ধ্যা শেষ করিয়া শ্রাদ্ধ করিতে বসিলাম। এখানেও গোধূম-চূর্ণ দ্বারা পিণ্ড প্রস্তুত করিতে হয়। বঙ্গদেশের শ্রাদ্ধের প্রক্রিয়ার সহিত অনেক ইতর বিশেষ লক্ষিত হইল। এখানকার তীর্থ-পুরোহিত বেশ শিষ্ট এবং যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট, যৎকিঞ্চিৎ দক্ষিণা ও ভোজ্য দ্রব্যেই পরিতোষ লাভ করিলেন। শিপ্রাতীর হইতে বাসায় ফিরিয়া গন্ধ, পুষ্প, নৈবেদ্য, ধূপ—প্রভৃতি পূজোপকরণ সংগ্রহ-পূর্ব্বক পাণ্ডার সহিত মহাকালের মন্দিরে চলিলাম।

মহাকালের অর্চ্চনা। বাসা হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে পশ্চিমদিকে গমন করিয়া মহাকালের সেই সুপ্রসিদ্ধ মন্দির প্রাপ্ত হইলাম। অনেক শিবমন্দির দেখিয়াছি কিন্তু এক উড়িষ্যার ভুবনেশ্বরের মন্দির ব্যতীত এত উচ্চ ও বৃহৎ মন্দির কথনও নয়ন-পথে পতিত হয় নাই। এই মন্দির কাশীধামের বিশ্বেশ্বরের মন্দির অপেক্ষা অনেক বড়। কত কাল পূর্ব্ব হইতে উজ্জয়িনীতে মহা-কাল শিব প্রতিষ্ঠিত আছেন, উহা জানিবার উপায় নাই। মহা-ভারতের বনপর্ব্বে মহাকালের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারতীয় সময়ে এই মহাকালের অধিষ্ঠিত ক্ষেত্র কোটিতীর্থ নামে অভিহিত হইত। মহর্ষি পুলস্ত্য ভীষ্মের নিকট তীর্থমাহাত্ম্য বর্ণন কালে বলিতেছেন। "অনন্তর সংযত হইয়া মহাকালস্থলে গমন করিবে। কোটি-তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল

লাভ হয়" *। অতএব প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও এই মহাকালস্থল ভারতীয় জনসাধারণের নিকট একটী মহাতীর্থ বলিয়া বিদিত ছিল। মৎস্যপুরাণ নারসিংহপুরাণ ও স্কন্দপুরাণে এই মহাকাল শিবের বিষয় বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে মহাকবি কালিদাস মহাকালের মন্দিরের কথা লিখিয়া গিয়াছেন *। এতদ্ভিন্ন অসংখ্য সংস্কৃত গ্রন্থে এই স্থানের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। মহাকালের মন্দির যেমন উচ্চ ও বৃহৎ তেমন ইহার শিল্পনৈপুণ্য ও অতিমনোহর। ফিরিস্তানামক মুসলমান-ইতিহাসে এই মন্দিরের সুন্দর বর্ণনা আছে। উক্ত গ্রন্থকার লিখিয়াছেন "এই মন্দিরের বৃহৎ সুবর্ণস্তম্ভ-সমূহ মণি-মাণিক্য-খচিত ছিল। গর্ভগৃহ-মধ্যে একটী সামান্য আলোক জ্বালাইয়া দিলে, সেই আলোক অসামান্য হীরকে প্রতিফলিত হইয়া সমস্ত মন্দির যেন সূর্য্যালোকের মত উজ্জ্বল করিয়া তুলিত"। কথিত আছে, আলতমাস্ নামক এক জন যবন এই মন্দিরের সমস্ত মণি মাণিক্য ও রত্নাদি লুণ্ঠন করিয়া মন্দিরের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছিল। এখন এই মন্দিরের প্রধান

---

* মহাকালং ততো গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
কোটীতীর্থমুপস্পৃশ্য হয়মেধফলং লভেৎ ॥৪৮॥
(মহাভারত-বনপর্ব্ব ৮২ অধ্যায়ঃ)

* অসৌ মহাকালনিকেতনস্য
বসন্নদূরে কিল চন্দ্রমৌলেঃ।
তমিস্রপক্ষেঽপি সহ প্রিয়াভি-
র্জ্যোৎস্নাবতো নির্বিশতি প্রদোষান্ ॥ ৩৪ ॥
(রঘুবংশম্)

দর্শনীয় পদার্থ স্বর্ণ-কলস। বহুদূর হইতে মন্দির-চূড়াস্থ সুবর্ণময় কুম্ভ দর্শকগণের হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব আনন্দ প্রদান করে।

এখন আর মহাকাল ঐ বৃহৎ মন্দিরে অবস্থান করেন না। মন্দিরের সন্নিহিত দক্ষিণ পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র দ্বার আছে। ঐ দ্বার দিয়া একটী সুরঙ্গে প্রবেশ করিতে হয়। তাহার পর পাষাণময় সোপান পথে কিছু দূর অবতরণ করিলেই কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত একটী মন্দির প্রাপ্ত হওয়া যায়। ঐ মন্দির-মধ্যে অতি প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ বিরাজমান। চতুর্দ্দিকে ঘৃতের প্রদীপ দপ্ দপ্ করিয়া নিরন্তর জ্বলিতেছে। বোধ হয় ঐ সকল উজ্জল দীপ না থাকিলে দিবসেও ঐ মন্দির সূচিভেদ্য তিমিরে আচ্ছন্ন হইত। ঐ মন্দিরে বাতাসের নিতান্ত অপ্রাচুর্য্য। সুরঙ্গপথে যে সামান্য বায়ু সঞ্চার হয়, উহাও নির্গত হইবার পথ পায় না। বিশেষ ঐ সময় সুরঙ্গ-পথে অত্যন্ত জনতা সুতরাং বায়ুর চলাচল একরূপ বন্ধ। আমি যখন মন্দিরে প্রবেশ করিলাম, তখন প্রায় ত্রিংশৎটী স্ত্রী পুরুষ শিবার্চ্চনায় নিরত। গৌরাঙ্গী ব্রাহ্মণ-মহিলারা অতিমধুর স্বরে মহিম্নস্তব পাঠ করিতেছেন। ভক্তগণের বম্ বম্ রবে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত। আমি একটু স্থান করিয়া বসিলাম, পূজা শেষ হইলে স্তব পাঠের পূর্ব্বেই বায়ুর অভাবে যেন আমার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তাহারপর, কোনরূপে একটী মহিম্নস্তব আবৃত্তি করিয়া প্রণিপাত-পূর্ব্বক নির্গত হইলাম। ইচ্ছা করিলেও ঐ পথে সহজে উঠিবার উপায় নাই, মধ্যে মধ্যে জনস্রোতে প্রতিহত হইয়া দাঁড়াইতে হইল। তাহারপর, বহুকষ্টে উপরে উঠিয়া নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া বাঁচিলাম। বড় মন্দিরের চিররুদ্ধ প্রধান দ্বারের সম্মুখে একটী সুদীর্ঘ প্রশস্ত বারান্দা। উহার সম্মুখে একটী প্রাচীন জলাশয়। জলাশয়টী

অতিগভীর এবং উহার চারিতীরেই প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপানশ্রেণী বিরাজিত। মন্দিরের প্রধান দ্বারের অগ্রভাগে বারান্দায় একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলান রহিয়াছে। উভয় পার্শ্বে চকীতে বসিয়া কতকগুলি ব্রাহ্মণ উচ্চৈঃস্বরে চণ্ডীপাঠ করিতেছেন। সকলেই পূজা শেষ করিয়া ফিরিবার সময় ঘণ্টাধ্বনি ও ব্রাহ্মণদিগকে কিছু প্রদান করিয়া যাইতেছে। আমিও ঐ উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণের সমীপবর্ত্তী হইলাম। সংস্কৃত-ভাষায় আলাপ করিলেই তাঁহারা অতি-প্রসন্নবদনে আমাকে বসিতে অনুরোধ করিলেন এবং অনেকগুলি ব্রাহ্মণ এক স্থানে সমবেত হইলেন। তাহার পর, অনেকক্ষণ কথোপকথন হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "মহাকাল এখন বৃহৎ মন্দিরে অবস্থান করেন না কেন"? তাঁহাদের কেহ বলিলেন "মুসলমান বাদসাহ অল্লাবদীনের আক্রমণের পূর্ব্বক্ষণে মহাকালকে স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল"। কেহ বা ঔরঙ্গজীব বাদসাহের অত্যাচারের কথা উল্লেখ করিলেন। কেহ বলিলেন "কালাপাহাড়ের ভয়ে মহাকালকে সুরঙ্গ-মধ্যস্থ গুপ্ত-মন্দিরে রক্ষা করা হইয়াছিল"। বস্তুতঃ চণ্ডীপাঠক ব্রাহ্মণগণও ঠিক সংবাদ জানেন না, তাঁহারা যেরূপ কিম্বদন্তী শুনিয়াছেন তাহাই উল্লেখ করিলেন। বোধ হয়, আলতমাসের আক্রমণের সময়েই মহাকালকে গুপ্ত মন্দিরে প্রচ্ছন্ন রাখা হইয়াছিল। কারণ সুরঙ্গ-মধ্যস্থ মন্দিরটীও অত্যন্ত প্রাচীন বলিয়া বোধ হইল। মন্দির রক্ষা ও মহাকালের সেবার জন্য ভারতীয় রাজন্যবর্গ বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তন্মধ্যে গোয়ালিয়রের মহারাজ-সিন্ধিয়া, মাসিক ৩০০৲, বড়োদার মহারাজ-গাইকোয়ার্ মাসিক ১২০৲ ইন্দোরের মহারাজ-হোলকার্ মাসিক ৬০৲, মেবারের প্রমরভূপতিগণ মাসিক

৫০৲ টাকা প্রদান করিয়া থাকেন। এতদ্ভিন্ন অনেক রাজা ও ধনিলোকের নিয়মিত বৃত্তি আছে। বহুকাল হইতে ত্রৈলঙ্গী ব্রাহ্মণেরাই মহাকালের সেবা সম্পন্ন করিয়া আসিতেছেন। মহাকালের মন্দির হইতে কেদারেশ্বরের মন্দিরে গমন করিলাম। কেদারেশ্বরের মন্দির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইলেও কেদারেশ্বর শিবলিঙ্গ অতিপুরাতন। কিম্বদন্তী অনুসারে অবগত হওয়া যায়, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধকালে এই শিবলিঙ্গ উজ্জয়িনীতে আবির্ভূত হন। স্থানীয় লোকে কেদারেশ্বরেরও অত্যন্ত ভক্তি করে। আমি কেদারেশ্বরের পূজা ও স্তব শেষ করিয়া পাণ্ডার সহিত কালিয়-দীঘী সন্দর্শনের নিমিত্ত চলিলাম।

কালিয়দীঘী। পাণ্ডার মুখে শুনিলাম উজ্জয়িনীতে ব্রহ্মকুণ্ড রুদ্রকুণ্ড-প্রভৃতি প্রায় অন্যূন দ্বাদশটী সরোবর ছিল। উহার অধিকাংশ লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। যে কয়টীর সামান্য খাত বিদ্য-মান আছে, উহাও গ্রীষ্মকালে জলহীন শুষ্ক হইয়া যায়। আমরা যে পথে চলিলাম উহা ঠিক বঙ্গদেশীয় শুষ্ক-প্রায় বিলের মত বোধ হইতে লাগিল। স্থানে স্থানে অল্প জলে বিকশিত অসংখ্য শ্বেত ও রক্ত পদ্ম বায়ুভরে বিকম্পিত হইয়া মধ্যাহ্ন-সূর্য্য-কিরণের সহিত ক্রীড়া করিতেছে। কোন কোন জলহীন স্থানে শ্যামল দূর্ব্বাক্ষেত্রে গো মেষ মহিষ ও অশ্বাদি পশুগণ চরিতেছে। কোথায় বা কর্দ্দমাক্ত জলে ভেকগণের নর্ত্তন কুর্দ্দনাদি দৃষ্টি-গোচর করিতে করিতে চলিলাম। অনেক ক্ষণ অনাবৃতপদে পাষাণময় বন্ধুরপথে বিচরণ করিতে করিতে পা ক্ষত বিক্ষত হইয়াছিল, এখন শুষ্কপ্রায় কর্দ্দমের উপর দিয়া চলিতে বেশ আরাম বোধ হইতে লাগিল। তাহার পর,আমরা কালিয়দীঘীতে উপস্থিত

হইলাম। কালিয়দীঘী একটী মনোরম দৃশ্য। অনেকে বলেন "স্কন্দপুরাণের অবন্তীখণ্ডে অবন্তী-তীর্থে যে, ব্রহ্মকুণ্ডের উল্লেখ আছে, কালক্রমে উহাই কালিয়দীঘী নাম ধারণ করিয়াছে। কালিয়দীঘীর মধ্যস্থলে দ্বীপাকার ভূমিখণ্ডের উপর মনোহর একটী জলপ্রাসাদ বিরাজিত। পূর্ব্বে এই প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে অনেকগুলি ফোয়ারা ছিল, এখন সে সমুদয় বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই প্রাসাদের প্রাচীর-গাত্রে কালিয়নাগের মস্তকোপরি শ্রীকৃষ্ণ-মূর্ত্তি খোদিত। এই দৃশ্যটী অত্যন্ত মনোহর। ঐ জলপ্রাসাদের নির্ম্মাতা কে? এই বিষয়টী লইয়া অনেকে অনেক মত প্রকাশ করেন। তবে অধিকাংশ প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে ইহা সেই মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নির্ম্মিত। তিনি গ্রীষ্মকালে এই জলপ্রাসাদে বাস করিতেন। উহা দেখিয়াই বোধ হয়, তাঁহার বয়স্য মহাকবি কালিদাস তাঁহার ঋতুসংহার-কাব্যে জলযন্ত্র-মন্দিরের* বর্ণনা করিয়াছেন। আমাদেরও বিশ্বাস, উহা মহারাজ বিক্রমাদিত্যেরই নির্ম্মিত। কারণ এই প্রাসাদ যেরূপ স্থায়ি উৎকৃষ্ট উপাদানে নির্ম্মিত, তাহাতে দুই সহস্র বৎসরে উহার ধ্বংস সংসাধিত হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভবপর নহে। এত জলস্রোতেও যখন উহার কণামাত্র নষ্ট হয় নাই, সুতরাং বোধ হয় আরও দুই চারি সহস্র বর্ষ উহা সমভাবেই অবস্থান করিবে।

---

* নিশাঃ শশাঙ্ক-ক্ষতনীলরাজয়ঃ
ক্বচিদ্ বিচিত্রং জলযন্ত্র-মন্দিরং।
মণিপ্রকারাঃ সরসঞ্চ চন্দনং
শুচৌ প্রিয়ে যান্তি জনস্য সেব্যতাম্ ॥২॥
(ঋতুসংহার-কাব্যম্)

হর্ষদ্বীপে কালিকা-দর্শন। কালিয়দীঘী ত্যাগ করিয়া আমরা অনতিদূরবর্ত্তী হর্ষদ্বীপে উপনীত হইলাম। ঐ দ্বীপের চতুর্দ্দিকে বহুদূর-ব্যাপী সরোবর ছিল, এখন উহা শুকাইয়া গিয়াছে। দ্বীপের মধ্যস্থলে দেবালয় বিদ্যমান। অতি-উচ্চ ও বৃহৎ মন্দিরে লেলিহানরসনা কালিকা দেবী, ভয়ঙ্কর-মূর্ত্তিবিশিষ্ট শিবের বক্ষে পদ স্থাপন-পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা। দেবালয়ের অতিবৃহৎ প্রাঙ্গণে হাড়ীকাঠ প্রোথিত আছে। অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই ছাগ বলি হইয়াছে, উহার চিহ্ন রুধির-ধারা তখনও বিলুপ্ত হয় নাই। কথিত আছে, মহারাজ হর্ষবিক্রমাদিত্য এই কালিকা-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। ইনি কোন্ হর্ষবিক্রমাদিত্য? খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে রাজা শ্রীহর্ষ কান্তকুব্জের অন্তর্গত স্থাণ্বীশ্বরের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়া ভারত-সাম্রাজ্যের শাসন-দণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। তিনিই কি হর্ষবিক্রমাদিত্য নাম ধারণ-পূর্ব্বক উজ্জয়িনী-শাসনকালে এই দ্বীপে কালিকামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন? কিন্তু হর্ষচরিত পাঠে যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে তিনি প্রথম শৈব ছিলেন, শেষে বৌদ্ধ-ধর্ম্মে অনুরক্ত হন বলিয়া বোধ হয় কিন্তু শক্তি-পূজায় তাঁহার আস্থার প্রমাণ তত পাওয়া যায় না। তবে প্রজাদের মনো-রঞ্জনের নিমিত্ত হয় ত এই শক্তি-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া থাকিবেন। অনেক স্থলে অনেক কালিকামূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়াছি কিন্তু এরূপ ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি কোথায়ও দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। এই পাষাণময়ী মূর্ত্তি একটী পূর্ণাবয়বা রমণীর সমান হইবেন। শিবটীও তদনুরূপ বৃহৎ। ঈষদ্‌বক্র গ্রীবা ও বিস্তৃত জিহ্বা দেখিলে জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়। স্থানটী অতিনির্জ্জন, চতুষ্পার্শ্বে বহুদূর পর্য্যন্ত কোন লোকালয় নাই। ঐ বৃহৎ দেবালয়ের প্রকাণ্ড দ্বারদেশে

সশস্ত্র প্রহরী বিদ্যমান। মন্দিরে দুই তিনটী পূজারিব্রাহ্মণ আছে। ঐ পূজারী ব্রাহ্মণদের মুখে শুনা গেল, অনেক রাজা মহারাজ এখানে সময়ে সময়ে অত্যন্ত সমারোহের সহিত পূজা দিতে আসিয়া থাকেন। এক সময়ে এখানে নরবলি পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। আমি মন্দির প্রদক্ষিণ ও দেবীকে প্রণিপাতপূর্ব্বক পূজারীদের হস্তে কিছু দিয়া পাণ্ডার সহিত বাসা অভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

শেঠের গৃহ। বারটা বাজিয়া গেলে প্রখর সূর্য্যাতপে দগ্ধপ্রায় হইয়া অতিক্লান্ত-দেহে বাসায় পৌছিলাম। হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া কেবল বসিয়াছি, এমন সময় শেঠ আসিয়া বলিল "মহারাজ! পশ্চিমের বারান্দায় যে ছোট পাকের ঘর আছে, সেখানে তোমার পাকের যোগাড় হইয়া আছে, যাও, পাক কর। গিয়া দেখি, ঠিকে চাকরাণী সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম "আমরা রুটী খাই না, অন্ন আহার করিয়া থাকি"। তদনুসারে শেঠ ময়দা না দিয়া পরিষ্কার আতপ তণ্ডুল দিয়াছে। নূতন কলসীতে জল ধরা আছে। কাঠ, দেশলাইয়ের বাক্স এবং অন্যান্য কোন দ্রব্যেরই অভাব নাই কিন্তু উনানটী সদ্যোজাত সুতরাং আর্দ্র, কি করিয়া উহা ধরাইব,——এই ভাবনায় পড়িলাম। চাকরাণীর কোন দোষ নাই, সে ঠিকে লোক অতক্ষণ থাকিবে' কেন? আমি যে শেঠের বাড়ী বাসা লইয়াছি, উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয়টা দেওয়া আবশ্যক। শেঠের সংসারে শেঠ ও তাহার গৃহিণী এই দুইটী-মাত্র প্রাণী। শেঠ কিছু দীর্ঘকায়, একহারা এবং উহার মস্তকে একটী শিখা আছে এবং মুখ হইতে দুই তিনটী দন্ত বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। সর্ব্বদা অতি ক্ষুদ্র একখানি মলিন বস্ত্র পরিয়া

থাকে। শেঠের বয়স পঞ্চাশ বৎসরের ন্যূন হইবে না কিন্তু উহার গৃহিণীর বয়স অধিক নহে, বোধ হয় কেবল পঁচিশ ছাব্বিশে পা দিয়াছে। খুব গৌরাঙ্গী এবং দেহখানি বিলক্ষণ নধর। মুখটী গোল ও সম্মুখের দুই তিনটী দন্ত উচ্চ। শেঠগৃহিণীর প্রায় সংসারের কার্য্য করিতে হয় না, শেঠ নিজেই সব করে। গৃহিণী কেবল সর্ব্বদা দুই চারিখানি স্বর্ণালঙ্কার ও রঙ্গিল সূক্ষ্ম বসন ও আঙরাখায় দেহ আবৃত্ত করিয়া বারান্দায় বেড়াইয়া বেড়ায়। আমি এক বার মনে করিলাম 'শেঠ-গৃহিণীকেই না হয় উনানটা ধরাইয়া দিতে বলি কিন্তু তাহার যেরূপ সৌখিন চাল্ চলন, তাহাতে বলিতে সাহস হইল না। নিজেই উনানে কাঠ ও আগুন দিলাম। মুহূর্ত্ত-মধ্যে ধূমে ক্ষুদ্র রন্ধনগৃহটী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমি সেই ধূমরাশির মধ্যে বসিয়া দৃঢ় অধ্যবসায়ের সহিত পাখা লইয়া বাতাস করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ক্রমে প্রবল ধূমপ্রবাহ গৃহ মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া চতুর্দ্দিক্ পরিব্যাপ্ত করিল। শেঠ-গৃহিণী এক বার উঁকি দিয়া গিয়াই হাঁসিতে হাঁসিতে গলিয়া পড়িতে লাগিল। শেঠও নীরব নহে, সেও গৃহিণীর অনুরোধে হাঁসিতে লাগিল। আমি তাহাদের ঐরূপ অকারণ হাস্য দেখিয়া নিতান্ত বিরক্ত হইলাম, গ্রীষ্মকালের-মধ্যাহ্নে পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ এবং গলদ্‌ঘর্ম্ম-কলেবর হইয়া প্রাণপণে বাতাস করিতেছি, ইহাতে হাঁসির কি আছে? বস্তুতঃ শেঠের গৃহিণীই হাস্য রসের একটী ফোয়ারা, উহা তাহারই প্রত্যক্ষ বিকাশ। যাহা হউক আমি সেই নিবিড় ধূমরাশির মধ্যে বসিতে না পারিয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিবার জন্য বাহিরে আসিলাম। উহারা তখন একটু নীরব হইল। শেঠের মনে

কি যেন হইল, সে তাহার গৃহিণীকে অতি সংক্ষিপ্তভাবায় উনান ধরাইতে অনুরোধ করিল। সে একগাল হাঁসিয়া গজেন্দ্রগমনে যাইতে না যাইতেই উনান দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিল। ইহাতে তাহাদের হাঁসির মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। শেঠানী বলিল "দেখিলে মহারাজ! তুমি এত ডাকিলে আগুন আসিল না, কতকগুলা ধোঁয়া পাঠাইয়াছিল, আমি যেতে না যেতেই নিজে আসিয়া হাজির হইল।" চতুষ্পাঠীর ছাত্রদের মধ্যেও অনেক রসিক আছেন, দৌর্ভাগ্যক্রমে আমি ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আমি নিতান্ত অলঙ্কার-হীন ভাষায় বলিলাম "আগুন কি শুধু বাইজীর খাতিরেই আসিয়াছে? আমা-কেও অনেক ক্ষণ বাতাস করিতে হইয়াছিল।" বাইজী কিন্তু সে কথা হাঁসিয়া উড়াইয়া দিল। তাহার পর, আমি রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলাম। অল্প সময়ের মধ্যে আলু এবং মুগের ডাউল সিদ্ধ আতপান্ন পাক করিয়া গব্যঘৃত, লেবুর চাট্নী ও দুগ্ধের দ্বারা ভোজন শেষ করিলাম। আহারান্তে শেঠের দোকানের পার্শ্বে সেই বিস্তৃত বারান্দায় নূতন মাদুরে শয়ন করিয়া নিদ্রাগত হইলেই পাণ্ডার প্রেরিত একটি বালক আসিয়া আমাকে ডাকিয়া তুলিল। শেঠ সেই বালককে দেখিয়া অত্যন্ত চটিয়া বলিল "এত রৌদ্রে কোথায় যাবি? এখনও আড়াইটা বাজে নাই, রাস্তা রোদে আগুন হইয়া আছে।" বালকটী খাণ্ডেবালা-ব্রাহ্মণ, বড় গরিব। পাণ্ডাদের ফরমাইস্ মত কাজ করিয়া যাত্রীদের নিকট কিছু কিছু পাইয়া থাকে। সে ফিরিয়া গেল না, ঐ খানেই বসিয়া রহিল। আমি চখে মুখে জল দিয়া বসিলেই উপর হইতে রাণীজীর পণ্ডিত আগমন করিলেন। তাঁহার সহিত অনেক ক্ষণ সংস্কৃত-ভাষায়

বঙ্গদেশ ও হিন্দুস্থান সম্বন্ধে কথোপকথন হইল। তিনি চলিয়া গেলে আমি কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলাম "শেঠজী! তোমার সন্তানাদি হয় নাই?" সে বলিল "ভগবান্ আমার সন্তান দেন নাই, তা, না দিউন, আমি তাহাতে দুঃখিত নহি"। শেঠ-গৃহিণী দোকানের পাশেই পা মেলিয়া বসিয়া ডাউল বাছিতেছিল, সে তখন সুযোগ পাইয়া নিজের জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইল। অতিসুন্দর মালবী হিন্দীতে সে বেশ গুছাইয়া নিজের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা করিল। তাহার গল্পের মর্ম্ম এই;—

বাইজী এই উজ্জয়িনীরই কোন ধনী বণিকের কন্যা। বাল্যকালে মহামারীতে তাহার পিতামাতার মৃত্যু হয় সুতরাং মাতুল আপন গৃহে লইয়া গিয়া উহাকে প্রতিপালন করে। ঐ কুমারীর সৌন্দর্য্যের সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় অনেক ধনীর ছেলে উহাকে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু মাতুল তাহা করিতে দেয় নাই, দশ বৎসর বয়সের সময় গোপনে অনেক টাকা লইয়া এই বিপত্নীক শেঠের হস্তে প্রদান করে। যাহা হউক, তাহাতে সে নিজেকে অসুখী মনে করে না, কেন না শেঠ তাহাকে যেরূপ যত্ন করে, অন্যের হাতে পড়িলে সে ঐরূপ যত্ন ও আদর পাইত কি না সন্দেহ। শেঠের আরও ভ্রাতা আছে, বিবাহের পরই তাহাদের নিকট হইতে পৃথক্ হইয়া এখানে বাড়ী করিয়াছে। ছোটকালে শেঠ নিজেই তাহাকে স্নান করাইয়া দিত এবং চুল বাঁধিয়া দিত। যখন শেঠানীর বয়স ত্রয়োদশ বৎসর, তখন সে এক দিন এই বাটীর দোতলায় বারান্দার কাঠের রেলিংএর উপর ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া বিবাহের বর দেখিতেছিল। হঠাৎ রেলিং ভাঙ্গিয়া পাথরের রাস্তায়

পড়িয়া গিয়া অচৈতন্য হয়। শেঠ বহু অর্থব্যয় করিয়া শেঠানীর চিকিৎসা করিয়া সুস্থ করিয়াছিল। এখনও সে মধ্যে মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের কোন কোন স্থানে কখনও কখনও বেদনা অনুভব করে।

এই গল্প আমিও খাণ্ডেবালা-ব্রাহ্মণ-বালক যেরূপ আগ্রহের সহিত শুনিতেছিলাম। শেঠের আগ্রহ তদপেক্ষা সহস্র গুণেরও অধিক বোধ হইল। শেঠের নিকট এ গল্প নূতন নহে, সে ত এ বীণাঝঙ্কার প্রতিমুহূর্ত্তেই শুনিতেছে। তথাপি গল্পের প্রত্যেক বর্ণ যেন তাহার হৃদয়কে সুধাসিক্ত করিতে লাগিল। এত দীর্ঘ-কালের পরিচয়েও তাহার তৃষ্ণার কিছুমাত্র প্রশম হয় নাই। শাস্ত্রকারেরা যে বলিয়াছেন "বৃদ্ধের যুবতী ভার্য্যা প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়*।" উহার একটী জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া প্রীত হইলাম। সর্ব্বদা বিজনে একত্র অবস্থান করায় শেঠদম্পতীর লজ্জা সঙ্কোচ এক প্রকার শিথিল হইয়া গিয়াছে। শেঠ প্রায় সর্ব্বদাই শেঠানীর চিবুক ধরিয়া আদর করে। লোকের সাক্ষাতে হইলে বাইজী একটু কৃত্রিম কোপ প্রদর্শনপূর্ব্বক শেঠের সেই সুদীর্ঘ টিকীটী ধরিয়া সবলে আকর্ষণ করে। শেঠ এই সামান্য অনুগ্রহকেও অপার করুণা ভাবিয়া আদরে নুইয়া পড়ে।

ভর্ত্তৃগুহা। অপরাহ্ন তিনটার সময় খাণ্ডেবালা-ব্রাহ্মণ-বাল-কের সহিত বহির্গত হইলাম। যদিও অবন্তীরই নামান্তর উজ্জয়িনী, তথাপি স্থানীয় লোকে মহাকালের মন্দির যে অংশে,

---

* ধনাশা জীবিতাশা চ গুর্ব্বী প্রাণভৃতাং সদা।
বৃদ্ধস্য যুবতী ভার্য্যা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী॥

ঐ অংশকে উজ্জয়িনী ও উহার বিপরীত অংশকে অবন্তী নামে অভিহিত করিয়া থাকে। আমরা ঠিক শিপ্রাপুলিন অবলম্বন করিয়া অবন্তী অভিমুখে চলিলাম। অনেক ক্ষণ ভ্রমণের পর মহর্ষি সান্দীপনির আশ্রমে উপনীত হইলাম। উহার নিকটে অঙ্কপাত নামক একটী তীর্থ স্থান আছে। কথিত আছে, কৃষ্ণ বলরাম প্রথমে এই স্থানে অঙ্কপাত লিখিতে আরম্ভ করেন *। তজ্জন্য ঐ স্থান অঙ্কপাত-তীর্থ নামে অভিহিত। ঐ স্থানে বিষ্ণুর বিশ্বরূপ মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। হোলকার-রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মলহররাও কর্ত্তৃক অঙ্কপাতের বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। অহল্যাবাইর নির্দ্দিষ্ট বৃত্তিতে ঐ স্থানে প্রত্যহ দশজন ব্রাহ্মণ-ভোজন হইয়া থাকে। উহার অনতিদূরে দামোদরকুণ্ড, গোমতী-কুণ্ড, বিষ্ণুসাগর-প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ কয়েকটী কুণ্ড আছে। ঐ স্থানে প্রদক্ষিণ ও প্রণামাদি শেষ করিয়া ভর্ত্তৃগুহা অভিমুখে চলিলাম। অনেক দূর গিয়া তীর ছাড়িয়া উপরে উঠিলাম। কিছু দূর গিয়া তীরের উপরিভাগে দুইটী মন্দির দেখা গেল। ঐ মন্দিরের অভ্যন্তরে ভর্ত্তৃগুহা বিরাজিত। উহার নিকটে কোন লোকালয় নাই, স্থানটী সম্পূর্ণ নির্জ্জন। মন্দিরের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া সঙ্গী বালক "সাধু বাবাজী বলিয়া ডাকিল"। পর ক্ষণে কেশশ্মশ্রুসমাবৃতমুখ খর্ব্বাকৃতি এক সাধু আসিয়া আমাদের বসিতে অনুরোধ করিলেন। সঙ্গী, আমার গুহা দর্শনের বাঞ্ছা সাধুকে বিজ্ঞাপিত করিলে,

---

* ততঃ সান্দীপনিং কাশ্যমবন্তীপুরবাসিনম্
অস্ত্রার্থং জগ্মতুর্বীরৌ বলরামজনার্দনৌ ॥
(বিষ্ণুপুরাণম্)

তিনি একটী প্রদীপ জ্বালিয়া দক্ষিণ দ্বারী মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আমাকে অনুগমন করিতে আদেশ করিলেন। আমি বালককে সঙ্গে লইতে চাহিলে সাধু বলিলেন "ঐ বালক অনেক বার গুহা দেখিয়াছে, ও কিজন্য যাইবে?" আমি একাকী যাইতে অস্বীকার করিলে অগত্যা তিনি বালককে সঙ্গে লইতে সম্মত হইলেন। তাহার পর, তিনি দীপ হস্তে মন্দির-মধ্যস্থ সুরঙ্গে প্রবেশ করিলে আমরাও তাঁহার সহিত প্রস্তরময় সিঁড়ী দিয়া নিম্নে অবতরণ করিতে লাগিলাম। সাধু একতলার পাষাণ-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহগুলিতে যে কয়টী মূর্ত্তি ছিল, উহা দেখাইয়া দোতলায় নামিলেন, সেখানে ও মূর্ত্তির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। এদিকে ভূগর্ভে বায়ু-সঞ্চার রহিত স্থানে আমাদের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। বিশেষ সামান্য দীপের আলোক মাত্র সম্বল, সাধুর পদস্খলন হইলে অথবা অন্যবিধ কারণে দীপ নির্ব্বাণ হইলে, সেই ঘোর অন্ধকারে পথ চিনিয়া উপরে উঠিবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং মনে বড় শঙ্কা উপস্থিত হইল কিন্তু সাধু কর্ত্তব্য কর্ম্মে অটল। তিনি এক একটী মন্দির ও দেবতা প্রদর্শন করিয়াই এখানে দুই পয়সা চড়াও, ঐ খানে চারি পয়সা চড়াও ইত্যাদি দাবী করিতে আরম্ভ করিলেন কিন্তু আমি তাঁহার আদেশ সত্বর পালন করিতে সমর্থ হইলাম না। আমার টাকা পয়সা থলির মধ্যে কোমরে দৃঢ় বদ্ধ ছিল, ইচ্ছা করিলেও তাড়াতাড়ী উহা বাহির করিবার উপায় ছিল না। সুতরাং আমি বলিলাম "পয়সার জন্য কোন গোল হইবে না, আমি উপরে গিয়া সমুদয় গণিয়া দিব।" সাধু নিতান্ত নিরাশভাবে বলিলেন "সে তোমার মরজি"। তাহার পর, তিনি তেতলায় অবতরণ করিতে আরম্ভ

করিলে আমার প্রাণ শুকাইয়া গেল। আমি বলিলাম "যাহা দেখিয়াছি, এই যথেষ্ট, এখন উপরে চলুন।" সাধু কিন্তু কোন মতেই ছাড়িলেন না। তিনি ভাবিলেন "যে কয়টা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার পয়সা দিবে না, সুতরাং একপ্রকার জেদ্ করিয়া তেতলায় লইয়া গেলেন। ঐরূপ স্থানে সাধুর সহিত বিসম্বাদ করা অবিধেয় মনে করিয়া অনিচ্ছাসত্বেও চলিলাম। সেখানে কয়টী মন্দিরে তাড়াতাড়ী মূর্ত্তিগুলি প্রত্যক্ষ করিয়া বলিলাম "শীঘ্র উপরে চলুন, আমার শ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতেছে"। সাধু তখন ক্রমে ক্রমে ঘুরিয়া পূর্ব্বপথে আমাদিগকে লইয়া উপরে আসিলেন। যখন উপরে উঠিলাম তখন নিতান্ত নির্জীব-অবস্থাপন্ন, মন্দিরের বারান্দায় বসিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া একটু সুস্থ হইলাম। ঐ ভূগর্ভস্থ অট্টালিকার বিভিন্ন গৃহসমূহে যে সকল মূর্ত্তি বিরাজমান, উহার অধিকাংশই ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্ত্তি। একটী মন্দিরে গুরু গোরক্ষনাথ ও নীচে তাঁহার শিষ্য ভর্তৃহরির মূর্ত্তি আছে, উহার পার্শ্বে তাঁহার মহিষী পিঙ্গলা। কিন্তু সাধু, গোরক্ষনাথ ভর্তৃহরি ও রাজ্ঞী পিঙ্গলার মূর্ত্তি ব্যতীত অন্যান্য বৌদ্ধ-মূর্ত্তিগুলিকে দত্তাত্রেয় প্রভৃতি নানা নামে পরিচিত করিলেন।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভর্তৃহরি প্রথম উজ্জয়িনীর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন*। তিনি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ছিলেন। বাক্যপ্রদীপ নামক পদ্যময় বৈয়াকরণিক গ্রন্থ তাঁহারই রচিত। আর

* অস্তি সমস্তবস্তুবিস্মিতদেবা গুণপরাভূতপুরন্দরনিবাসা উজ্জয়িনী নাম নগরী। তত্র সামন্তসীমন্তসিন্দুরারুণিতচরণকমলযুগলো ভর্তৃহরির্নাম রাজাভূৎ (দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা।)

নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক ও বৈরাগ্যশতক নামক তিনখানি কাব্য গ্রন্থ বিদ্যমান আছে, উহাও ভর্তৃহরির রচিত বলিয়া বিখ্যাত। সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি ঐ গ্রন্থ-চতুষ্টয়ের প্রণেতা। ভর্তৃহরির বিষয়ে নিম্নলিখিত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। "মহারাজ ভর্তৃহরি তরুণ বয়সে অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। তাঁহার মহিষীরও রূপ লাবণ্য ও রসিকতার ইয়ত্তা ছিল না। একদিন কোন সন্ন্যাসী একটী ফল লইয়া রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন "মহারাজ! আমি বহু তপস্যা করিয়া এই ফলটী পাইয়াছি। যে ইহা ভক্ষণ করিবে, সেই অমরতা লাভ করিবে। মহারাজ অনন্তকাল বাঁচিয়া থাকিলে জগতের অশেষ উপকার হইবে। আমি আপনাকে বড়ই ভালবাসি, তজ্জন্য আপনাকে ইহা অর্পণ করিতেছি। মহারাজ এই ফলটী গ্রহণ করিলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব। ভর্তৃহরি অত্যন্ত আহ্লাদিত-চিত্তে কৃতজ্ঞতা প্রকাশপূর্ব্বক সন্ন্যাসীকে বিদায় দিলেন এবং তাঁহার আদরের মহিষীকে সন্ন্যাসি-প্রদত্ত ফলটী অর্পণ করিলেন। মহিষীর মহারাজ ব্যতীত আর একটী প্রিয়পাত্র ছিল, তিনি উহা তাহাকেই প্রদান করিলেন। সে ব্যক্তির আবার রাজ-মহিষী ভিন্ন আর একটী প্রণয়িনী ছিল, সে সুযোগ পাইয়া তাহারই পরিতোষ উৎপাদনের চেষ্টায় তাহার করে উহা ন্যস্ত করিল। সে রমণীটি আবার রাজার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগিণী সুতরাং সে ঐ ফলটী সাদরে তাহার প্রণয়ভাজনের হস্তে উৎসর্গ করিল। ক্রমে ঘুরিয়া ফলটী মহারাজের হস্তে পুনরায় উপস্থিত হওয়ায় তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং ক্রমে অনুসন্ধান দ্বারা সমুদায় অবগত হইয়া বলিলেন—"আমি সতত যাহার চিন্তায় কালাতিপাত করি, সে আমার প্রতি বিরক্ত এবং অপর প্রণয়ভাজনকে ইচ্ছা করে।

সে ব্যক্তি আবার অন্যের প্রতি আসক্ত। তাহার প্রণয়ভাগিনী আবার আমার প্রতি অনুরাগিণী। অতএব মহিষীকে, তাঁহার প্রণয়ীকে, মদীয় প্রণয়ভাগিনীকে, আমাকে এবং সকল অনর্থের মূল সেই মদনকেও ধিক্ *।

তাহার পর, রাজা সংসারের অসারতা বুঝিতে পারিয়া বিক্রমাদিত্যকে সিংহাসন প্রদানপূর্ব্বক যোগ আশ্রয় করিলেন। মহিষী পিঙ্গলাও সংসার-বিরক্ত রাজার অনুগামিনী হইলেন। ঐ ভর্ত্তৃগুহাই সেই যোগী রাজার সমাধির স্থান ছিল, তজ্জন্য পরবর্ত্তী নৃপগণ ঐ স্থানে তাঁহার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। ভর্ত্তৃগুহা কত কাল হইল নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা বলা যায় না, তবে ঐ ভূগর্ভস্থ অট্টালিকা যে অতিপুরাকালের সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। তাহার পর, সাধুর নিকট হইতে সুশীতল জল লইয়া পান করিলাম এবং তাঁহার প্রার্থনানুরূপ পয়সা কয়টী গণিয়া দিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলাম।

নদীতীর দিয়া কিছু দূর আগমন করিলেই বামভাগে একটী পর্ব্বতমালার সন্নিহিত প্রান্তর-মধ্যে পাষাণ-নির্ম্মিত একটী বৃহৎ মন্দির দৃষ্টিগোচর হইল। প্রদর্শক বালক বলিল "মহারাজ বিক্রমাদিত্য ঐ মন্দিরে বীরাচার-মতে শক্তি সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন"। উহা দেখিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল, সুতরাং বালককে সঙ্গে লইয়া অনেক পথ অতিক্রম পূর্ব্বক মন্দিরের

---

* যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা,
সাপ্যন্যমিচ্ছতি জনং স জনোঽন্যসক্তঃ।
অস্মৎকৃতেঽপি পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা,
ধিক্ তাঞ্চ তঞ্চ মদনঞ্চ ইমাঞ্চ মাঞ্চ॥

প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম। প্রান্তর-মধ্যস্থ স্থানটী অতিবিজন, অদূরে শৈলশ্রেণী বিরাজিত। মন্দিরটী দেখিয়া অত্যন্ত পুরাকালের নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হইল। মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ ভিত্তিগাত্রে ভয়ঙ্করী কালিকামূর্ত্তি অঙ্কিত আছেন। এই ভীষণ প্রান্তরস্থ মন্দিরে পূজারি কেহ বাস করে না। নিত্যপূজকেরা এখানে আসিয়া প্রত্যহ পূজা করিয়া যায়। আমরা দেবীকে প্রণিপাত করিয়া বাসা অভিমুখে ছুটিলাম। উজ্জয়িনীর এই অংশটী অত্যন্ত নির্জ্জন। পথের উভয় পার্শ্বে বহুসংখ্যক মনুষ্যকঙ্কাল ও নরমুণ্ড পতিত আছে। পুনরায় নদীতীরে উপনীত হইয়া আর একটী পথ অবলম্বন করিয়া চলিলাম। উজ্জয়িনী-নগর ভারতের পূর্ব্ব গৌরবের মূর্ত্তিমান্ সাক্ষী। এখানে যে কত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের উত্থান পতন ঘটিয়াছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? প্রথম হিন্দুধর্ম্ম তাহার পর, বৌদ্ধধর্ম্ম, পুনরায় জৈনধর্ম্ম ও হিন্দুধর্ম্ম, আবার মুসলমান-ধর্ম্ম আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পদচিহ্ন রাখিয়া কেহ বা অন্তর্হিত, কেহ কেহ বা ক্ষীণভাবে আলোক প্রদান করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। পথের উভয় পার্শ্বে ভগ্ন, অর্দ্ধভগ্ন, অভগ্ন, কতই যে দেবমূর্ত্তি দেখিলাম তাহার সংখ্যা নাই। কোন কোন স্থানে ভগ্ন বিচূর্ণ দেবমূর্ত্তির দ্বারা রাজপথ প্রস্তুত করা হইয়াছে। উজ্জয়িনীর যে-দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, কেবল পূর্ব্ব নৃপতিগণের প্রাসাদ অট্টালিকা প্রাচীরও দেবমূর্ত্তি-সমূহের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মের দিবা শেষ হইয়াও হয় না, আমরা এত ভ্রমণ করিলাম এখনও সূর্য্য অস্তগত হন নাই। চলিতে চলিতে অদূরে সিপ্রাতীরে শ্মশানভূমি দৃষ্টিগোচর হইল। মধ্যে মধ্যে শৃগাল আমাদের সম্মুখভাগ দিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি

করিয়া বেড়াইতে লাগিল। পথের পার্শ্বে দেবমূর্ত্তির রাশির উপরে মনসাবৃক্ষ মস্তক উত্তোলনপূর্ব্বক কণ্টকিত শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। তাহার মধ্য হইতে সর্পসকল সান্ধ্য বায়ু সেবনের নিমিত্ত শর্ শর্ শব্দে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। আমরা আলোক থাকিতে থাকিতে অতিক্রতপদে ঠিক সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

মহাকালের আরতি। বাসায় আসিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন-পূর্ব্বক কেবল সন্ধ্যা করিতে বসিয়াছি, এমন সময় শেঠ-গৃহিণী নানাবিধ স্বুবর্ণালঙ্কার ও গোলাপীরঙের কোঁচান শাড়ী পরিয়া অন্যান্য পুররমণীগণের সহিত সিপ্রাতীর্থে দীপ দান করিয়া গৃহে ফিরিল। এখানকার পুরমহিলাদের একটী বিশেষ নিয়ম এই যে, তাহারা প্রত্যহ বৈকালিক স্নানের পর স্বুন্দররূপে বিভূষিত হইয়া সিপ্রাতীরে দীপ দান ও মধুর স্বরে স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকে। উহারা সিপ্রার প্রতি অত্যন্ত ভক্তিমতী এবং উহার বিনিময়ে সিপ্রাও বিমল সলিল ও স্বাস্থ্যকর বায়ু বিতরণ করিয়া ঐ সকল নগরবাসিনীর দেহ মন প্রফুল্ল রাখিয়াছেন। বাইজী আসিয়াই আমাকে বলিল "পণ্ডিতজী! এখনও যে বসিয়া আছ, আরতি দেখিতে যাইবে না?" আমি বলিলাম "সারাদিন ঘুরিয়া বড়ই ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়াছি, আর ঘুরিতে পারি না"। বাইজী পুনরায় বলিল "মহারাজ! উজ্জয়িনীতে আসিয়া যদি মহাকালের আরতি না দেখিবে, তবে দেখিবে কি?" আমার তখন সেই মহাকবির অনুরোধ-বাক্য স্মৃতিপথে উপস্থিত হইল। কালিদাস

তাঁহার প্রিয়তমার উদ্দেশে সন্দেশবাহক সেই নূতন বন্ধু মেঘকে বলিয়াছিলেন :—

"না হতে প্রদোষ কাল আগে ভাগে মহাকাল
যাও যদি শুন জলধর।
করো তথা অবস্থান যদবধি নাহি যান,
অস্তাচল দিবস-ঈশ্বর।
আরতি সময়ে তাঁর গরজিয়া বারংবার,
লও যদি পটহের ভার।
মধুর গভীর রব প্রাকৃত যে আছে তব,
সফলতা হবে জেনো তার" * ॥৩৪॥

আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না। সন্ধ্যা শেষ করিয়া সেই অবসন্নদেহে মহাকালের উদ্দেশে চলিলাম। ঐ দিবস সোমবার মহাকালের আরতির ঘটা অধিক হইবে সুতরাং নানা বেশভূষায় সুসজ্জিত বহু নর নারী মহাকালের মন্দিরে যাইতেছে। কিছু দূর গিয়াই শরীরের অবসন্নতার কথা ভুলিয়া গেলাম। অনন্তর সেই আরাত্রিকদর্শনার্থী জনস্রোতের সহিত মহা-উৎসাহে মন্দিরে উপনীত হইলাম। আমরা যখন উপস্থিত হইলাম, তখনও আরতি আরম্ভ হয় নাই। দর্শনার্থিগণ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কিছুক্ষণ পরে সকল বাদ্যধ্বনি [illegible] দেখিতে দেখিতে কতকগুলি তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ মহাকালের পঞ্চমুখী মুকুট লইয়া

---

* অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকালমাসাদ্য কালে,
স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ।
কুর্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া
আমন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জিতানাম্ ।৩৪।

মহাসমারোহে কুণ্ডাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রপাঠ ও জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। দুই পার্শ্ব হইতে পাণ্ডাগণ ময়ূরপুচ্ছের চামর বীজন করিতে করিতে অনুসরণ করিতে লাগিল। মুকুট জলাশয়তীরে আনীত হইলে পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক মুকুটকে স্নান করাইলেন। ঐ সময় ভক্ত নরনারীগণের প্রাণের ব্যাকুলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। যিনি যতই কঠোর-হৃদয় হউন না কেন? এ সময় মহাকালের মন্দিরে আগমন করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইবে। ব্যাকুল ভক্তগণের বম্ বম্ রব ও স্তোত্রপাঠের মধুর ধ্বনিতে মন প্রাণ পরিতৃপ্ত হইল। আমিও মনে মনে স্তব পাঠ করিতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল পরে মুকুট লইয়া পুরোহিতগণ ঐরূপ সমারোহের সহিত পুনরায় সেই অনতিপ্রশস্ত সুরঙ্গপথে মহাকালের গুপ্ত মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। এই সময় অত্যন্ত জনতা, আমরা একটু অপেক্ষা করিয়াই মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। একযোগে অধিক লোকের প্রবেশ করিতে দেওয়া হয় না। যাহা হউক পর্য্যায়ক্রমে অধিকাংশ লোকেরই সন্দর্শন হয়। আরতি-কালে মহাকালের অঙ্গবেশ। ঐ সময় মহাকালের মস্তকে পূর্ব্বোক্ত মুকুট পরাইয়া দেওয়া হয় এবং তখন আর তাঁহার দিগম্বরত্ব থাকে না, দেবাদিদেব উত্তম কৌষেয় বসন পরিধানপূর্ব্বক নানাবিধ মণিমাণিক্যে বিভূষিত হইয়া মনোহর শোভা ধারণ করেন। পূর্ব্বোক্ত পুরোহিত প্রথম পঞ্চপ্রদীপ দ্বারা আরতি করিলেন। তাহার পর, যথাক্রমে বারিপূর্ণ শঙ্খ, ধৌত বসন, বিল্বপত্র ও প্রণিপাত দ্বারা নীরাজন কার্য্য সমাপ্ত করিয়া মন্দির হইতে বহির্গত হইলেন। মহাকালের মন্দিরের প্রদীপগুলির বর্ত্তিকা, ঘৃত কর্পূর ও অগুরু চন্দন দ্বারা

রচিত সুতরাং ঐ সকল দীপের এবং ধূপ ধুনার গন্ধে গৃহটী সর্ব্বক্ষণ আমোদিত থাকে। মহাকালকে প্রণিপাত পূর্ব্বক উপরে আসিয়া দেখি লোকে লোকারণ্য। এখানকার আরতির দৃশ্য বড়ই মনোহর। প্রতি সোমবারে বৈদেশিক তীর্থযাত্রী ও নগরবাসী অসংখ্য নরনারী আরতি দেখিতে আসিয়া থাকেন। মানুষের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির ন্যায় উৎকৃষ্ট বৃত্তি আর নাই, তীর্থক্ষেত্রে ও দেব-মন্দিরেই উহার প্রত্যক্ষ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। বহুলোকের সহিত মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে বহির্গত হইলাম। কিয়দ্দূর আসিয়াই সঙ্গিগণ ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিয়া গেল, পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি আমি একাকী। তখন রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকা, মনে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল, ধীরে ধীরে চলিলাম। একটু পরেই পশ্চাতে মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি শ্রুত হইল, দেখিতে দেখিতে একদল নরনারী আমার সহিত আসিয়া মিলিত হইল। আমি নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাদের সহিত চলিলাম। সৌভাগ্য-ক্রমে আমি যে পাড়ায় বাসা লইয়াছি, তাহারা সেই পাড়ারই লোক। আসিতে আসিতে বিরল-বসতি বহু রাজপথের পার্শ্বে ভগ্ন দেবালয় ও অট্টালিকার চিহ্ন সকল দেখিয়া মনে হইতে লাগিল—এই সকল রাজপথ একসময় এই রূপ রজনী-কালে কত কান্তার্থিনী প্রমদাগণের নূপুরধ্বনিতে মুখরিত হইত, এখন ইহা সম্পূর্ণ নীরব। কালিদাস উজ্জয়িনীর বর্ণনা করিতে করিতে মেঘকে লক্ষ্য করিয়া কান্তাভিসারী যক্ষের মুখ দিয়া বলিয়াছিলেন ;—

"রাজপথ নিশাকালে ঘোর আঁধার জালে
অবরুদ্ধ, না চলে নয়ন।

রমণী প্রেমের ভরে একা অভিসার করে,
ভয়ে ভয়ে প্রিয়ের ভবন।
কষিত কাঞ্চন ছটা প্রকাশি বিজুলী ঘটা
দেখাইতে তাহাদের পথ।
গরজি বরষি ধারা, করোনা হে দিশে হারা,
সহজেই ভয়ে তারা হত” *।

তাহার পর, রাত্রি নয় ঘটিকার সময় বাসায় আসিয়া খরমুজা কলাকন্ (সন্দেশ) উৎকৃষ্ট ঘন দুগ্ধ দ্বারা জলযোগ শেষ করিয়া উপরে আমার জন্য নির্দ্দিষ্ট গৃহে শয়ন করিলাম। রাণীজী চলিয়া গেলে আর ও দুই একটী তীর্থযাত্রী আসিয়াছিল, তাহারা ভিন্ন গৃহে আশ্রয় লইয়াছিল। অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইলেও সমস্ত দিনের শ্রান্তির পর বিমুক্ত বাতায়নপথে শীতল বায়ুর সঞ্চার হওয়ায় গাঢ় নিদ্রায় নিশাবসান হইল।

নগর-ভ্রমণ। ১১ই বৈশাখ মঙ্গলবার প্রত্যূষে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া সিপ্রাস্নানে গমন করিলাম। গ্রীষ্মের প্রাতঃকালে সিপ্রাস্নানে অত্যন্ত আরাম, ঐ সময় সিপ্রাতরঙ্গসংসর্গী প্রভাত-সমীরণ যেন স্নানার্থীদের গাত্রে সুধা বর্ষণ করে। এবং তখন সিপ্রার সলিলপ্রবাহ ঠিক কাচখণ্ডের ন্যায় বোধ হয়। স্নান সন্ধ্যা

* [illegible]বসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
[illegible] নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামন্যা কনকনিকষস্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্ব্বীং
তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মা স্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ।

(মেঘদূতম্)

শেষ করিয়া প্রথম সরস্বতীর মন্দিরে গমন করিলাম। ঐ মন্দিরটী অত্যন্ত প্রাচীন। কথিত আছে;—মহারাজ বিক্রমাদিত্য ঐ মন্দিরে সরস্বতী দেবীর আরাধনা করিতেন। সরস্বতীর পূজা ও প্রদক্ষিণ করিয়া যথাক্রমে দত্তাত্রেয়, চামুণ্ডা, মঙ্গলেশ্বর, পিশাচ-মোচনেশ্বর, সহস্রধনুকেশ্বর-প্রভৃতির অর্চনা শেষ করিলাম। তাহার পর, বাসায় আসিয়া পাণ্ডার সহিত নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। বাসা হইতে কয়েক রশি দূরে প্রস্তর-নির্ম্মিত একটী প্রকাণ্ড সিংহদ্বারের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। পাণ্ডা বলিল "ইহা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজভবনের সিংহদ্বার"। উক্ত দ্বারটী প্রাচীন হইলেও প্রথম বিক্রমাদিত্যের সময়ের কিছুতেই নহে, কারণ দ্বিসহস্র বর্ষ পূর্ব্বের সিংহদ্বার ঐরূপ অবস্থায় বিদ্যমান থাকা একরূপ অসম্ভব। তবে উহা যে কোন প্রাচীন রাজভবনের ভগ্নাবশেষ তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। লোকের পুরাতন বস্তুর উপর এতই শ্রদ্ধা যে, প্রত্যহ অসংখ্য নর নারী গন্ধ পুষ্প ও চন্দন দ্বারা ঐ সিংহ-দ্বারের পূজা করিয়া থাকে। পাণ্ডা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়াও আমি সিংহদ্বারের অর্চ্চনা করিতে পারিলাম না। কারণ সিংহদ্বারকে কোন্ দেবতা জ্ঞানে কি মন্ত্রে পূজা করিব? তবে সেই পুরাতন রাজভবনের প্রতি সবিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন-পূর্ব্বক সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। নগরের দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে যোগসিদ্ধ-নামক একটি পর্ব্বত আছে। পাণ্ডা বলিল উহারই নীচে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাযুক্ত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন প্রোথিত ছিল। যোগসিদ্ধ পর্ব্বতে আরোহণ করিলে উজ্জয়িনীর প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যায়"। বড়ই দুঃখের বিষয় সময়াভাবে উক্ত পর্ব্বতে গমন করিতে সমর্থ

হইলাম না। পূর্ব্বকালে উজ্জয়িনীতে নানা সম্প্রদায়ের বৌদ্ধযতি ও বৌদ্ধমঠ ছিল। এখন ঐ স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী লোক আছে কিনা সন্দেহ, তবে বৌদ্ধমঠের অধিকাংশই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। উজ্জয়িনীতে অনেক জৈন মন্দির ও জৈনধর্ম্মাবলম্বীর বাস আছে। তন্মধ্যে কয়েকটি প্রাচীন জৈন মন্দির এক্ষণে হিন্দু-সম্প্রদায়ের অধিকারে আসিয়াছে। ঐ সকল মন্দিরের মধ্যে জবরেশ্বরের ও জৈনতন্ত্রীশ্বরের মন্দিরই প্রধান। উজ্জয়িনীর আর একটী দৃশ্য সতীস্তম্ভ। প্রত্যেক বৃক্ষের মূলে সহমৃত পতিপত্নীর যুগলমূর্ত্তি বিরাজমান। ব্রাহ্মণজাতীয় সতীস্তম্ভের একাংশে গো, ও ক্ষত্রিয় জাতীয় সতীস্তম্ভের পার্শ্বে অশ্বমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখা যায়। ধর্ম্মপরায়ণা পুরকামিনীগণ সতীস্তম্ভের বড়ই আদর করেন। তাঁহারা স্নানের পর দেবালয়ে পূজা শেষ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন কালে গন্ধপুষ্প দ্বারা সতীস্তম্ভের অর্চ্চনা করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান-রাজবাটী। মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও তাঁহার পরবর্ত্তী উজ্জয়িনীর অধীশ্বরগণের পর ভোজবংশীয় নৃপগণ কিছুকাল ঐ নগরীর শাসনকার্য্য সম্পন্ন করেন। তদনন্তর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি রাজা ঐ রাজধানীর শাসনভার প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইলে ঐ-নগরী মুসলমানের হস্তগত হয়। ১৩০৩ খ্রীঃ হইতে কিছুকাল খিলিজিবংশীয় আল্লাবদীন, তদনন্তর ১৫৪০ খ্রীঃ হইতে কিছুকাল শূরবংশীয় সম্রাট্ অকবর ও তদীয় পুত্র পৌত্র প্রপৌত্র উজ্জয়িনীর অধিকার লাভ করেন। ঐ সকল সম্রাট্ স্বয়ং উজ্জয়িনীতে বাস করিতেন না, ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তার দ্বারা ঐ প্রদেশের রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। ঐ সময়ের বিভিন্নরুচি ও অদূরদর্শী শাসকগণের অবিমৃশ্যকারিতায় উজ্জয়িনীর অবশিষ্ট শোভা

সমৃদ্ধি বিনষ্ট হয়। ১৭২১ খ্রীঃ মহারাষ্ট্র-নরপতি বাজীরাও পেশওয়া মালবপ্রদেশও উহার রাজধানী উজ্জয়িনী অধিকার করেন। ১৭৭৩ খ্রীঃ হইতে ইন্দোরের হোলকার্ও গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া এই উভয় নৃপতির হস্তে উজ্জয়িনীর প্রভুত্ব পতিত হয়। কিছুকাল পরে একা সিন্ধিয়াই উজ্জয়িনী অধিকার করিয়া লয়েন। এখন আমাদের ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মিত্ররাজ সিন্ধিয়ার হস্তেই এই প্রাচীন নগরীর শাসনভার অর্পিত আছে। পাণ্ডার সহিত রাজবাটী দেখিতে চলিলাম। অতিপ্রকাণ্ড উন্নত প্রাসাদমালার উপরি ভাগে লোহিত বর্ণের পতাকা শোভা পাইতেছে। ঐ স্থানে মহারাজ সিন্ধিয়ার নিযুক্ত শাসনকর্ত্তা (ফৌজদার) অবস্থান করেন। তদ্ভিন্ন রাজকীয় বিচারালয়, পোলিশ-ষ্টেশন, সৈন্যাবাস, সংস্কৃত-পাঠশালা ও কলেজ্ আছে। আমি প্রথম রাজবাটী ও সৈন্যদের কাওয়াজ দেখিয়া সংস্কৃত-পাঠশালায় উপস্থিত হইলাম। ঐ পাঠশালায় অন্যূন বত্রিশটী বিদ্যার্থী, ব্যাকরণ কাব্য অলঙ্কার জ্যোতিষ সাংখ্য ও বেদান্ত-প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করে। অধ্যাপক চারিজন, তন্মধ্যে দুইজনের সহিত সাক্ষাৎ হইল। প্রথম জ্যোতিষের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত নারায়ণ জ্যোতিষীর সহিত কথোপকথন হইল। তিনি হিন্দীভাষায় আমার সহিত আলাপ করিলেন। তাঁহার নিকট আমি বরাহমিহির-সংক্রান্ত কয়েকটী প্রশ্ন করিলাম, তিনি যাহা বলিলেন আমার পুস্তিকায় উহা লিখিয়া লইলাম। তাহার পর, ব্যাকরণও কাব্যশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কাশীনারায়ণ শাস্ত্রীর সমীপবর্ত্তী হইলাম। উক্ত অধ্যাপকের সহিত অনেকক্ষণ ব্যাপিয়া সংস্কৃত-ভাষায় কথোপকথন হইল। তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে মহারাজ বিক্রমাদিত্যও বররুচি-সম্বন্ধ-

সংক্রান্ত অনেক কথা বলিলেন কিন্তু ঐ সকল উক্তি সম্পূর্ণ অসঙ্গতি-দোষ রহিত নহে। তাহার পর, উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের শিষ্টাচারে আপ্যায়িত হইয়া বিদায় গ্রহণের পূর্ব্বে ঐ স্থানে কলেজের একটী বুদ্ধিমান্ বিদ্যার্থীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। উক্ত ছাত্রটী আমার সহিত সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিতে করিতে আমার বাসা পর্য্যন্ত আসিলেন। তাঁহার মুখে উজ্জয়িনীর অনেক প্রাচীন কথা শুনিলাম। ঐ বিদ্যার্থী আমাকে মহাকবি কালিদাসের বাটী যে স্থানে ছিল, ঐ স্থান প্রদর্শন করিলেন কিন্তু উহা নিতান্ত কল্পনামূলক বলিয়া বোধ হইল। কারণ সেই অতিপুরাকালের বাটী কোথায় ছিল, এখন তাহা কি করিয়া লোক-স্মৃতিতে থাকিবে? বিশেষ ঐ স্থানে কোন বিশ্বাসজনক চিহ্নই বিদ্যমান নাই। তিনি বরাহমিহিরের বাটীর স্থান দেখাইতেও ত্রুটী করিলেন না। উহাও দেখিলাম সেখানেও কোন নিদর্শন নাই। তিনি [illegible]র একটী কৌতুকাবহ ঘটনার কথা বলিলেন। পূর্ব্বে নাকি সিদ্ধনাথের ঘাটের সন্নিহিত সরোবরে নাগকন্যাগণ ক্রীড়া করিতে আসিতেন। তাঁহাদের উপরিভাগ নারীমূর্ত্তি ও নিম্নভাগ মৎস্যের আকৃতি। এখন আর নাগকন্যাগণের সহিত কাহারও সাক্ষাৎ হয় না। একটী কথা কিন্তু বেশ সঙ্গত বোধ হইল। তিনি উজ্জয়িনীর দক্ষিণপশ্চিম কোণে দূরে একটী বৃহৎ প্রান্তর দেখাইয়া বলিলেন "ঐ প্রান্তর মধ্যে মৃচ্ছকটিক নাটকোক্ত "জীর্ণোদ্যান" ছিল। এখনও ঐ প্রান্তর মধ্যে তেঁতুল জাম আম বট প্রভৃতি অতিপ্রাচীন বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। ফিরিয়া আসিবার সময় ট্রেণ হইতে ঐ সকল গগনস্পর্শী বৃক্ষরাজি দেখা যাইতে লাগিল। ঐ বিদ্যার্থী উজ্জয়িনীকলেজের প্রশংসা করি-

লেন, এবং বলিলেন "ঐ কলেজে বি,এ. ক্লাস্ পর্য্যন্ত আছে এবং উহা বোম্বাই-বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। পণ্ডিত কাশীনারায়ণ আমাকে ঐ নগরীর বৃদ্ধ অধ্যাপক জানকীবল্লভ শাস্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহে গিয়া শুনিলাম, তিনি গৃহে উপস্থিত নাই। তাহার পর, প্রায় দশ ঘটিকার পূর্ব্বে বাসায় ফিরিলাম।

অধিবাসী। কলেজের ছাত্রটার মুখে শুনিলাম "উজ্জয়িনীর অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় তেত্রিশ হাজার। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ অন্যূন পঞ্চসহস্র"। ঐ সকল ব্রাহ্মণ বহুশ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে গুর্জ্জর-ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। ইহারা প্রায় শত বৎসর গত হইল গুর্জ্জর প্রদেশ ত্যাগ করিয়া মধ্যভারতবর্ষ ও দক্ষিণা-পথের নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। উহাদের অধিকাংশই কপিল, বশিষ্ঠ, শাণ্ডিল্য ও ভরদ্বাজ-গোত্রীয়। গুর্জ্জর-ব্রাহ্মণ-দের মধ্যে উদীচ্য, নাগর, শ্রীগৌড়, দ্বিশাবল, শ্রীমালী প্রভৃতি ৮৪টী থাক আছে। ঐ সকল বিভিন্ন থাকের লোকেরা পরস্পর আহার ব্যবহারও আদান প্রদান করে না। ইহাদের কেহ পৌরহিত্য, কেহ বা জমি ক্রয় করিয়া ঐ জমিতে প্রজা বন্দোবস্ত করে। অবশিষ্ট অধিকাংশই বাণিজ্য-ব্যবসায়ী, ভিক্ষুকও নিতান্ত অল্প নহে। গুজরাটী ব্রাহ্মণেরা 'নিরামিষাশী এবং বেশ কর্ম্মঠ ও চতুর। উহাদের উপাধি আচারী (আচার্য্য) ভট্, শাস্ত্রী, রাউল, ঠাকুর ও ব্যাস। গুজরাটী ব্রাহ্মণদের সন্তান জন্মিলে ষষ্ঠী ধাত্রী, মাতৃচ্ছেদ-কার্য্য করে। তরবারি, তীর, কাগজ, কলম ও চৌকী দিয়া ষষ্ঠীমাতার পূজা দেয়। অন্তরে ব্যবহারানুসারে দশদিন অশৌচ পালন করে বটে কিন্তু ব্রাহ্মণ নিজে

আত্মীয় কুটুম্ব ভোজন করাইতে হয় এবং ঐ দিন সন্ধ্যার সময় স্ত্রী-লোকেরা পুত্রের নামকরণ কার্য্য সম্পন্ন করে। চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত প্রসূতি বাটীর বাহির হইতে পারেনা। তাহার পর, একদিন দিব্য বেশ ভূষা করিয়া আত্মীয় স্ত্রীলোকদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিয়া আসে। ইহারা পাঁচ মাস হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে পুত্রের চূড়াকরণ করে এবং বার বৎসর হইতে পঁচিশ বৎসরের মধ্যে পুত্রের এবং আট বৎসর হইতে পনের বৎসরের মধ্যে কন্যার বিবাহ দেয়। বিবাহের পূর্ব্বে পাণ সুপারি দিয়া আত্মীয় কুটুম্বকে বিবাহ সম্বন্ধ জানাইয়া দেয়; উহার নাম "মাগনী"। গুজরাটী ব্রাহ্মণদের গর্ভাধান সংস্কার নাই। ইহাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ায় একটু নূতনত্ব আছে। শবদাহের তিন দিন পরে ভস্মের উপর দুগ্ধ দধি গোময় ও গোমূত্র ঢালিয়া দিয়া আসে। উহাদের উপাস্য দেব বালাজী, গণপতি, মহাদেব, মারুতি, তুলজাভবানী। এতদ্ভিন্ন উহারা অপদেবতা ও ডাকিনীকেও অত্যন্ত ভয় করে। হিন্দুধর্ম্মের রক্ষক বলিয়া শঙ্করাচার্য্যের প্রতি ইহারা সবিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। উজ্জয়িনীতে গুজরাটী ব্রাহ্মণ ব্যতীত ত্রৈলঙ্গী, দেশস্থ, কোঙ্কণস্থ, কান্যকুব্জ, মৈথিল, শাক-দ্বীপী প্রভৃতি বহু শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে। তদ্ভিন্ন সৈনিক-বিভাগে ও রাজকীয় কার্য্যে অনেক রাজপুত নিযুক্ত আছে। এখানে গুজরাটী বণিকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। উহারা আপনাদিগকে বৈশ্য বলিয়া পরিচিত করে। প্রায় দুই তিন শত বৎসর হইল উহারা গুর্জ্জর পরিত্যাগ করিয়া নানাস্থানে বসতি করিয়াছে। উজ্জয়িনীর বণিকেরা বাণিজ্য কার্য্য দ্বারা বিলক্ষণ সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাদের পুরুষেরা যেমন সুশ্রী স্ত্রীলো-

কেরাও তেমনি পরমাসুন্দরী। বণিকের মধ্যে যাহারা জৈন, উহারা "শ্রাবক" নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। ধর্ম্মবিশ্বাস ব্যতীত উহাদের পরস্পর অন্য কোনই পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে কায়স্থেরা মালব-কায়স্থ নামে পরিচিত। খাজা পত্র লেখা ও করসংগ্রহের কার্য্যে ইহারা সবিশেষ দক্ষ। নবশাকের মধ্যে তৈলিক কুম্ভকার, গোপ, মালাকার প্রভৃতি ও অন্যান্য নানাশ্রেণীর হিন্দু উজ্জয়িনীনগরে বাস করিয়া থাকে। এখানে মুসলমান ও অনেক আছে। উহাদের উপাসনালয় কয়েকটী মস্‌জিদ্ বিশেষ কারুকার্য্যসম্পন্ন। উহার কোন কোনটী মুসলমান্-সম্রাট্‌দিগের অধিকার-কালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উজ্জয়িনীর ভাষা গুজরাটীও মরাঠী। গুজরাটী-ব্রাহ্মণ, বেণিয়া, কায়স্থ প্রভৃতি জাতি গুজরাটী ভাষায় কথা বলে এবং স্ত্রীলোকেরা কাছা দেয় না, সুন্দর শাড়ী, আঙ্‌রাখা ও চাদর ব্যবহার করে। কিন্তু দেশস্থ কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণললনারা ও মরাঠী শূদ্ররমণীরা কাছা দেয় এবং অবগুণ্ঠন ব্যবহার করে না। উহাদের ভাষা অর্দ্ধ-মরাঠী। ত্রৈলঙ্গী ব্রাহ্মণদের ভাষা বুঝা যায় না, কারণ তেলেগু-ভাষা মধ্যভারতবর্ষে আসিয়া ও আপন স্বভাবসিদ্ধ দুরূহতা ত্যাগ করে নাই। উজ্জয়িনীতে আসিয়া বণিক্‌রমণীদের পরিচ্ছদ আমার নিকট বেশ সুন্দর ও রুচিসঙ্গত বোধ হইল। আমি শেঠ-গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "বাইজী" তুমি কাছা দেওনা কেন? বাইজী হাসিয়া উত্তর করিল "আমরা রাঁড়্‌ জী, আমরা কাছা দেইনা, পণ্ডিতায় কাছা দেয়"। উজ্জয়িনী-বাসিনীরা মহারাষ্ট্রীয়-ব্রাহ্মণ-রমণীদিগকে পণ্ডিতা বলে।

উজ্জয়িনী ত্যাগ। তাহার পর, রন্ধন ভোজন শেষ করিয়া,

শেঠকে প্রাপ্যের হিসাব দিতে বলিলাম। শেঠ আমার গমনোদ্যোগ দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইল। সে ভাবিয়াছিল "আমি অধিক দিন উজ্জয়িনীতে থাকিব।" শেঠ জিজ্ঞাসা করিল "পণ্ডিতজী! আবার কবে আসিবে"? আমি বলিলাম "তাহা বলিতে পারি না"। আমি যে সুদূর বঙ্গদেশের অধিবাসী, উহা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া বলিলেও সে বুঝিতে পারিল না। কারণ সহরের পণ্যজীবী কখনও বিদেশে যাইবার আবশ্যক হয় নাই, সুতরাং দেশান্তরের জ্ঞান তাহার একেবারেই নাই। শেঠ ও তাহার গৃহিণী উভয়েই অতিসৎলোক, তাহাদের যত্নে উজ্জয়িনীতে থাকায় আমার কোন কষ্ট হয় নাই। শেঠ যে প্রাপ্যের হিসাব দিল, তাহাও অধিক বোধ হইল না। আমি তাহার, পাণ্ডার এবং দর্শকের প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া একায় আরোহণপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে পুনরায় উজ্জয়িনী ষ্টেসনে প্রত্যাগত হইলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হোলকার্-রাজ্য।

প্রায় দ্বাদশ ঘটিকার সময় বাষ্পশকটে আরোহণপূর্ব্বক অবিলম্বে ফতেয়াবাদ-ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। এখানে শকট হইতে অবতরণ করিয়া অনেক ক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হয়। ষ্টেসনটী

শেঠকে প্রাপ্যের হিসাব দিতে বলিলাম। শেঠ আমার গমনোদ্যোগ দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইল। সে ভাবিয়াছিল "আমি অধিক দিন উজ্জয়িনীতে থাকিব।" শেঠ জিজ্ঞাসা করিল "পণ্ডিতজী! আবার কবে আসিবে"? আমি বলিলাম "তাহা বলিতে পারি না"। আমি যে সুদূর বঙ্গদেশের অধিবাসী, উহা বিশেষ ভাবে বুঝাইয়া বলিলেও সে বুঝিতে পারিল না। কারণ সহরের পসারীর কখনও বিদেশে যাইবার আবশ্যক হয় নাই, সুতরাং দেশান্তরের জ্ঞান তাহার একেবারেই নাই। শেঠ ও তাহার গৃহিণী উভয়েই অতিসৎলোক, তাহাদের যত্নে উজ্জয়িনীতে থাকায় আমার কোন কষ্ট হয় নাই। শেঠ যে প্রাপ্যের হিসাব দিল, তাহাও অধিক বোধ হইল না। আমি তাহার পাওনা এবং দর্জ্জির প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া এক্কায় আরোহণপূর্ব্বক অনতিবিলম্বে পুনরায় উজ্জয়িনী ষ্টেশনে প্রত্যাগত হইলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

হোলকার্-রাজ্য।

প্রায় সপ্তম ঘটিকার সময় বাষ্পশকটে আরোহণপূর্ব্বক অবিলম্বে ফতেয়াবাদ-ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। এখানে শকট হইতে অবতরণ করিয়া অনেক ক্ষণ প্রতীক্ষা করিতে হয়। ষ্টেশনটী

বৃহৎ-প্রান্তর-মধ্যে অবস্থিত। ঐ স্থানে কোন দোকানঘর অথবা ছায়াপ্রদ বৃক্ষ নাই। প্রাট্‌ফরমে জনতার মধ্যে বসিয়া আছি, এমন সময়ে আহাম্মদাবাদের কয়েকটী বস্ত্র-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ আমার নিকটে আসিয়া উপবেশন করিলেন এবং স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া আলাপ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা বস্ত্র-ব্যবসায়ী হইলেও সংস্কৃত-শাস্ত্রের কিছু কিছু অনুসন্ধান রাখেন। তাঁহাদের সহিত বোপদেব ও মুগ্ধবোধ-ব্যাকরণ সংক্রান্ত কথা হইল। একজন বলিলেন "শুনিয়াছি আপনাদের দেশে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের অত্যন্ত প্রচার"। আমি বলিলাম "হাঁ আমি নিজেও শৈশবে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িয়াছি"। তিনি বলিলেন "বোপদেব মহারাষ্ট্রের লোক কিন্তু তাঁহার ব্যাকরণ, স্বদেশে গৃহীত হইল না, বাঙ্গালা দেশে গিয়া বিলক্ষণ সমাদৃত হইয়াছে।" শেষোক্ত ব্যক্তির কিছু সংস্কৃত পড়া আছে, তিনি নাকি, ব্যবসায় উপলক্ষে এক বার কলিকাতায় গিয়া অনেক দিন ছিলেন। কিয়ৎকাল পরেই আজমীড় হইতে ইন্দোর-গামী শকট আসিল, আমরা সত্বর গিয়া উহাতে আরোহণ করিলাম। অপরাহ্ন তিনটা বাজিলে শকট ইন্দোর-ষ্টেসনে পৌঁছিল। আমি কেবল অবতরণ করিয়াছি, এমন সময় একজন গাড়োয়ান্ আসিয়া তাহার গাড়ীতে উঠিতে অনুরোধ করিল এবং বলিল "সে বাঙ্গালী বাবুদের বাসা চেনে।" আমি নিরাপত্তিতে তাহার গাড়ীতে উঠিয়া অবিলম্বে ইন্দোর-ছাউনীতে রেসিডেন্টের অন্যতম কর্মচারী শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলাম। তখন রাধানাথবাবু বাসায় ছিলেন না, তাঁহার পুত্রগণ সাদরে আমাকে গ্রহণ করিলেন। আমি জলযোগ করিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় রাধানাথ বাবু বাসায় আগমন করিলেন।

ইনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ খ্রীষ্টর্ষি মাননীয় মিঃ কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সন্নিহিত জ্ঞাতি। বাঙ্গলাদেশের বাহিরে অনেক বাঙ্গালীকে অনেক মূর্ত্তিতে দেখিয়াছি কিন্তু ইহার আদর্শ পৃথক্। রাধানাথ বাবুর ন্যায় শিষ্ট পরোপকারী এবং সদাচার ব্যক্তি বিদেশে অতি অল্পই আছেন। তিনি রীতিমত শিখা ধারণ করেন এবং প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যা, শিবপূজা ও নারায়ণপূজা করিয়া থাকেন। গ্রীষ্মাধিক্য-প্রযুক্ত সন্ধ্যার সময় রাজপথের পার্শ্বে জলসেক করিয়া অনেকগুলি চৌকী পাড়া হইল এবং কর্ত্তার অভিপ্রায় অনুসারে কুমারসম্ভবকাব্যের কয়েকটী শ্লোকের ব্যাখ্যা ও অন্যান্য বিবিধ গল্পে সময় অতিবাহিত করা গেল।

পুরাকালে রাজপুতনার অন্তর্গত বর্ত্তমান জয়পুর রাজ্য হইতে খাণ্ডোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ মৎস্যদেশ নামে অভিহিত হইত। রামায়ণ মহাভারত পুরাণাদিতে মৎস্য দেশের অনেক বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কলিযুগের প্রারম্ভে চন্দ্রবংশীয় প্রথম পাণ্ডব মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য-কালে (প্রায় চতুঃসহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে) মৎস্যদেশ বিরাট-রাজের অধিকৃত ছিল। পাণ্ডবগণ অজ্ঞাত-বাসকালে বিরাটের রাজধানীতে অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং বিরাট-তনয়া উত্তরার সহিত তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর বিবাহ হইয়াছিল। বিরাটের বংশধরগণ কতকাল মৎস্যদেশ শাসন করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা যায় না। তাহার পর এই প্রদেশে অনেক রাজা ও রাজবংশের আবির্ভাব ও তিরোভাব সংঘটিত হইয়াছে। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাপথের হিন্দু নরপতি বাজীরাও-পেশোয়ার অন্যতম সেনাপতি মলহররাও মৎস্যদেশের একাংশে এই হোলকার-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ইহার উত্তরে

সিন্ধিয়ারাজ্য, পূর্ব্বদিকে ধাররাজ্য ও নিমারজেলা, দক্ষিণে খান্দেশ এবং পশ্চিমে ধাররাজ্য। এই রাজ্য উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১২০ মাইল বিস্তৃত। ইহার মধ্য দিয়া নর্ম্মদা নদী প্রবাহিত হইতেছে। দক্ষিণাপথে "ধন্‌গর" নামক একটী জাতি বাস করে। উহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। উক্ত জাতীয় স্ত্রী পুরুষ উভয়ই বেশ বলিষ্ঠ এবং পরিশ্রমী। ইহাদের মধ্যে তিনটী শ্রেণী আছে। প্রথম শ্রেণীকে "খুটেগার্" বলে। খুটেগারেরা বস্ত্র-বয়ন প্রভৃতি তন্তুবায়ের ব্যবসায় করে। দ্বিতীয় শ্রেণীর নাম "হাট্‌গার্"। হাট-গারেরা গো মেষ মহিষ প্রভৃতি পশু পালন করে এবং প্রধানতঃ মেষের গাত্র হইতে রোম সংগ্রহ করিয়া কম্বল প্রস্তুত করে। ইহাদের অনেকে দধি দুগ্ধ বিক্রয় প্রভৃতিও করিয়া থাকে। তৃতীয় শ্রেণী "বার্গে" নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা কৃষক। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ ধন্‌গরদিগের পুরোহিত। ইহারা বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়া পুরোহিতের দ্বারা সম্পন্ন করে এবং অন্যান্য কার্য্যে কৌলিক রীতির অনুসরণ করিয়া থাকে। ধনগরেরা পুষ্পবতী হইবার পূর্ব্বেই কন্যার বিবাহ দেয় এবং কন্যোচিত দ্বাদশ দিন অশৌচ পরিপালন করে। ইহারা ভৈরব, খাণ্ডোবা, তুলজাপুরের ভবানী, যেমাই প্রভৃতি দেব দেবীর উপাসক। ইহাদের বিধবারা একাদশী করে। বিজয়া-দশমীর দিন মেষের পূজা করা ধনগর-দিগের একটী বিশেষ কৌলিক আচার। সম্পন্ন ধনগরেরা মৃত দেহের দাহ করে এবং অন্যান্য সকলে মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকদের দেহ ভূতলে সমাহিত করাই বিধি। ধনগরেরা পূর্ব্বপুরুষের প্রেতাত্মার পূজা করে এবং তাহাদের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া গৃহে রাখে।

পুণার সন্নিহিত নীরানদীর তীরস্থ একটী পল্লীতে উপরি উক্ত ধন্গর-কুলে মলহররাও জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একটী সামান্ত কৃষকের সন্তান ছিলেন। প্রথমে পেশওয়ার অধীনে একটী অতিনিম্ন কর্ম্মে নিযুক্ত হন, পরে চতুরতা ও কার্য্যদক্ষতার গুণে উক্ত নরপতির সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শেষে তাঁহার ক্ষমতা এতদূর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, স্বয়ং একটী বিস্তৃত রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াগিয়াছেন। মলহররাওয়ের পুত্র খাণ্ডেরাও। এই খাণ্ডেরাওয়ের পত্নীই জগৎ-প্রসিদ্ধা অহল্যাবাই। অহল্যাবাই যেমন সৌন্দর্য্যে অদ্বিতীয়া, তেমনি অসাধারণ প্রতিভাশালিনী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহার শ্বশুর মলহররাও জীবিত থাকিতেই তাঁহার স্বামী খাণ্ডেরাও এক পুত্র ও এক কন্তা রাখিয়া পরলোক গমন করেন। অহল্যা শ্বশুরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রী ও অনুগতা ছিলেন। তিনি পতিশোকে সহমৃতা হইবার জন্য উদ্যোগ করিলে শোকার্ত্ত শ্বশুর মলহরাও অতিনির্ব্বন্ধ-সহকারে তাঁহাকে উক্ত কার্য্য হইতে বিরত হইতে অনুরোধ করেন। অহল্যাবাই শ্বশুরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই। মলহররাও ইহলোক ত্যাগ করিলে খাণ্ডেরাওয়ের শিশু পুত্র মল্লিরাও সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। কিন্তু তিনি নয় মাস মাত্র জীবিত ছিলেন। কন্তা মুক্তাবাইর ভিন্ন শ্রেণীর সামন্তের সহিত বিবাহ হওয়ায় তিনি রাজ্যাধিকার লাভ করিতে পারেন নাই। এই সময় অহল্যাবাই স্বয়ং রাজ্যেশ্বরী হন। তিনি যথার্থ বীররমণীর ন্যায় বলিষ্ঠদেহা হইলেও সৈন্য-পরিচালনার ভার স্বয়ং গ্রহণ করা সঙ্গত নয় ভাবিয়া তাঁহার শ্বশুরের সময়ের একজন বিশ্বাসী সেনানায়ক তুকোজী নামক এক ব্যক্তিকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন। এই সময়

রাজপুরোহিত গঙ্গাধর-যশোবন্ত বিরোধী হন। তাঁহার ইচ্ছা, অহল্যাবাই একটী দত্তক গ্রহণ করিয়া উক্ত পুরোহিতকেই মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তাহা হইলে এক প্রকার তিনিই রাজ্যের সর্ব্বময় প্রভুত্ব লাভ করিতে পারেন। কিন্তু অহল্যাবাই উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন না। এদিকে পেশওয়ানরপতির পিতৃব্য রাঘবদাদা পুরোহিত গঙ্গাধরের পক্ষ অবলম্বনপূর্ব্বক অহল্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-সজ্জা করিতে প্রবৃত্ত হন। অহল্যাবাই ঐ সংবাদ পাইয়া মহারাষ্ট্র-রাজ মধুরাওকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া এক পত্র লেখেন। মধুরাও পত্র পাইয়া রাঘবদাদাকে যুদ্ধে ক্ষান্ত হইতে বলেন। উহাতে সকল গোলোযোগ মিটিয়া যায়। তাহারপর, অহল্যাবাই নিজের উদারতা-প্রযুক্ত গঙ্গাধরকে ক্ষমা করিয়া পুনরায় তাঁহাকেই মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করেন। অহল্যা রমণী হইলে ও তাঁহার অসাধারণ সাহস ও বিক্রম ছিল। তিনি রাজনীতি-প্রয়োগে অত্যন্ত নিপুণা ছিলেন। অহল্যাবাই রাজ্যভার গ্রহণাবধি দেহ-ত্যাগ পর্য্যন্ত অকাতরে দান ও পরোপকার করিয়া গিয়াছেন। তিনি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য ও স্নানের পর পূজা আহ্নিক করিতেন। তাহার পর, কিছুকাল ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণভোজন করাইতেন। ব্রাহ্মণেরা আহারান্তে দক্ষিণা লইয়া গৃহে গমন করিলে স্বয়ং আহার্য্য গ্রহণ করিতেন। ভোজনান্তে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া আড়াই প্রহরের সময় রাজপরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক সভায় যাইতেন। সন্ধ্যা-পর্য্যন্ত রাজকার্য্য করিতেন। তাহার পর, সায়ংকৃত্য ও জলযোগ সমাপ্ত করিয়া পুনরায় রাজসভায় যাইতেন। রাত্রি দেড়প্রহর পর্য্যন্ত রাজকার্য্য চলিত। তিনি রাজ্য সুদৃঢ় করিবার জন্ত কয়েকটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার শাসনকালে হোলকার-রাজ্যে কোন বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই এবং উক্ত রাজ্যের প্রজারা অতিসুখে ও শান্তিতে ছিল। অহল্যা-বাই পরলোক গমন করিলেও তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ অদ্যাপি সমস্ত ভারতবর্ষে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তিনি কেদার-তীর্থের যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটী ধর্ম্মশালা ও একটী কুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। মহীশূরে ও মাবল-প্রদেশে তাঁহার নির্ম্মিত অসংখ্য ধর্ম্মশালা ও কূপ বিদ্যমান আছে। দ্রাবিড়-প্রদেশের নানাতীর্থে, সেতুবন্ধরামেশ্বরে ও শ্রীক্ষেত্রে তাঁহার নির্ম্মিত দেবালয় ধর্ম্মশালা ও রাজপথসকল দেখিতে পাওয়া যায়। গয়াধামে তাঁহার অনেক দেবালয় আছে। তন্মধ্যে বিষ্ণুপদ-মন্দির ও লাটমন্দির প্রসিদ্ধ। ঐ মন্দিরে রামসীতা-মূর্ত্তির পার্শ্বে অহল্যাবাই ভক্তিভাবে বসিয়া শিব পূজা করিতেছেন—এইরূপ মূর্ত্তি নির্ম্মিত আছে। ঐ সকল কীর্ত্তির জন্য অহল্যা মানবী হইয়াও দেবীরূপে পরিণত হইয়াছেন। তীর্থ-যাত্রিগণ ঐ সকল দেবদেবীর মূর্ত্তির সহিত তাঁহাকেও পূজা করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য তীর্থস্থানেও অহল্যার কীর্ত্তি-কলাপের অভাব নাই। তিনি প্রতিবৎসর তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবালয়-সমূহে বিস্তর খাদ্যদ্রব্য দান ও প্রতিদিন অসংখ্য দরিদ্রকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইতেন। গ্রীষ্মকালে "জলসত্র" প্রতিষ্ঠা ও শীতকালে দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে শীতবস্ত্র বিতরণ করিতেন। পশু পক্ষীর জন্য ও খাদ্য দ্রব্য নির্দ্দিষ্ট ছিল। কৃষকেরা শস্যক্ষেত্রে পাখী বসিতে দিত না। অসংখ্য পাখী ঝাঁকে ঝাঁকে আসিয়া উপরে উড়িয়া বেড়াইত কিন্তু কোনরূপেই কৃষকদের সুরক্ষিত শস্যক্ষেত্র হইতে শস্য আহার করিতে পারিত না। দয়াবতী অহল্যা উহা দেখিতে পাইয়া কৃষকদের নিকট শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র কিনিয়া লইয়া

পাখীদের আহারের নিমিত্ত ছাড়িয়া দিতেন। এই রূপে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় ত্রিশ বৎসর কাল অহল্যাবাই সুখে রাজ্য শাসন করিয়া ষাট বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। অহল্যাবাই যখন রাজ্যভার গ্রহণ করেন তখন পূর্ব্বোক্ত সেনাপতি তুকোজী ব্যতীত তিনি হোলকার্-রাজ্য শাসনের উপযুক্ত অন্য কাহাকেও দেখিতে পান না। সুতরাং মলহররাওয়ের সহিত তুকোজীর কোন সম্পর্ক না থাকিলেও প্রীতিবশতঃ তাঁহাকেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ঐ সময়েই তিনি কৌশলক্রমে পেশোয়ার নিকট হইতে তুকোজীকে হোলকার্ অথবা রাজসম্ভ্রম-সূচক উপাধি প্রদান করাইয়াছিলেন। তুকোজীও যেমন বুদ্ধিমান্ ও কার্য্যকুশল তেমনই প্রভুভক্ত ছিলেন। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসহকারে অহল্যার উপদেশও আদেশ পরিপালন করিতেন। রাজ্যেশ্বরী অহল্যার ইচ্ছাক্রমে স্বর্ণমুদ্রা ও রৌপ্যমুদ্রার উপরে "মলহররাওর পুত্র তুকোজী হোলকার্" এই কথাটী লিখিত হইয়াছিল। অহল্যাবাইর মৃত্যুর পর এক বৎসর পরে তুকোজী হোলকার্ ৭০ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তাহার পর, তাঁহার পুত্র যশোবন্তরাও, হোলকার্-রাজ্যের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। এখন যশোবন্তরাও-হোলকারের পুত্র H H The মহারাজাধিরাজ রাজরাজেশ্বর সেওয়াই শিবাজী হোলকার্ G. C. S. I. মহোদয় হোলকার্-রাজ্যের সিংহাসনে বিরাজিত আছেন *। রাজধানী ইন্দোর নগরীর একাংশে ইংরেজ-রেসিডেন্ট বাস করেন। হোলকার-

* আমি যখন ইন্দোরে যাই তখন উপরি উক্ত নরপতি সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। গতবৎসর উক্ত নরপতি আপন শিশু পুত্রের প্রতি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া এখন শান্তি-সুখ উপভোগ করিতেছেন।

রাজ, ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মিত্রনরপতি। যদিও এই রাজার কোন রূপ কর প্রদান করিতে হয় না এবং আপন রাজ্য-মধ্যে স্বয়ংই অপরাধীর কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ড-পর্য্যন্ত বিধান করিতে পারেন, তথাপি উহা ইংরেজ-রেসিডেন্টকর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। এই রাজার রাজকীয়-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য একটী মন্ত্রি-সভা আছে। এতদ্ভিন্ন রাজ্যরক্ষার জন্য সৈন্য-বিভাগ, শান্তি রক্ষার জন্য শান্তিরক্ষা-বিভাগ, শিক্ষাবিধানের জন্য শিক্ষা-বিভাগ, কর-সংগ্রহের জন্য রাজস্ববিভাগ, বিচার কার্য্যের জন্য বিচার-বিভাগ ও রাজপথ জলাশয় প্রভৃতি নির্ম্মাণের জন্য পূর্ত্তবিভাগ আছে। হোলকার্-নৃপতির সম্মানের নিমিত্ত ইংরেজগবর্ণমেণ্ট হইতে ২১টী তোপ নির্দ্দিষ্ট আছে।

ইন্দোরনগরী।

পুরাকালে ইন্দ্রপুর নামক একটী ক্ষুদ্র নগরী ছিল, উহাই বর্ত্তমান ইন্দোরনগরী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত রাজ্ঞী অহল্যাবাই এই নগরীতে হোলকার-রাজ্যের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। এই নগরী কটকীনাম্নী একটী ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত। নগরটী চতুর্দ্দিকে প্রায় ন্যূনাধিক একবর্গমাইল ব্যাপী। ১২ই বৈশাখ প্রাতঃকালে স্নানাদি শেষ করিয়া নগর সন্দর্শনে বহির্গত হইলাম। নগরে প্রবেশ করিলেই রাজপথের উভয় পার্শ্বে নানাবিধ পণ্যদ্রব্য-শোভিত বিপণিসকল দৃষ্টি-পথে পতিত হইল।

কোন কোন দোকানের সম্মুখভাগে যব গোধূম মাষকলাই মটর ধান্য-প্রভৃতি শস্যরাশি পর্ব্বতাকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। কোন স্থলে তাম্র পিত্তলের বাসন-সকল সুসজ্জিত। কোথাও নানা-বর্ণের বস্ত্র ও কম্বলের দোকান। ইন্দোর সহরটী আয়তনে তত বড় না হইলেও বেশ উন্নতিশীল। এখানকার বাণিজ্য-ব্যবসায়ীরা অল্প সময়ের মধ্যেই খুব ধনশালী হয় কিন্তু যে রূপ শুনা গেল, তাহাতে কাহারই অস্তিত্ব স্থায়ী নহে। রাজাজ্ঞা হইলে তৎক্ষণাৎ নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়। নগরের মধ্যস্থলে রাজবাটী। মহারাজ-হোল্‌কারের প্রাসাদ এক নূতন পদার্থ। দেশ যুড়িয়া কাষ্ঠ-নির্ম্মিত অতিবৃহৎ সপ্ততল অট্টালিকা অবস্থিত। উহার গাত্রে স্থানে স্থানে মনোহর কারুকার্য্য আছে, কোন কোন অংশ বা নানাবর্ণে চিত্রিত। গৃহচূড়ায় লোহিত বর্ণের পতাকা-সকল উড্ডীন হওয়ায় ঐ মনোহর হর্ম্যমালার শোভার আরও বৃদ্ধি হইয়াছে। দূর হইতে রাজভবন ঠিক একটী রথের মত বোধ হয়। উহার কোন অংশে রাজকার্য্যালয়, কোন অংশে দেবালয়, কোন অংশে ভাণ্ডার, কোন অংশে অন্তঃপুর-মহিলারা বাস করেন। মহারাজ ঐ কাষ্ঠময় অট্টালিকায় বাস করেন না। কারণ ঐ প্রাসাদমালা সুদৃঢ় এবং প্রভঞ্জনের অপরাজেয় হইলেও সম্পূর্ণ নিরাপদ নহে। অগ্নিদেবের একটু কৃপা হইলে মুহূর্ত্তের মধ্যে ভস্মরাশিতে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু বহুকাল গত হইল ইহা নির্ম্মিত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয় নাই। ঐ প্রাসাদের উত্তর ভাগে ক্ষুদ্র দুইটী ইষ্টক-নির্ম্মিত অট্টালিকা আছে। বর্ত্তমান মহারাজ উহাতে বাস করেন। আমি একটী সঙ্গীর সহিত রাজবাটীর নানা স্থান

সন্দর্শন করিয়া প্রায় দশ ঘটিকার সময় বাসায় প্রত্যাগত হইলাম।

১৩ই বৈশাখ শুক্রবার, অপরাহ্ন তিনটার পর মহারাজের সভাপণ্ডিত প্রণ্ডিত উমাশঙ্কর জ্যোতিষী ও পণ্ডিত উমাকান্ত উপাধ্যায়ের বাসায় গমন করিলাম। তাঁহারা উভয়ে রাজভবনের সন্নিহিত একটী বাড়ীতে অবস্থান করেন। সংস্কৃত ভাষায় তাঁহাদের সহিত প্রায় তিন ঘণ্টা ব্যাপিয়া কথোপকথন হইল। তাঁহারা বলিলেন "দক্ষিণাপথের নীরানদীর তীরস্থ হোল্‌নামক গ্রামের অধিবাসী বলিয়া ইন্দোর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মলহররাও হোল্‌কার আখ্যায় বিভূষিত ছিলেন। এখন ইহা এই রাজবংশের একটী সম্মানজনক উপাধি। এই বংশের পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতিগণ হিন্দুশাস্ত্রে ও হিন্দুধর্ম্মে সবিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। বর্ত্তমান মহারাজও হিন্দুধর্ম্মে বিশেষতঃ জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অত্যন্ত অনুরক্ত। মহারাজ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে গিয়াছিলেন। তাহার পর, ফ্রেঞ্চ-দেশ ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়াছেন। মহারাজ হোল্‌কার্ সর্ব্বদা ইন্দোর নগরীতে অবস্থান করেন না, প্রায়ই গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া প্রজাদের অবস্থা ও মফস্বলের রাজকর্ম্মচারিবর্গের কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করেন"। আমি যে সময় ইন্দোর নগরীতে যাই, তখন মহারাজ দূরস্থ একটী পল্লীতে ছিলেন। আমি উপরি উক্ত পণ্ডিতদ্বয়ের শিষ্টতায় আপ্যায়িত হইয়া অপরাহ্নে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। সেই সময় প্রসিদ্ধ ভোজবংশীয় ধারা-নগরীর অধীশ্বর, উৎকট রোগের চিকিৎসার্থ ইন্দোরনগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। ১৫ই বৈশাখ শনিবার প্রাতঃকালে তাঁহার উকীল রাধানাথ বাবুর বাসায় আগমন করিলেন। বঙ্গদেশ হইতে

একজন পণ্ডিত আসিয়াছেন—এই সংবাদ পাইয়া তিনি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। এই উকীল মহোদয় বিশেষ বিদ্যানুরাগী। তিনি বলিলেন "মহারাজ এখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আছেন। একটু সুস্থ থাকিলে আমি আপনাকে লইয়া গিয়া মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করাইতাম। মহারাজ উত্তম সংস্কৃতে কথোপকথন করিতে পারেন। তিনি আপনার সহিত দেবভাষায় আলাপ করিয়া বড় আনন্দ লাভ করিতেন"। উকীল-মহোদয় ধারেশ্বরের আদেশক্রমে আমার দেশ ভ্রমণের পাথের স্বরূপ দশটী মুদ্রা আমার সম্মুখে রাখিলেন। আমি উহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। রাধানাথ বাবু বলিলেন "তিনি রেসি-ডেন্টের সহিত মফস্বল ভ্রমণ-কালে ধারেশ্বরের রাজধানীতে গিয়াছিলেন। সেখানকার প্রাচীন অট্টালিকা ও জলাশয়াদির শোভা অবর্ণনীয়"। আমি মুদ্রাকয়টী গ্রহণ করিলাম। যিনি সংস্কৃত কাব্য পাঠ করিয়াছেন, তিনিই ধারানগরীর অধীশ্বর ভোজবংশীয় নরপতিগণের বদান্যতার বিষয় অবগত আছেন। যে রাজবংশ চিরকাল অকাতরে ধন দান করিয়া দেশ দেশান্তর হইতে সমাগত সহস্র সহস্র কবি ও পণ্ডিতকে সম্মানিত করিয়াছেন। সেই বংশের নৃপতি যে, রোগশয্যায় শায়িত হইয়াও কর্ত্তব্যবোধে পূর্ব্বতন রীতির অনুসরণ করিবেন; ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

১৩ই রবিবার প্রাতঃকালে স্নানান্তে মহারাজ-হোল্‌কারের লালবাগ নামক উদ্যান সন্দর্শন করিতে গেলাম। রাজ-বাটী হইতে একটী প্রশস্ত রাজপথ উক্ত উদ্যানে গিয়াছে। সেই পথে অনেক দূর গিয়া লালবাগে উপস্থিত হইলাম। ঐ

মনোহর উদ্যান বহুদূর ব্যাপী। ইহার মধ্যস্থলে বিমল-বারিপূর্ণ প্রশস্ত জলাশয় ও রমণীয় অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। চতুর্দ্দিকে নানাজাতীয় বৃক্ষ লতা বিদ্যমান। মধ্যে বহুবিধ গোলাপ ও অন্যান্য পুষ্পরাজি বিকসিত হইয়া অপূর্ব্ব সুষমা বিস্তার করিতেছে। স্থানে স্থানে মণ্ডলাকার পুষ্পিত তরুশ্রেণী ও উৎস-সকল দর্শকের চিত্ত হরণ করে। বস্তুতঃ ঐ মনোহর উদ্যান দেখিলে নন্দনকাননের কল্পিত চিত্র হৃদয়-মধ্যে প্রতিভাত হয়। মহারাজ-হোলকার্ গ্রীষ্মকালে এই উদ্যানে অধিকাংশ সময় যাপন করেন। প্রায় দশ ঘটিকার সময় উদ্যান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। অপরাহ্নে রাধানাথ বাবুর মধ্যম পুত্র ও অন্যান্য দুই একটী সঙ্গীর সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। আমেরিকার খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণের ইন্দোররাজ্যে অত্যন্ত প্রভাব। ইহারা মহারাজের নিকট হইতে বিনা রাজস্বে বহুল পরিমাণে ভূমি গ্রহণ করিয়া উহাতে ক্যানেডিয়ান্-মিশন্-কলেজ্ ও উপাসনার্থ গির্জা নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নবনির্ম্মিত কলেজ-বাড়ীটী দেখিতে বেশ সুন্দর। উহাতে নাকি বেশ উত্তম পড়া শুনা হয়। এই নগরে রাজকুমার-কলেজ্ নামে আর একটী কলেজ বিদ্যমান আছে। মহারাজ-হোলকার্ উহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং তিনি উহার সম্পূর্ণ ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। মহারাজ-হোলকারের কলেজের অধ্যাপকগণ নাকি অপেক্ষাকৃত অধিক বেতন প্রাপ্ত হন। কলেজ দেখিয়া আমরা খ্রীষ্টীয় ভজনালয়ের সন্নিহিত হইলাম। শ্বেতাঙ্গ ও শ্বেতশ্মশ্রু প্রবীণ খ্রীষ্ট-পুরোহিত অতিশিষ্টতা সহকারে আমাদিগকে বসিতে অনুরোধ করিলেন। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া-হিন্দী বক্তৃতা শ্রবণ করিলাম।

এখানে ধর্ম্মার্থীদের অত্যন্ত আদর। অসংখ্য উৎকৃষ্ট উজ্জ্বল কাষ্ঠাসন শ্রেণীবদ্ধভাবে সুসজ্জিত রহিয়াছে। নিদাঘের দারুণ প্রতাপ প্রশমনের জন্য টানাপাখার ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু তথাপি শ্রোতার সংখ্যা অধিক নহে। যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারাও ধর্ম্মোপদেশ অপেক্ষা নিদ্রাদেবীর প্রতিই অধিক সমাসক্ত। তাহার পর, আমরা নগরের অন্যান্য স্থান সন্দর্শন করিয়া সায়ংকালে বাসায় ফিরিলাম। সন্ধ্যার পর, রাধানাথ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত আর্য্যধর্ম্ম-সংক্রান্ত কথোপ-কথন হইল। এ আর্য্যধর্ম্ম অর্থে সেই পুরাকালের বৈদিক-ধর্ম্ম নহে। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে দয়ানন্দ সরস্বতী নামক একজন বৈদান্তিক পণ্ডিত "আর্য্যধর্ম্ম" নামে একটী ধর্ম্মমত প্রচার করেন, আমি এখানে সেই ধর্ম্মের কথা বলিতেছি।

দয়ানন্দ সরস্বতী। গুজরাটের কাঠিয়াবাড় ভূভাগের অন্তর্গত মোর্ব্বীর রাজার অধীন এক ক্ষুদ্র নগরীতে উদীচ্য ব্রাহ্মণকুলে দয়ানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গ্রাম্য জমাদার ছিলেন। কয়েক খানি গ্রামের রাজস্ব সংগ্রহ ও শান্তিরক্ষার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত ছিল। পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার বর্ণমালা শিক্ষা ও আট বৎসরে উপনয়ন সংস্কার সম্পন্ন হয়। তিনি প্রথম সন্ধ্যা বন্দনা শিক্ষা করিয়াই যজুর্ব্বেদ কণ্ঠস্থ করিতে আরম্ভ করেন। চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহার সংস্কৃত ব্যাকরণ ও সমগ্র যজুর্ব্বেদ-সংহিতা পাঠ সমাপ্ত হয়। দীক্ষার দিনেই দয়ানন্দের মতের পরিবর্ত্তন হয়। সেই দিন তাঁহাকে সমস্ত দিন উপবাস করিতে হইয়াছিল। রাত্রিতে জাগরণের নিমিত্ত তিনি পিতার সহিত শিবমন্দিরে গমন করেন। অর্দ্ধরাত্রে মন্দিরের পূজক ও

ভৃত্যগণ বাহিরে আসিয়া নিদ্রিত হয় এবং সেই সঙ্গে তাঁহার পিতাও ঘুমাইয়া পড়েন। সেই সময় দয়ানন্দ সন্দেহাকুল-চিত্তে শিবের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমেই সংশয় বাড়িতে থাকে, তখন তিনি পিতাকে জাগাইয়া জিজ্ঞাসা করেন "পিতঃ! দেবমূর্ত্তি যে পরমেশ্বর উহা আমার ধারণা হইতেছে না। কারণ এই দেবমূর্ত্তির উপর দিয়া মূষিক চলিয়া যাইতেছে, অথচ সর্ব্বশক্তিমান্ দেব কিছু বলিতেছেন না"। তাঁহার পিতা তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন কিন্তু দয়ানন্দের তাহাতে তৃপ্তি হইল না। শ্রান্তি ও ক্ষুধা বোধ হওয়ায় পিতার অনুমতি লইয়া বাটী গেলেন। তাঁহার মাতা পূর্ব্ব হইতেই অল্পবয়সে পুত্রের উপবাসাদিতে আপত্তি করেন, কেবল স্বামীর অনুরোধে সম্মত হইয়াছিলেন। এখন পুত্রকে গৃহে আগত দেখিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে আহার প্রদান করিলেন। তাহার পর, দয়ানন্দের পিতা তাঁহাকে ব্রতভঙ্গের পাপ বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু তিনি তাহাতে মনোযোগ করিলেন না। ঐ সময় দয়ানন্দ আত্মমত গোপন রাখিয়া বিদ্যোপার্জ্জনে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড, নিঘণ্টু, নিরুক্ত এবং পূর্ব্বমীমাংসা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পর, তাঁহার চতুর্দ্দশবর্ষীয়া এক ভগিনী ও সুপণ্ডিত এক খুল্লতাতের মৃত্যু হয়। এই শোকের সময় তিনি মৃত্যু ও মুক্তির বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। এদিকে দয়ানন্দের বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। তাঁহার বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হইবার ইচ্ছা ছিল না। পিতার অনেক যত্নসত্বেও তিনি একদিন পিতার অজ্ঞাত-সারে গৃহত্যাগ করিলেন এবং শৈললাবক স্থানে লালা ভকতরাম-নামা এক সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সংন্যাস

আশ্রয় করিলেন। দীক্ষাকালে তাঁহার "শুদ্ধচৈতন্য" নাম হইল। তাহার পর, আহম্মদাবাদ প্রভৃতি নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া কাশীতে গমন করেন। সেখানে কিছু কাল বেদান্ত অধ্যয়ন করিয়া চাণোড়কন্যালীতে পরমানন্দ পরমহংসের নিকট পুনরায় সন্ন্যাসে দীক্ষিত হন। এই দীক্ষা-গ্রহণকালে তাঁহার শুদ্ধচৈতন্য নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া "দয়ানন্দ সরস্বতী" নাম হয়। তাহার পর, তিনি যোগবিদ্যার অবশিষ্ট গুপ্তবিষয় শিক্ষার নিমিত্ত রাজপুতনার অন্তর্গত অর্ব্বুদ-পর্ব্বতে কিছুকাল অবস্থান করেন। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হরিদ্বারের মহামেলায় উপস্থিত হন। সেখানে কিছুকাল অবস্থিতি করিয়া তাইদি নামক স্থানে গমন করেন। সেখানে তন্ত্রশাস্ত্র ও মাংসাহারী ব্রাহ্মণ দেখিয়া তাঁহার বিরক্তি জন্মে। তাহার পর, শ্রীনগরে গমন করিয়া কেদারঘাটে এক মন্দিরে বাস করেন। ঐ স্থানে গঙ্গাগিরি নামক একজন দার্শনিক সাধুর নিকট কিছুকাল দর্শনশাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিছুকাল পরে, ঐ স্থান হইতে রুদ্রপ্রয়াগ গুপ্তকাশী প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া নর্ম্মদার উৎপত্তি স্থান অমরকণ্টকপর্ব্বতে গমন করেন। শেষ জীবনে দয়ানন্দ দুগ্ধ ও অন্ন ব্যতীত অন্য কিছু আহার করিতেন না। তিনি যেখানে যাইতেন, সেই থানেই একটী করিয়া আর্য্যসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতেন। দয়ানন্দ কলিকাতায়ও আসিয়াছিলেন। তিনি যখন বোম্বাই গমন করেন, তখন ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া দেখিলেন বহুলোক তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিয়া আছে। তাঁহার পক্ষপাতীরা সুসজ্জিত হস্তী লইয়া তাঁহাকে লইতে আসিয়াছে এবং তাঁহার মতের বিরোধীরা একটী গর্দ্দভ

সাজাইয়া আনিয়াছে। কিন্তু দয়ানন্দ, হস্তী কিম্বা গর্দ্দভ কোন যানের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিলেন না। তিনি পদব্রজে গন্তব্য স্থানে গমন করেন। দয়ানন্দ বহু দেব দেবীর উপাসনার বিরোধী হইলেও যোগশাস্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি লাহোরে বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন "প্রাণায়ামদ্বারা যোগমার্গ অবলম্বন ব্যতীত ব্রহ্ম লাভের অন্য উপায় নাই। উনষাট বৎসর বয়সে তিনি আজমীঢ় নগরে দেহত্যাগ করেন।

রাধানাথ বাবুর পুত্রের নিকট দয়ানন্দসরস্বতী-কৃত "ঋগ্বেদ-ভাষ্যভূমিকা" ও "সত্যার্থপ্রকাশ" নামক দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিলাম। গ্রন্থ দুই খানি বিশেষ বিদ্যাবত্তার পরিচায়ক। দয়ানন্দ বেদের অর্থ করিতে গিয়া অনেক স্থলেই সায়নাচার্য্যের অনুসরণ করেন নাই, স্বীয় প্রতিভাসম্ভূত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সত্যার্থপ্রকাশে মনুসংহিতা প্রভৃতিগ্রন্থের ও মেধাতিথিপ্রমুখ-ভাষ্যকারগণের ভাষ্য উপেক্ষা করিয়া স্ববুদ্ধি-প্রসূত অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার প্রচারিত সকল ব্যাখ্যা সকলের অনুমোদিত না হইলেও তিনি বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র হইতে আধুনিক উচ্চশিক্ষা ও বিশুদ্ধ রুচির অনুকূল যে সকল তত্ত্ব উদ্ধার করিয়াছেন, উহা তাঁহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচায়ক। ইন্দোর নগরে একটী আর্য্যসভা আছে। পণ্ডিত বৃকোদর শাস্ত্রী উক্ত সভার ধর্ম্মোপদেষ্টা। অনেক শিক্ষিত লোক উক্ত সভার সভ্য। রাধানাথ বাবুর বৈঠকখানায় মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতীর একখানি তৈলচিত্র দেখিলাম। উক্ত মহাত্মা কৃশ ছিলেন না। তাঁহার স্থূল দেহ, প্রসন্নবদন ও সৌম্য মূর্ত্তি যথার্থই শান্তির উদ্দীপক।

রাজ্যের অন্যান্য বিষয়।—১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ-হোল্কারের রাজ্যের আয় বার্ষিক এক কোটি ছয় লক্ষ এগার হাজার ছয় শত টাকা ছিল। এখন উহা অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে। জাওরার নবাব প্রভৃতি কয়েকটী সামন্ত ভূপতি মহারাজ-হোল্কারের করদ। ইহারা নিজ নিজ রাজ্যের প্রজাসমূহের শাসন কার্য্য স্বয়ংই সম্পন্ন করেন, কেবল ইহাদের মহারাজ-হোল্কারকে বার্ষিক কর মাত্র প্রদান করিতে হয়। ইন্দোরের সৈন্য বিভাগে তিনহাজার এক শত (৩১০০) নিয়মিত ও দুই হাজার একশত পঞ্চাশ (২১৫০) অনিয়মিত পদাতিক সৈন্য এবং দুই হাজার একশত (২১০০) নিয়মিত ও একহাজার দুই শত (১২০০) অনিয়মিত অশ্বারোহী সৈন্য আছে। এতদ্ভিন্ন তিনশত চল্লিশ (৩৪০) কামান ও বিয়াল্লিশটী (৪২) বৃহৎ কামান আছে। হোলকার্-রাজ্যে প্রায় ১০৫৪২৩৭ সংখ্যক লোকের বাস আছে। তন্মধ্যে মহারাষ্ট্রীয় গুজরাটী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণও রাজপুত, বেণিয়া, কায়স্থ, কুন্বী, ধন্গর প্রভৃতিই অধিক। এতদ্ভিন্ন এই প্রদেশে ভীল নামক একটী জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। কথিত আছে, পূর্ব্বকালে মধ্যভারত রাজপুতানাও দক্ষিণাপথের অধিকাংশ রাজ্য ভীলজাতির অধিকৃত ছিল। পরবর্ত্তী আক্রমণকারীদের নিকট পরাভূত হইয়া উহাদের অধিকাংশই এখন পর্ব্বত ও অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ভীলেরা বলে "তাহারা মহাদেব হইতে উৎপন্ন"। কথিত আছে;— "কোন সময়ে মহাদেবের ঔরসে কোন রমণীর গর্ভে অনেকগুলি সন্তান জন্মে। উহারা অতিশয় দুর্দ্দান্ত হইয়াছিল। একদিন উহাদের একজন মহাদেবের ষাঁড়টি মারিয়া ফেলে। উহাতে

দেবাদিদেব পশুপতি কুপিত হইয়া উহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। তাহার পর হইতে উহারা পাহাড় জঙ্গল আশ্রয় করিয়া নিকৃষ্ট অবস্থায় কাল যাপন করিতেছে।" অনেকে অনুমান করেন, বানররাজ সুগ্রীবের মন্ত্রী ভল্লুক জাম্ববান্, ভল্লুক পশু নহেন। তিনি এই ভীলকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই মহাকবি বাল্মীকি তাঁহাকে ভল্লুক আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্রে এই জাতি ভিল্লিনামে উক্ত হইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে রামায়ণোক্ত বানর ও ভল্লুক পশু নহে, উহারা একজাতীয় মানুষ। পশু হইলে কি উহারা সীতার উদ্ধার বিষয়ে ভগবান্ রামচন্দ্রের সাহায্য করিতে পারিত? বর্ত্তমান মহীশূর-রাজ্যও উহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান পূর্ব্বকালে কিষ্কিন্ধ্যা নামে উক্ত হইত। কিষ্কিন্ধ্যার আদিমনিবাসী কৃষ্ণকায় জাতি ঐ দেশের শাসন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ভিল্লি নামক অপর একটী জাতিও তাহাদের সাহচর্য্যে জীবন যাপন করিত। এই উভয় জাতি হইতেই বালী, সুগ্রীব, জাম্ববান্, হনূমান্, নল, নীল প্রভৃতি রাজা মন্ত্রী ও অন্যান্য বীরগণের উৎপত্তি হইয়াছিল। বোধ হয় বিস্ময়-রসের অবতারণার নিমিত্তই মহাকবি বাল্মীকি ঐ সকল জাতিকে বানর ও ভল্লুক নামে বর্ণন করিয়া থাকিবেন। ভীলজাতি অত্যন্ত দৃঢ়কায় ও পরিশ্রমী। ইহারা সহজে কাহারও বশ্যতা স্বীকার করিতে চাহে না। নিয়মবদ্ধ হইয়া কাজ করা অথবা দৈনিক পারিশ্রমিক গ্রহণ করা, ভীলেরা অত্যন্ত ঘৃণাজনক ও অমর্য্যাদাসূচক মনে করে। ইহারা বিবাদ বিসম্বাদের মীমাংসার জন্য নায়কের নিকট অভিযোগ করে। নায়ক ঐ সমুদায়ের নিষ্পত্তি করেন। ভীলজাতীয় কোন প্রধান ব্যক্তিই নায়কের পদে

নিযুক্ত থাকে। এক জন উক্ত নায়কের মন্ত্রীর কার্য্য করে। ঐ মন্ত্রীর পদটী বংশানুক্রমিক। ভীলেরা পূর্ব্বে তীর, ধনু, যষ্টি, তরবারি, পাষাণখণ্ড প্রভৃতির সাহায্যে যুদ্ধ করিত, এখন নানা জাতির সংস্রবে কিয়ৎপরিমাণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এখন ইহারা প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য ও মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহাদের মধ্যে এমন অনেক শিকারী আছে যে, সিংহ হস্তী গবয় ব্যাঘ্র প্রভৃতি কেহই তাহাদের হস্তে অব্যাহতি পায় না। ভীলজাতীয় স্ত্রী পুরুষ সকলেই খঞ্জনী বাজাইয়া প্রায় নৃত্য গীত করে। কেহ কেহ সর্পক্রীড়া দেখাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকে। মেওয়ার, মালব, খান্দেশ; গুজরাট, আজমীঢ়, যশল্মীর, বেরেলী, বান্দা, আমেদনগর, পুণা, কাঠিয়াবাড়, কচ্ছ প্রভৃতি প্রদেশ-সমূহে বহুসংখ্যক ভীলের বাস আছে। ভীলদের অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। কিয়দংশ হিন্দু। ভিলালা নামক ভীলদের আর একটি সম্প্রদায় আছে, উহারা অপেক্ষাকৃত সভ্য। কেহ কেহ বলেন, উহারা রাজপুত-শোণিত হইতে উৎপন্ন।

ইন্দোর-ত্যাগ। ১৭ই বৈশাখ সোমবার দেড়টার সময় রাজপুতানা-মালব-রেলপথের ইন্দোর-ষ্টেশনে বাষ্পশকটে আরোহণপূর্ব্বক পুনরায় ফতেয়াবাদ জংসন অতিক্রম করিয়া রত্নলাম অভিমুখে চলিলাম। ফতেয়াবাদ ষ্টেশন ত্যাগ করিলেই একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর উপর দিয়া বাষ্পশকট চলিল। একজন সহযাত্রীর নিকট নদীটির নাম জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "ঐ নদীটির নাম গম্ভীরা"। কালিদাস মেঘদূত কাব্যে

এই গম্ভীরার বর্ণন করিয়াছেন *। তাঁহার সময়ে গম্ভীরার সলিল যেরূপ বিশদ ছিল, অদ্যাপি উহার সেই রূপই প্রসন্নতা বিদ্যমান আছে। গম্ভীরার কাচবৎ স্বচ্ছ সলিল-প্রবাহে সূর্য্যরশ্মি পতিত হওয়ায় অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে। তাহার পর, কিছুদূর গিয়া চম্বল ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। চম্বলনদীর সেতুর সন্নিহিত বলিয়া ষ্টেসনটীর নাম চম্বল। প্রাচীন চর্ম্মণ্বতী নদীই এখন মালবী ভাষায় চম্বল নাম ধারণ করিয়াছে। মহাভারতে উক্ত আছে;— দশপুরনগরের অধিপতি রাজা রন্তিদেবের গোমেধযজ্ঞের আহুতি হইতে ঐ নদীর উৎপত্তি হইয়াছিল। কালিদাসও মেঘদূতে চর্ম্মণ্বতীর উল্লেখ করিয়াছেন †। প্রকৃত পক্ষে যাহা দেখা যায় তাহাতে চম্বলষ্টেশনের উত্তরভাগস্থ বিন্ধ্য-পর্ব্বতশ্রেণী হইতে এই নদী উৎপন্ন হইয়া শিপ্রার সহিত গিয়া মিলিত হইয়াছে। আমরা এখন যে প্রদেশের মধ্য দিয়া যাইতেছি, পুরাকালে উহারই অনতিদূরে দশার্ণদেশ ও বিদিশানগরী বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন বিদিশা এখন "ভিল্‌সা" নাম ধারণ করিয়াছে। হোসোঙ্গা-বাদ যাইবার রেলপথের পার্শ্বে বিদিশার নষ্টাবশেষ ভিল্‌সা

---

* "গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে,
ছায়াত্মাপি প্রকৃতি-সুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশং।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্য্যা
মোঘীকর্ত্তুং চটুলশফরোদ্বর্ত্তনপ্রেক্ষিতানি॥"

(মেঘদূতম্)

† "আরাধ্যৈনং শরবণভবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা
সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াদ্বীণিভির্মুক্তমার্গঃ।
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্
স্রোতোমূর্ত্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্ত্তিং॥"

নগরী অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। গাড়ী যখন ফতেয়াবাদ-ষ্টেসনে থামিয়াছিল, সেই সময় একটী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ-মহিলা আমাদের গাড়ীতে উঠিয়াছিলেন। ঐ মহিলাটী বেশ বিদুষী। তিনি একটী গৈরিক-পরিচ্ছদ সন্ন্যাসীর সহিত বাসনা-ত্যাগ বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। আমি যেই একটী সহযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "এই কি সেই কালিদাস-বর্ণিত চর্ম্মণ্বতী? অমনি উক্ত ব্রাহ্মণ-মহিলা একটী সংস্কৃত-শ্লোক আবৃত্তি করিলেন। উহাতে চর্ম্মণ্বতীর নাম আছে। আমি শ্লোকটী লিখিয়া লইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি সম্মুখের বেঞ্চি হইতে উঠিয়া আমার পার্শ্বে বসিলেন এবং ধীরে ধীরে কবিতাটী উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। শ্লোকটী লেখা শেষ হইলে অনেক ক্ষণ আমার সহিত সংস্কৃত-ভাষায় কথোপকথন চইল। তিনি সংস্কৃত মরাঠী ও হিন্দী বেশ জানেন। উক্ত তিন ভাষায় অনর্গল কথোপকথন করিতে পারেন। মহিলাটী আকৃতিতে কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গী ও উজ্জ্বল-শ্যামবর্ণা। বয়স ত্রিশের ন্যূন হইবেনা কিন্তু এই প্রৌঢ়বয়সেও বালিকার ন্যায় সরল-প্রকৃতি। উক্ত রমণী কাহারও নিকট কোন রূপ সঙ্কোচ করিলেন না। সকলের সহিতই ঈষৎ হাস্যসহকারে আলাপ করিতে লাগিলেন। ঐ মহিলার স্বাভাবিক প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম। এক বৎসর গত হইল তাঁহার স্বামী পরলোকে গমন করিয়াছেন, সন্তানাদি কিছু হয় নাই সুতরাং স্বয়ংই পুরোহিত সহ স্বামীর সপিণ্ডীকরণ সমাধা করিবার জন্য অবন্তীতীর্থে গমন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে মস্তক মুণ্ডিত এবং চওড়া লালপেড়ে শাড়ী গৈরিক-রঞ্জিত করিয়া

পরিধান করিয়াছেন। দেখিতে দেখিতে বাষ্পশকট বড়নগর ষ্টেসনে পৌঁছিল। বড়নগর মহারাজ-সিন্ধিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটী জেলার হেড্‌কোয়াটার্। এই স্থানটী অতিপ্রাচীন। এখানে পুরাকালের অনেক দেবমন্দির ও জলাশয় প্রভৃতি আছে। ষ্টেসন হইতে মহারাজ-সিন্ধিয়ার প্রাসাদের অগ্রভাগ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। ঐসময় কোন রাজকর্ম্মচারীকে লইবার জন্য কয়েকটী সুসজ্জিত হস্তী ষ্টেসনে অপেক্ষা করিতেছিল। এখানে মহারাজ-সিন্ধিয়ার নিযুক্ত ফৌজদার বাস করেন এবং তত্তি. একটী সেনা-নিবাসও বহুসংখ্যক সৈন্য থাকে। ব্রাহ্মণমহিলা নামিবার সময় আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "শ্রীমন্তঃ কৃপয়া অত্র অবতরন্তু, অত্রাপি পরিব্রাজকানাং দৃষ্টিরম্যাণি বহুনি দ্রষ্টব্যানি বিদ্যন্তে"। আমি বলিলাম "আমাকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশে ফিরিতে হইবে, প্রত্যেক স্থলে অবতরণ করিতে গেলে কালবিলম্বের সম্ভাবনা, অতএব আমি এখানে অবতরণ করিতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত হইতেছি"। তাহার পর, পরস্পর অভিবাদন শেষ হইলে তিনি পুরোহিত সহ অবতরণ করিলেন। বড়নগর ষ্টেসনটী বেশ মনোরম। ইহার অনতিদূরে একটী বিমলতোয়া স্রোতস্বিনী প্রবাহিত। এখানে অনেক ক্ষণ গাড়ী অপেক্ষা করে। আরোহি-গণের কলরব থামিলে পুনরায় বাষ্পশকট ধাবিত হইল। রেল-পথের উভয়-পার্শ্বের শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি দেখিয়া মনে হইল ঐ প্রদেশের ভূমি বিশেষ উর্ব্বরা। অনতিদূরস্থ গ্রামগুলিও জনপূর্ণ ও সমৃদ্ধ বলিয়া বোধ হইল। একজন সহযাত্রী বলিলেন "ঐ প্রদেশটী সিন্ধিয়া, গাইকোঁয়ার্ ও হোলকার্ এই তিন নৃপতির অধিকৃত। পাশাপাশি তিন তিন খানি গ্রামের কোন খানি সিন্ধিয়ার,

কোন খানি গাঁইকোয়ারের, কোন খানি বা হোল্‌কারের রাজ্যের অন্তর্গত। গ্রীষ্মের দিবা অবসানপ্রায়, ঐ সময় প্রান্তরের শোভা আরও মনোহর হইল। দেখিতে দেখিতে বাষ্পশকট রতলাম-ষ্টেসনে পৌঁছিল।

রতলাম-রাজ্য।

মালবের পশ্চিমাংশে রতলাম-রাজ্য অবস্থিত। মারোয়ারের প্রসিদ্ধ রাঠোর-কুল-সম্ভূত যোধপুরাধিপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতা মল্লদেবের বংশে মহাবীর রতনসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সম্রাট্ সাজিহানের সময় সবিশেষ পরাক্রম প্রকাশ করায় বাদসাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এই প্রদেশে একটী বিস্তৃত জায়গীর প্রদান করেন। উহা হইতেই বর্ত্তমান রতলাম রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই রাজ্যটী এখন মহারাজ-সিন্ধিয়ার করদ। ইহার পরিমাণ প্রায় ১২০০ বর্গ মাইল হইবে। ইহাতে প্রায় ১২৫০০০ লোক বাস করে। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। এই রাজ্যে নানাশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, রাজপুত, বেণিয়া, মালবকায়স্থ, নবশাক ও অন্যান্য নানাপ্রকার পার্ব্বত্য জাতির বসতি আছে। রাজ্যের আয় পূর্ব্বে প্রায় একুশ লক্ষ টাকা ছিল, এখন অনেক বাড়িয়াছে। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে রতলামের রাজা, গোয়ালিয়রের মহারাজ-সিন্ধিয়াকে বার্ষিক ৮৭০০০ হাজার টাকা দিতে সম্মত হন কিন্তু মহারাজ-সিন্ধিয়া এই রাজ্যে সৈন্যপ্রেরণ অথবা রাজ্যপালন সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না বলিয়া

অঙ্গীকার করেন। এখন উক্ত কর ইংরেজগবর্ণমেণ্টের সাহায্যে মহারাজ-সিন্ধিয়াকে প্রদত্ত হয়। এখানে এক জন পলিটিকাল্-এজেণ্ট অবস্থান করেন। রতলামের-মহারাজের মন্ত্রিসভা, সৈন্য-বিভাগ, পোলিশ-বিভাগ, শিক্ষা-বিভাগ, রাজস্ববিভাগ, পূর্ত্ত-বিভাগ প্রভৃতি আছে। এই রাজ্যের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারাদি রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ স্বয়ংই সম্পন্ন করেন। রতলামরাজের সৈন্যবিভাগে ৫টী বড় কামান, ৫৮ জন গোলন্দাজ, ৩৫ জন অশ্বারোহী এবং ৩০০ শত পদাতিক সৈন্য আছে। এখন এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রত্নসিংহের বংশোদ্ভূত মহারাজ যশোবন্ত সিংহের পুত্র H H রাজা সার্ রণজিৎসিংহ K. C. I. E. রতলামের সিংহাসনে বিরাজিত আছেন। রাজপুতানার অন্তর্গত আলোয়ারের মহারাজ মঙ্গলসিংহ রতলামের রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই রাজবংশের সম্মানার্থ ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট হইতে ১৩টী তোপ নির্দ্দিষ্ট আছে।

রতলাম-নগরী।

সূর্য্য অস্তগত হইবার কিছু পূর্ব্বে বহুসংখ্যক যাত্রীর সহিত ষ্টেষনে অবতরণ করিলাম। আমি যে বাঙ্গালী বাবুর বাসায় থাকিব স্থির ছিল, অনুসন্ধানে জানিলাম তিনি ষ্টেষনের নিকট হইতে সহরে উঠিয়া গিয়াছেন। ষ্টেসনের নিকটে একটী বড় বাজার ও অনেক মুদীর দোকান আছে। আমি একটী মুদীর দোকানে শিধাদ্রব্যের জন্য চারি আনা হইতে

এক টাকা পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার করিলাম কিন্তু মুদী কোন প্রকারেই "পরদেশীকে" স্থান দিল না। সকলেই বলিল সরাইতে গিয়া থাক। আমি একরাত্রি মাত্র রতলামে থাকিব সুতরাং একটী ভারবাহীর নিকট ব্যাগটী দিয়া সেই পান্থশালা অভিমুখে চলিলাম। ষ্টেসন হইতে সহর প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। উহার ঠিক মধ্যপথে একটী বিজন স্থানে মহারাজ নিরাশ্রয় পথিকগণের রাত্রিযাপনের জন্ত একটী পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। পথে যাইতে যাইতে সেই ভারবাহী বলিল "মহারাজ! সরাইএ অনেক বদমায়েস্ পথিকবেশে আসিয়া থাকে। উহারা প্রায়ই কোন পথিককে একাকী পাইলে গভীর রাত্রিতে তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া চলিয়া যায়। ঐ কথা শুনিয়া মনে অত্যন্ত শঙ্কা হইল, তথাপি সরাইতে উপস্থিত হইলাম। সরাইটী অতিপ্রকাণ্ড, চারিদিকে অতিদীর্ঘ চারিটী গৃহশ্রেণী, মধ্যে প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণ। প্রত্যেক গৃহশ্রেণীতে প্রায় ১৫।১৬টী করিয়া ঘর। প্রত্যেক গৃহ-শ্রেণীর সম্মুখে বারাণ্ডা আছে। সরাইটী আম্রবণের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া উহাতে উত্তমরূপ রৌদ্র এবং বায়ুর সঞ্চার হয় না, সুতরাং মৃণ্ময় গৃহ ও বারাণ্ডা আর্দ্র বোধ হইল। দ্বারে দুই জন দ্বারবান্ ও এক জমাদার বিরাজমান। সেই দীর্ঘকায় জমাদারসাহেবের আরক্ত নয়ন ও গুম্ফ-রাজি-বিরাজিত মুখ দেখিয়া ভারবাহীর কথায় বিশ্বাস হইল। বস্তুতঃ এই জমাদার-মূর্ত্তির সাহায্যেই বোধ হয়, তস্কর ও দুর্ব্বৃত্তগণ সময়ে সময়ে নিরীহ পথিকগণের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া থাকে। সরাইএ থাকিতে হইলে উহার ভিতরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে ঐ জমাদারের নিকট পথিককে আপন নাম, ধাম ও ইংরেজরাজ্যের প্রজা কি, কোন দেশীয় রাজার রাজ্যের প্রজা,

উহা লিখিয়া দিতে হয়। ইংরেজগবর্ণমেন্টের প্রজা হইলে নাকি তাহার উপর জমাদার সাহেবের সতর্ক-দৃষ্টি রাখিতে হয়। কারণ ইংরেজগবর্ণমেন্টের প্রজার প্রতি কোন রূপ অত্যাচার হইলে তাহার জন্ত বিশেষ কৈফিয়ৎ দিতে হয়। আমি উপস্থিত হইলে জমাদারসাহেব কিছু সঙ্কুচিত হইল, কারণ বাঙ্গালী বাবুদের ইহারা যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে। সে বলিল "বাবু সাহেব একবার ভিতরে গিয়া দেখিয়া আসুন, যদি ইচ্ছা হয়, তবে যে ঘরে খুসী আপনার আসবাব রাখুন, আমি গিয়া নাম ধাম লিখিয়া লইয়া আসিব।" ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম কতক-গুলি হিন্দুস্থানী লোক একস্থানে বারাণ্ডায় বসিয়া গাঁজা খাইতেছে। অপর বারান্দায় কতকগুলি নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক আহার কার্য্যে রত, প্রাঙ্গণে কয়েকটী গ্রাম্যকুক্কুট বিচরণ করিতেছে। ঐ স্থানে থাকিতে আমার কিছুতেই প্রবৃত্তি হইল না। বিশেষ নিকটে কোন জলাশয় নাই সুতরাং আমি শঙ্কাজনক স্থান পরিত্যাগ করিয়া পুনর্ব্বার ষ্টেসনে ফিরিলাম। আর একখানি ট্রেন্ আসিল, অবতীর্ণ যাত্রিগণ স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। রাত্রি প্রায় ৭৷৷০টা হইতে চলিল। একজন একাওয়ালা আমাকে ডাকিলে আমি সমুদয় তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম। সে বলিল "আমার গাড়ীতে আসুন, আমি সে বাবুসাহেবের বাসা চিনি"। আমি একার নিকট গিয়া দেখি একটী প্রৌঢ়া অতিশয় স্থূলাঙ্গী গৃহস্থমহিলা একবারে একার সমুদয় স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছেন। সেই গৌরাঙ্গীর হাতের মোটা মল ও হাতের সোণার তাবিজ, হাঁসলী-প্রভৃতি অলঙ্কার দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়; বস্তুতঃ ঐরূপ রৌপ্য ও সুবর্ণরাশির ভার বহন করা বড় সহজ নহে। আমি একাওয়ালাকে বলিলাম "তোমার

একার স্থান কোথায়?" গাড়োয়ান্ বলিল "আমি বলাইয়া দিতেছি"। আমি স্ত্রীলোকের গা ঘেঁসিয়া বসিতে অস্বীকার করিলে গৃহস্থমহিলাটী বলিলেন "মহারাজ! ফিরিয়া যাইতেছ কেন? এস, আর সহরে যাইবার গাড়ী নাই, পড়িয়া থাকিলে কষ্ট পাইবে, তুমি আমার লেড়কার বরনী, আমার সঙ্গে বসিয়া গেলে দোষ কি?" বিদেশে বিশেষতঃ সঙ্কটাপন্ন সময়ে ঐরূপ সন্তান সম্বোধন আমার নিকট বড় মিষ্ট বোধ হইল। আমি তখন ভারবাহীকে বিদায় করিয়া অতিসঙ্কুচিত-দেহে সেই হিতৈষিণী মাতৃমূর্ত্তির পার্শ্বে বসিলাম। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যে দ্রুতগামী একা সহরে প্রবেশ করিল এবং বণিক্‌মহল্লার একটী বড়বাড়ীর দরজায় বণিক্-গৃহিণীকে নামাইয়া দিয়া আমাকে লইয়া পুনরায় চলিল। কিছুক্ষণ পরেই বাঙ্গালী আসিষ্টান্ট ইঞ্জিনিয়ার্ শ্রীযুক্ত বাবু কুলদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় পৌঁছিলাম। কিয়দ্দূরে নদীর একটী সেতু প্রস্তুত হইতেছে। কুলদানন্দবাবু কয়েক দিন গত হইল, সপরিবারে সেই সেতুসন্নিহিত ক্যাম্পে বাস করিতেছেন। বাসায় পাচক ভৃত্য ও একটী বাঙ্গালীবাবু ছিলেন। বাবুটী আমাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। আমি কুলদাবাবুর বন্ধুর চিঠির কথা উল্লেখ করিলে তিনি বলিলেন "সে কি মহাশয়! এই সুদূর বিদেশে বাঙ্গালীর বাসায় বাঙ্গালী আসিয়াছেন, তাহাতে আবার চিঠির প্রয়োজন কি? আপনার আগমনে আমরা পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছি। তাহার পর, নানাবিধ কথোপকথন করিয়া আহারান্তে শয়ন করিলাম। প্রাতঃকালে উঠিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক কাপড় ছাড়িয়া রাজবাটী সন্দর্শন করিতে বাহির হইলাম। ষ্টেশনে যাইবার রাজপথের পার্শ্বেই রতলামরাজের সুবৃহৎ প্রাসাদমালা।

অল্প দিন গত হইল, ঐ মনোহর সৌধ নির্ম্মিত হইয়াছে। অনতি-দূরে মনোহর উদ্যানের মধ্যে একটী প্রশস্ত জলাশয়। ঐ উপবনের জলে স্থলে নানাবিধ কুসুম বিকসিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। উদ্যানস্থ হর্ম্ম্যটী অত্যন্ত সুন্দর। রতলামের বাজারটীও বেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন, তজ্জন্য এখানে অনেক বণিকের বাস। রতলামনগরী রাজপুতানা-মালব-রেলপথের কেন্দ্র-স্থান হওয়ায় দিন দিন এখানে বাণিজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে। রতলামে অহিফেণ প্রস্তুত হয়। অহিফেণসেবীরা বলেন রতলামের অহিফেণ নাকি উৎকৃষ্ট। বাসায় ফিরিয়া স্নান সন্ধ্যা শেষ করিয়া আহারে বসিলে বাবুটী রতলামের বিষয় গল্প করিতে লাগিলেন। তিনি বহুকাল ঐ প্রদেশের নানাস্থানে চাকরী করিয়াছেন, সুতরাং উক্ত প্রদেশ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা যথেষ্ট। আহারান্তে বাবুটীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া একটী ভারবাহীকে লইয়া ১০টার পূর্ব্বেই ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। রতলাম ষ্টেসনটী বেশ বড়। ইহা রাজপুতানা-মালব-রেলপথ ও রতলাম-গোদরাশাখা-রেলপথের সন্ধিস্থল বা জংসন। প্রতিদিনই এখানে নানাদেশীয় অসংখ্য যাত্রী সমবেত হইয়া থাকে। তিন চারিটী স্থানে টিকিট বিক্রীত হয়। আমি ট্রেন্ ছাড়িবার প্রায় আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে টিকিট পাইয়াছিলাম, সুতরাং বিলম্ব না করিয়া অনেক যাত্রীর সহিত রতলাম-গোদরাশাখা-রেলপথের উপরি সুসজ্জিত শকট-মালায় আরোহণ করিলাম।

গুজরাট-অভিমুখে যাত্রা।

এই শাখা রেলপথটী, রাজপুতানা-মালব-রেলপথের অপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ বিস্তৃত। পথের অনুরূপ গাড়ীগুলিও বিলক্ষণ দীর্ঘ এবং প্রশস্ত। অধিকন্তু তৃতীয়শ্রেণীর গাড়ীগুলির বর্ণ ও কাচমণ্ডিত গবাক্ষের সৌন্দর্য্য দেখিলে দ্বিতীয়শ্রেণী বলিয়া ভ্রম হয়। এই রেলপথটী নাকি কোন দেশীয় ভূপতির ব্যয়ে নির্ম্মিত। যথাসময়ে দূরব্যাপিনী শকটমালা বহুসংখ্যক যাত্রী লইয়া হস্ হস্ শব্দে দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইল। কিছুদূর অগ্রসর হইলেই রেলপথের উভয় পার্শ্বে যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল শালবন ও পর্ব্বত-মালা নয়নগোচর হইতে লাগিল। ঐ পথে গমনকালে অনেক কৃষ্ণসার মৃগ দেখিলাম। মধ্যে মধ্যে কৃষ্ণসারগণ ইতস্ততঃ লম্ফ-প্রদান করিয়া আরোহিগণের কৌতূহল বৃদ্ধি করিতে লাগিল। ক্রমেই বেলা অধিক হইতে লাগিল, আর প্রকৃতির বিবিধ বৈচিত্র্য দৃষ্টিপথে উপস্থিত হইয়া মনকে সমধিক কৌতূহলাক্রান্ত করিতে লাগিল। কোথায় শৈলশ্রেণীর উপর শৈলশ্রেণী, কোন স্থানে বা অনন্ত শালবন, কোথায় বা তৃণগুল্মবিহীন পার্ব্বত্য ভূভাগ, দুই এক স্থলে বিরলতৃণ সমতল ক্ষেত্রে গো-মেষ-মহিষপ্রভৃতি জন্তুগণ বিচরণ-শীল। রতলাম হইতে স্ত্রীপুরুষে আমরা অনেকগুলি যাত্রী এক গাড়ীতে উঠিয়াছি। স্থানের অনুপাতে আরোহীর সংখ্যা অল্প, সুতরাং কাহারও কোন রূপ অসুবিধা নাই। সকলেই নিজ নিজ অভীষ্ট স্থানে বসিয়া গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন যাপন করিতেছি। মথুরা ও মধ্যপ্রদেশের কতিপয় ভদ্রলোক আমার সহিত গল্পে নিরত আছেন। এমন সময় একটী ষ্টেসনে গাড়ী থামিল। সহযাত্রিগণ বলিলেন ঐ ষ্টেসনের

উত্তরদিকে প্রায় ১৫ ক্রোশের মধ্যে কোন লোকালয় নাই, কেবল শালবন-পরিবৃত পর্ব্বতের উপর পর্ব্বতমালা বিরাজমান। মধ্যাহ্ন প্রায় একটা বাজিয়াছে। সূর্য্যদেব অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় কিরণ-রাশি বর্ষণ করিতেছেন। আমাদের গাড়ী হইতে দুই তিনটী স্ত্রী পুরুষ অবতরণ করিয়া সেই প্রখর সূর্য্য-তাপে দগ্ধ হইতে হইতে পর্ব্বতগাত্রস্থ নামমাত্র পথ অবলম্বন করিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইতে লাগিল। পূর্ব্বেই একখানি বড় ঘেরা মহিষের গাড়ী ষ্টেসনে আসিয়াছিল, উহা হইতে বৃদ্ধ ভৃত্য ও দাসী সহিত সন্তান ক্রোড়ে করিয়া একটী যুবতী গৃহস্থমহিলা আমাদের সম্মুখের বেঞ্চীতে আসিয়া বসিলেন। ঐরূপ বলিষ্ঠা রমণী আমি অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার বর্ণ গৌর বটে কিন্তু হাত পাগুলি হাতীর পায়ের মত ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া। পরিধানে একখানি মোটা লাল শাড়ী। অলঙ্কার বিষয়ে বিভিন্ন স্থানের লোক বিভিন্নরুচি। তাহার গাত্রের কারুকার্য্যহীন আভরণগুলি দেখিয়া মনে হইল, কেবল স্বর্ণ ও রৌপ্যের বড় বড় খণ্ড পিটিয়া অলঙ্কার নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। ঐরূপ গহনার ভার বহনে ক্ষীণপ্রাণা বাঙ্গালী রমণীরা একান্তই অক্ষম। যুবতী গাড়ীতে উঠিয়া অবধি মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিলেন। আমার পক্ষে এ দৃশ্য নূতন নহে। কারণ বাঙ্গলা-দেশের অন্তঃপুরিকারা পুরুষের গাড়ীতে উঠিলে প্রায়ই অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া মুখ ফিরাইয়া থাকেন। কিন্তু যে দেশ দিয়া আমরা যাইতেছি, সে দেশের লোকের পক্ষে উহা একটু বিস্ময়কর বোধ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ আরোহিণী তাঁহার দাসীকে যেন কি বলিলেন। সে বেচারী নিতান্ত বর্ব্বর, কোন কথা না বলিয়া

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাকাইতে লাগিল। তাহার পর, পার্শ্বের অপর একটী স্ত্রীলোক আমাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল "মহারাজ! পাগড়ী মাথায় দিয়া বোসো"। বলা বাহুল্য আমাদের গাড়ীর পুরুষ যাত্রিগণের মধ্যে আমিই কেবল উষ্ণীষশূন্য, সুতরাং আমি উত্তরে বলিলাম, "আমার পাগড়ী নাই"। প্রশ্নকারিণী আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিল না। তাহার পর, নবাগতা যুবতী পুনরায় তাহার কর্ণে কি বলিল। সে আবার জিজ্ঞাসা করিল "তোমার পাগড়ী কি পড়িয়া গিয়াছে"? আমি বলিলাম না, মোটেই ছিল না"। ঐ মেয়ে মানুষটী পুনরায় চটিয়া বলিল "তোমার পাগড়ী কি তুমি বেচিয়া খাইয়াছ"? হিন্দুস্থানীদের মধ্যে পাগড়ী বেচিয়া খাওয়া নাকি একটা গালি। আমি দেখিলাম গতিক ভাল নয়, সুতরাং অতিধীরভাবে বুঝাইয়া বলিলাম "আমরা বাঙ্গালী, আমরা পাগড়ী ব্যবহার করি না"। আমার পার্শ্বস্থ মথুরাবাসী সহযাত্রীটী বলিলেন "মহাশয় এই সকল দেশীয় রাজ্যের বণিক্গণ ঋণদাতা, সুতরাং গ্রাম্য লোকেরা উহাদের আজ্ঞাবহ। সেই জন্য বণিক্বধূদের বড় অহঙ্কার। দেখুন না, আপনি যেন উহাদের খাতক, তাই গাড়ীতে উঠিয়াই আপনার উপর হুকুম চালাইতেছে। নীরবে বসিয়া থাকুন, উহার কথায় কর্ণপাত করিবেন না"। ঐ গাড়ীতে একটী গৈরিকবসন সাধু ছিলেন। তিনি বলিলেন "মহারাজ! বাইজী আপনার ভাল উপদেশই দিতেছেন"। আমি বলিলাম "সাধু মহারাজ! পাগড়ী মাথায় দিলে কোন পুণ্য-সঞ্চয় হয় বলিতে পারেন? তাহা হইলে দিতে পারি। আপনাদের দেশীয় পরিচ্ছদ আপনারা ব্যবহার করেন, আমাদের দেশীয় পরিচ্ছদ

আমরা ব্যবহার করি, উহাতে বিরক্ত হইবার কারণ কি আছে?" সাধু একটু উগ্র হইয়া বলিলেন "তোমরা যখন কোন নিমন্ত্রণে যাও, তখন এই রূপে "নেড়াশিরে "থাক, কুটুম্ব-মহিলারা তোমাদের এই রূপ উগারাশির দেখিয়া লজ্জা পায় না? আমি বলিলাম "না"। তখন সাধু নিতান্ত অশক্ত হইয়া বলিলেন "তোমার যাহা ইচ্ছা কর, ঐরূপ উগারাশিরে বিরাজ কর"। আমি বলিলাম "তথাস্তু"। কিন্তু আমরা দেশীয় পরিচ্ছদের দোহাই দিয়া নিরুষ্ণীষ-মস্তকে থাকি বটে ফলতঃ উষ্ণীষধারণ যে সভ্যতার অঙ্গ তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তাহা না হইলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কথা দূরে থাকুক, এক বাঙ্গলা ব্যতীত ভারতবর্ষের সমুদায় প্রদেশের লোক, উহা ধারণ করিবে কেন? আর আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যখন হিন্দুস্থান ত্যাগ করিয়া আসেন, তখনও উহা ব্যবহার করিতেন। যজ্ঞকালে উষ্ণীষের পরিবর্ত্তে নূতন একখণ্ড বস্ত্রদ্বারা মস্তক আবরণ করাই উহার প্রমাণ।

কিয়ংক্ষণ পরে ভৈরবগড় ষ্টেসনে বাষ্পশকট উপস্থিত হইল। উক্ত ষ্টেসনের কিঞ্চিৎ এদিকে মহীসাগর নামক একটী নদ দেখিলাম। আহা সেই গ্রীষ্ম-দিবসে উহার স্বচ্ছ সলিল-প্রবাহ অমৃতধারার ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। নদটী ষ্টেসনের সংলগ্ন হইলে নিশ্চয়ই অবতরণ করিয়া উহার বিমল জল পান করিতাম। কয়েকটী ষ্টেসন অতিক্রম করিলেই দোহদ ষ্টেসনে গাড়ী পৌঁছিল। দোহদ বড়ই সুরম্য স্থান। ঐ স্থানটী বোধ হয় স্বাস্থ্যকর। তন্মধ্যে অনেক শ্বেতাঙ্গের বাসভবন দৃষ্টিগোচর হইল। পুষ্পোদ্যান পরিবৃত বাংলোগুলি বেশ সুদৃশ্য। অনন্তর বহু নগর প্রান্তর ও শৈলমালা অতিক্রম পূর্ব্বক সায়ংকালের কিছু পূর্ব্বে আনন্দ-

জংসনে পৌঁছিলাম। এই স্থানে বড়োদা-বোম্বাই-সেন্ট্রাল-ইণ্ডিয়া রেলপথের সহিত রতলাম-গোদরাশাখা সম্মিলিত হইয়াছে। এখানে শকট পরিবর্ত্তন করিতে হয়। আমি অনেক সহযাত্রীর সহিত অবতরণ করিলাম। আনন্দ-ষ্টেসনটী কদম্বরুক্ষ-বাবুলাদির স্থানে অবস্থিত। এখানে কতিপয় শাখাপ্রশাখাযুক্ত বৃক্ষ থাকায় স্থানটী বেশ ছায়াময়। এখানকার জল অমৃততুল্য সুপেয়। তজ্জন্য লোকে বহুদূর হইতে পিপাসা হৃদয়ে ধারণ করিয়া এখানে আসিয়া জল পান করে। এখানে বিনা পয়সায় জল পাওয়া যায় না। ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কয়েকটী ব্রাহ্মণ-বালিকা "ব্রাহ্মণাচাপানীয়া" "ব্রাহ্মণাচাপানীয়া" বলিয়া হাঁকিয়া বেড়াইতেছে। জল চাহিলে কক্ষ হইতে নূতন মৃণ্ময় কলস নামাইয়া ভাণ্ড মাপিয়া জল বিক্রয় করিতেছে। এখানকার কলাকন্ (সন্দেশ) ও উৎকৃষ্ট। আমরা কয়েকটী যাত্রী একটী বৃক্ষতলে আশ্রয় লইলাম। উহার অনতিদূরে মিষ্টান্নের দোকান। দেখিতে দেখিতে একটী দরিদ্রবেশা গৌরাঙ্গী ব্রাহ্মণবালিকা ভাণ্ড হস্তে ছুটিয়া আসিল। আমি প্রথম এক ভাণ্ড ক্রয় করিয়া পা ধুইলাম। দ্বিতীয় ভাণ্ড দ্বারা হস্তমুখ প্রক্ষালন করিলাম। পানার্থ তৃতীয় ভাণ্ড গ্রহণ করিলাম। এক সময় তিন পয়সার জল লইতে দেখিয়া বালিকা অবাক্ হইয়া রহিল। বস্তুতঃ জল ক্রয় করিয়া পা ধোয়া এদেশের লোকের সংস্কার-বিরুদ্ধ। ইহারা কদাচিৎ পদ ধৌত করে। জলের দুষ্প্রাপ্যতাই উহার প্রধান কারণ। এখানে দুইটি ইদারা আছে। অতিকষ্টে বহুদূর হইতে জল তুলিতে হয়। জলযোগ শেষ করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলে দিল্লী হইতে বোম্বাই-গামী শকট আসিল। ইহাতে প্রায় পঞ্চা-

ধিক শকট সংযোজিত ছিল। দিল্লী হইতে বোম্বাই অনেক দূরবর্ত্তী। বিশেষতঃ দিবারাত্রির মধ্যে এই ট্রেন্‌টী একবার মাত্র যাতায়াত করে, সুতরাং আরোহি-সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। গাড়ী থামিলে সকলেই প্রায় ষ্টেসনে অবতরণ করিয়া জলপান করিতে লাগিল। এখানে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা গাড়ী অবস্থিতি করে। আমি যে গাড়ীর নিকটে যাই, সেই গাড়ীই আরোহি-পূর্ণ দেখিয়া ফিরিয়া আসি। অবশেষে একটী গাড়ীতে অল্প লোক দেখিয়া উঠিলাম। ঐ গাড়ী খানিতে যোধপুরের কতকগুলি বিদ্যার্থী ছিলেন। তাঁহারা বোম্বাইতে থাকিয়া পড়াশুনা করেন। ঐ বিদ্যার্থীদের মধ্যে এণ্ট্রান্স ক্ল্যাসের ছাত্র হইতে এম্, এ, পাস্‌ওয়ালা পর্য্যন্ত আছেন। গাড়ী ছাড়িলেই তাঁহারা অতিশিষ্টতার সহিত বলিলেন "মহাশয়! আমরা বিদ্যার্থী, যদি কোন বেয়াদবী হয়, মাপ করিবেন।" উত্তরে আমি বলিলাম "আপনারা শিক্ষিত লোক বেয়াদবীর সম্ভাবনা কি আছে?" তাহার পর, যোধপুরী বন্ধুদের প্রহসনের অভিনয় আরম্ভ হইল। দুঃখের বিষয়, বর্ণনা করিয়া সেই প্রহসনের বিষয়টী পাঠকগণকে বুঝাইতে পারিলাম না। তাহাদের সেই পরিচ্ছদ, অঙ্গ-সঞ্চালন, মুখচোখের ভঙ্গী ও সর্ব্বোপরি মারোয়ারী ভাষার সেই অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। এক এক বার সেই কৌতুককর বক্তৃতা শুনিয়া হাঁসিতে হাঁসিতে দম্ বন্ধ হইতে লাগিল। প্রায় রাত্রি বারশ ঘটিকার সময় বাষ্পশকট বড়োদা-ষ্টেসনে পৌঁছিল। আমি যোধপুরী সহযাত্রীদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম। ষ্টেসন হইতে সহর প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত, সুতরাং একাকী অত রাত্রিতে কোথায় যাইব? বড়ো-

দার মহারাজ ষ্টেসনের সন্নিধানে একটী পান্থশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। বৈদেশিক লোকদের উহাই একমাত্র আশ্রয় স্থল। আমি কেবল পান্থশালা অনুসন্ধান করিতেছি, এমন সময় একটী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি তাঁহার নব-পরিণীতা দৌহিত্রীকে শ্বশুরালয় হইতে গৃহে লইয়া যাইতেছেন। তাঁহাকে ও ঐ পান্থশালায় রজনী যাপন করিতে হইবে। আমি তাঁহার সহিত গিয়া রাত্রিতে পান্থশালায় বাস করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

গায়কবাড়-রাজ্য।

প্রাচীন গুর্জ্জর রাজ্যই এখন গায়কবাড়-রাজের শাসনাধীন হইয়া গায়কবাড়-রাজ্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পূর্ব্বকালে অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় গুর্জ্জর একটী অনতিবিস্তৃত জনপদ ছিল। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হিউএন্‌সঙ্‌ ভারত ভ্রমণ কালে এই দেশে আসিয়াছিলেন। সে সময় এই দেশ একটী অজবয়স্ক ক্ষত্রিয় রাজার শাসনে ছিল। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে চাপোৎকট-বংশীয় বনরাজ এই রাজ্য শাসন করেন। অনহিলপত্তনে তাঁহার রাজধানী ছিল। ৯৯৮ সংবতে গুর্জ্জর প্রদেশ চৌলুক্য-রাজগণের হস্তগত হয়। ১৩৬২ বিক্রম-সংবতে

বাঘেলাবংশীয় বিশালদেব গুর্জ্জরের অধিকার লাভ করেন। তাহার পর, দিল্লীর মুসলমান্ সম্রাট্ অল্লাবদীন এই রাজ্য অধিকার করেন। ঐ সময়েই গুর্জ্জর রাজ্যের সীমা বিস্তৃত হয়। এখন ইহার উত্তরে রাজপুতানা, দক্ষিণে কোঙ্কণপ্রদেশ, পূর্ব্বে বিন্ধ্যপর্ব্বতমালা ও পশ্চিমে সমুদ্র। এই চতুঃসীমান্তর্ব্বর্ত্তী দেশই এখন গুর্জ্জর বা গুজরাট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। মহারাষ্ট্র প্রদেশে মরাঠা নামক একটী জাতির বাস আছে, ইহাদের সংখ্যা খুব অধিক। ইহাদের মধ্যে যাহারা আপনাদিগকে "কুলবন্ত মরাঠে" অর্থাৎ কুলীন মরাঠা বলিয়া পরিচিত করে, তাহারা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিয়া থাকে। পুরাতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে ইহাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। ইহারা খর্ব্বকায়, বলিষ্ঠ, সমরপ্রিয়, বুদ্ধিমান্ ও স্বাধীনতা-প্রয়াসী। শ্রদ্ধা, চিত্তের দৃঢ়তা, শ্রমশক্তি, আতিথেয়তা, কলহপ্রিয়তা-প্রভৃতি মরাঠা-চরিত্রের বিশেষত্ব। ইহারা উপবীত ধারণ করে এবং বাল্য-বিবাহের পক্ষপাতী ও বিধবা-বিবাহের বিরোধী। শিন্দোদিয়ে, পওয়ার (পরমার), ভোঁশলে, শিন্দে, শালুকে, চৌহান, মোরে, গায়কবাড় প্রভৃতি ৯৬টী কুল মরাঠা জাতির মধ্যে বংশমর্য্যাদায় শ্রেষ্ঠ। এতদ্ভিন্ন যে সকল মরাঠা কৃষিজীবী ও ব্রাত্যভাবাপন্ন, তাহারা কুণ্‌বী নামে পরিচিত। কুণ্‌বীরা যৌবনপ্রাপ্তি না ঘটিলে কন্যার বিবাহ দেয় না এবং নিম্নশ্রেণীর কুণ্‌বীরা বিধবা-বিবাহ করিয়া থাকে। প্রথমোক্ত মরাঠা ক্ষত্রিয়েরা কুণ্‌বীমরাঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করে কিন্তু কোন কুণ্‌বীমরাঠাকে কন্যা দান করে না। কুণ্‌বীমরাঠারা ধনবান্ ও ক্ষমতাশালী হইলে "কুলবন্ত মরাঠে" বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করিয়া থাকে।

বড়োদা-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দমাজী গায়কবাড় বালাপুরের প্রথমোক্ত মরাঠা কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম মহারাষ্ট্ররাজ সাহুর সৈন্যবিভাগে কার্য্য গ্রহণ করেন। বালাপুরের যুদ্ধে অত্যন্ত বীরত্ব প্রকাশ করায় সাহু কর্তৃক তিনি সহকারি-সেনাপতির পদে নিযুক্ত হন এবং "সম্‌সের বাহাদুর" উপাধি লাভ করেন। কিছু দিন পরে দমাজীর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পিলাজী ঐ পদ লাভ করেন। তাহার পর, খণ্ডেরাওর পুত্র ত্র্যম্বকরাও ধারাবাই ও পিলাজীগায়কবাড় উভয়ে অন্যান্য মহারাষ্ট্র সামন্তদিগের সহিত মিলিত হইয়া পেশবার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে বড়োদানগরীর নিকট একটী যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে ত্র্যম্বকরাও নিহত হন। পেশবা অবস্থা বিবেচনায় ত্র্যম্বকরাওর শিশুপুত্র যশোবন্তরাওকে সেনাপতিপদে নিযুক্ত করেন, এবং পিলাজীগায়ক-বাড়কে পূর্ব্বের ন্যায় সহকারিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাকে "সেনা-খাস্‌-খেল্‌" উপাধি প্রদান করেন। পূর্ব্বোক্ত যশোবন্তরাওর প্রতি গুজরাটের কার্য্যভার অর্পিত হয়, পিলাজী তাঁহার সহকারী থাকেন। ইহাদের সহিত কথা ছিল, ইহারা গুজরাটের রাজস্বের অর্দ্ধাংশ পেশবাকে প্রদান করিবেন। যে সময় দিল্লীর সম্রাট্‌ ঐ প্রদেশের কয়েকটী রাজ্যের কর পেশবাকে প্রদান করিতেন, সেই সময় কি কারণে তিনি পিলাজীগায়কবাড়কে কর্ম্মচ্যুত করিয়া যোধপুররাজ অভয়সিংহকে তৎপদে নিযুক্ত করেন। ইহাতে পিলাজী ক্রুদ্ধ হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন এবং তাঁহার সেনাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অনেক স্থান অধিকার করিয়া লয়েন। অভয়সিংহ সম্মুখযুদ্ধে পিলাজীকে পরাভূত করিতে না পারিয়া ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে গোপনে দস্যুদ্বারা তাঁহার

প্রাণ-বিনাশ করেন। তাঁহার পুত্র ২য় দমাজী, গায়কবাড়-পদে অভিষিক্ত হন। এ দিকে যশোবন্তরাও বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেও কার্য্য-ভার বহনে অসমর্থ হওয়ায় গায়কবাড়বংশের উপর গুজরাটের কার্য্যভার অর্পিত হয়। ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে পিলাজীর ভ্রাতা মহাজী বড়োদা নগরী অধিকার করেন। সেই অবধি বড়োদা নগরী গায়কবাড়-বংশের রাজধানী হইয়া আসিতেছে। তারাবাই যখন আপনার নাপ্তি সেতারার রাজাকে বাজীরাওপেশবার অধীনতা হইতে মুক্ত করেন, তখন দমাজীগায়ক-বাড় তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। তজ্জন্য পেশবা, বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া বন্দীকৃত করেন। শেষে দমাজী গুজরাটের বাঁকী রাজস্ব ১৫ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। কাঠিবাড় প্রদেশে পিলাজীগায়কবাড় যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, পর বৎসর বাজীরাও-পেশবা উহার কিয়দংশ গ্রহণ করেন। ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই জানুয়ারী আহ্মদশাহ আবদালির সহিত পাণিপথে যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে মহারাষ্ট্র-পক্ষে দমাজী নিজ সৈন্য লইয়া যুদ্ধে বিলক্ষণ বীরত্ব প্রকাশ করেন। এই যুদ্ধে অনেক মহারাষ্ট্র-বীর ধরাশায়ী হইয়াছিলেন। দমাজী নিহতাবশিষ্ট অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। সেই অবধি তিনি যুদ্ধ বিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ রাজ্য-রক্ষায় মনোযোগী হন। তিনি দুই তিনটী স্থান ব্যতীত সমস্ত গুজরাট রাজ্যে প্রভুত্ব স্থাপন করেন এবং ঈদরের রাঠোর-বংশীয় রাজাদিগকে কর দানে বাধ্য করেন। এই রূপে দমাজী একজন পরাক্রান্ত ভূপতি হইয়া উঠেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দমাজীর মৃত্যু হয়। দমাজী-

গায়কবাড়ের তিন পুত্র ১ম সভাজী, ২য় ফত্তেসিংহ ৩য় মাণিকজী। ফত্তেসিংহ, নির্ব্বোধ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সভাজীকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজে রাজ্য করিতে আরম্ভ করেন। শেষে নানা ঘটনার পর ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ শে জানুয়ারী ফত্তেসিংহের সহিত ইংরেজদিগের একটী সন্ধি হয়। পরে সে সন্ধি বাতিল হইয়া ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় সন্ধি হয়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে ডিসেম্বর ফত্তেসিংহের মৃত্যু হয়। তাহার পর, দমাজীর তৃতীয় পুত্র মাণিকজী পূর্ব্বোক্ত সভাজীকে সিংহাসনে রাখিয়া নিজে রাজ্য করেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে দমাজীর দ্বিতীয় পুত্র (যিনি প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত সুতরাং সিংহাসন অধিকারের জন্য পেশবার শরণাগত হন) গোবিন্দরাও সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দরাওর মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আনন্দরাও সিংহাসন লাভ করেন। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর আনন্দরাওর মৃত্যু হইলে তাঁহার দুই পুত্র সত্ত্বেও কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিবাজীরাও সিংহাসনে আরোহণ করেন। আনন্দরাও স্বভাবতঃ কিছু নির্ব্বোধ ছিলেন বলিয়া ইংরেজগবর্ণমেণ্ট সকল বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন। কিন্তু শিবজীরাও বুদ্ধিমান্ সুতরাং তাঁহার সময়ে হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয় নাই। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গণপৎরাও তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮৫৬ খৃীষ্টাব্দের ১৯শে নবেম্বর গণপৎরাও নিঃসন্তান-অবস্থায় পরলোক গমন করিলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা খণ্ডেরাওগায়কবাড় বরোদা-রাজ্যের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কিছু দিন পরেই রাজ্যে সিপাহীবিদ্রোহ আরম্ভ হয়, সেই সময় খণ্ডেরাও যথাশক্তি ইংরেজগবর্ণমেণ্টের সাহায্য

করেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১১ই মার্চ্চ ইংরাজগবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে যে সনন্দ দেন, তাহাতে গায়কবাড় রাজবংশের পুত্র অভাবে দত্তক-গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। এতদ্ভিন্ন ইংরেজ-গভর্ণমেণ্ট খাণ্ডেরাওকে G. C. S. I. উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ২৮ শে নবেম্বর খণ্ডেরাওর মৃত্যু হয় এবং তাঁহার ভ্রাতা মলহররাও গায়কবাড় বড়োদার সিংহাসন প্রাপ্ত হন। খণ্ডেরাওর বিধবা পত্নী যমুনাবাই তখন গর্ভবতী ছিলেন। ইংরেজ-গভর্ণমেণ্ট মহলাররাওকে বলিয়া রাখেন, যদি যমুনাবাইয়ের গর্ভে পুত্র সন্তান জন্মে, তবে সেই রাজ্য পাইবে। কয়েক মাস পরে যমুনাবাইয়ের একটী কন্যা সন্তান হওয়ায় মলরহরাও নিষ্কণ্টকে রাজ্য করিতে থাকেন। পূর্ব্বে মলহররাও খণ্ডেরাওর প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। খণ্ডেরাও যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন তাঁহাকে বাহির হইতে দেওয়া হয় নাই। খণ্ডেরাওর মৃত্যুতে তিনি একেবারে কারাগার হইতে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এরূপ লোক যে ভাল কার্য্য করিবে, কেহই আশা করে নাই। বস্তুতঃও তাহাই ঘটিয়াছিল, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে প্রজারা মলহররাওর শাসনে বিরক্ত হইয়া ইংরেজ-গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করে। তদনুসারে মলহররাওর রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত অনুসন্ধানের নিমিত্ত একটী কমিসন্ বসে। তাৎকালীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক উক্ত কমিশনের মন্তব্য পাঠ করিয়া ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহাকে শাসনপ্রণালীর সংস্কারের জন্য সময় দেন। তিনি ঐ সময়ের মধ্যে রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা ত করিতে পারিলেনই না অধিকন্তু তাঁহার বিরুদ্ধে ইংরেজ রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টা করি-

রাছেন বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হইল। লর্ড নর্থব্রুক এইরূপ একটী ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, এই ঘটনায় গায়কবাড়ের প্রতি সন্দেহ, অতএব তাহার অনুসন্ধানের জন্য আদালত বসিবে। যত দিন তিনি নির্দ্দোষ বলিয়া প্রমাণিত না হন, ততদিন ইংরেজগভর্ণমেণ্ট স্বয়ংই রাজ্যভার গ্রহণ করিবেন। ইতিমধ্যে মলহররাও নিজের দোষ ক্ষালনের নিমিত্ত আদালতে প্রমাণাদি উপস্থিত করিবেন।

কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধানবিচারপতি, গোয়ালিয়রের মহারাজ, জয়পুরের মহারাজ, মহীশূরের চিপ্‌কমিসনার, গোয়ালিয়রের মন্ত্রী দিনকররাও এবং পঞ্জাবের কমিসনার্ এই ছয় জনে বসিয়া বিচার করেন। বিচারকগণ মলহররাওর দোষ সম্বন্ধে একমত হইতে পারেন নাই। তিন জন তাঁহাকে দোষী ও তিন জন নির্দ্দোষ সাব্যস্ত করেন। কিন্তু ইতি-পূর্ব্বে তিনি তাঁহার ভ্রাতা খাণ্ডেরাওর প্রাণ বিনাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংরেজগভর্ণমেণ্ট তাঁহার সেই পূর্ব্বাপরাধ স্মরণ করিয়া রাজকার্য্য পরিচালনের অনুপযোগী বিবেচনায় ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২২শে এপ্রেল তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া মান্দ্রাজে প্রেরণ করেন। খাণ্ডেরাও সিপাহী-বিদ্রোহের সময় গভর্ণমেণ্টের সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার সম্মানের নিমিত্ত তৎপত্নী যমুনাবাইকে একটী দত্তক গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়। তদনুসারে তিনি পিলাজীরাওগায়কবাড়ের পুত্র দমাজীগায়ক-বাড়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রতাপরাওর বংশীয় সয়াজীরাওকে দত্তক মনোনীত করিলে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে মে সয়াজীগায়কবাড় দ্বাদশ বৎসর বয়সে বড়োদার সিংহাসনে আরোহণ করেন। যে শিশু পূর্ব্বে গ্রাম্য বালকদের সহিত খেলা করিয়া বেড়াইত, কে জানিত তাহার

ভাগ্যে এই সুবিস্তৃত রাজ্যের সিংহাসন লাভ হইবে? ঐ সময় হোলকারের তদানীন্তন মন্ত্রী সার্টি মাধবরাও K. C. S. I. মহোদয় মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়া আসেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নবেম্বর যখন প্রিন্স অব্ ওয়েল্স (ভূতপূর্ব্ব যুবরাজ এবং বর্ত্তমান সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড) বোম্বাই নগরে অর্ণবযান হইতে অবতরণ করেন, তখন বালক সয়াজীগায়কবাড় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। ১৯শে নবেম্বর যুবরাজ (প্রিন্স অব্ ওয়েল্স) বড়োদায় আগমন করিয়া গায়কবাড়ের আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। যুবরাজের সহচরগণ বালক সয়াজীর গাম্ভীর্য্য ও রাজোচিত ব্যবহার সন্দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ উপলক্ষে দিল্লীতে যে দরবার হয়, উহাতে সয়াজীগায়কবাড় উপস্থিত ছিলেন। তিনি উক্ত দরবার হইতে "ফরজন্দ ইখাস্ দৌলৎ ইংলিসিয়া" উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে যমুনাবাইকে ভারতমুকুট বা C. I. E. উপাধি প্রদত্ত হয়। His Highness ফরজন্দ ইখাসুই দৌলৎ ইংলিসিয়া মহারাজাধিরাজ রাজরাজেশ্বর স্যার সয়াজীরাও গায়কবাড় সেনাখাস্‌খেল্ সম্সরবাহাদুর G. C. S. I. মহোদয়ই এখন বড়োদার রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মিত্ররাজগণের মধ্যে ইনি এক জন সুশিক্ষিত নৃপতি। ইনি ইংরেজ-রাজ্যে আগমন করিলে ইঁহার সম্মানের নিমিত্ত ২১টী তোপ ছোড়া হয়। কাঠিয়াবাড় প্রদেশস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের অনেক রাজপুত রাজা বড়োদার মহারাজের করদ। তাঁহারা স্ব স্ব রাজ্যের প্রজাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা,

তাহাতে অন্যের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। কেবল বার্ষিক নির্দিষ্ট কর গায়কবাড়রাজকে প্রদান করেন। পূর্ব্বে রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ কর আদায় করিতে যাইতেন, তাহাতে অনেক হাঙ্গামা হইত। এখন তাঁহারা নিয়মিত কর ইংরেজ-গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করেন। মহারাজ, ইংরেজ-গভর্ণমেণ্ট হইতে উক্ত কর গ্রহণ করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে বড়োদায় মহারাজের বার্ষিক আয় ছিল ১৬৭৭৩৪৮০ (এককোটি সাতষট্টি লক্ষ তেয়াত্তর হাজার চারিশত আশী টাকা) এখন উহা প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে।

মহারাজ গায়কবাড়ের চারিটী সুদৃঢ় দুর্গ আছে। তন্মধ্যে শোণগড় ও শালের নামধের দুইটী পার্ব্বত্য দুর্গই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শোণগড় দুর্গ, সুরাটের ৭৩ মাইল পূর্ব্বে, তাপ্তী নদীর কয়েক মাইল দক্ষিণে নৌসরী জেলার মধ্যে অবস্থিত। পূর্ব্বে এখানে মহারাজ গায়কবাড়ের রাজধানী ছিল। এই দুর্গটী অতিশয় দুর্ভেদ্য। তাপ্তী নদীর তীরস্থ ওয়াজপুরের দুর্গ এবং মলহর-দুর্গও অল্পশক্তিসম্পন্ন নহে। এই চারিটী দুর্গই এখন সুশিক্ষিত সৈন্যগণ দ্বারা সংরক্ষিত হইয়া থাকে। মহারাজের সৈন্যগণের মধ্যে দুইটী আগ্নেয়াস্ত্রধারী সেনাদল আছে। উহার প্রত্যেকদলে ৪২টী কামান, ১৫৪ জন বন্দুকধারী সৈন্য বিদ্যমান। উক্ত কামানগুলির দুইটী সুবর্ণ ও দুইটী রৌপ্য দ্বারা নির্ম্মিত। এতদ্ভিন্ন ৪৪৭ জন নিয়মিত অশ্বারোহী সৈন্য আছে। নিয়মিত পদাতিক সৈন্যের যে ছয়টী দল আছে। উহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৩০১৬ তিন হাজার যোল জন লোক অবস্থান করে। ইহাদের দুইটী দল দেশীয় সৈন্যের ও অপর চারিটী য়ুরোপীয় সৈন্য দ্বারা গঠিত

হইয়াছে। ঐ সকল নিয়মিত সৈন্য ব্যতীত কতকগুলি অনিয়মিত সৈন্য আছে। যে কোন সময়ে আহ্বান করিলেই তাহারা যুদ্ধ কার্য্যে যোগদান করিতে পারে। উহাদের সংখ্যা ৬২৩৭ তন্মধ্যে অশ্বারোহী ৪৪১০ ও অবশিষ্ট পদাতি ১৮২৭। নিয়মিত সৈন্য পোষণে বার্ষিক ৭॥০ লক্ষ টাকা ও অনিয়মিত সৈন্যপোষণে বার্ষিক ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে। বড়োদায় মহারাজের একটী মন্ত্রিসভা আছে। উহাতে কতিপয় সদস্য আছেন। এক এক বিভাগের কার্য্য পরিদর্শনের জন্য এক এক সদস্যের উপর ভার ন্যস্ত আছে। এতদ্ভিন্ন শান্তিরক্ষাবিভাগ, রাজস্ববিভাগ, বিচার-বিভাগ, শিক্ষাবিভাগ, পূর্ত্তবিভাগ, বাণিজ্যবিভাগ প্রভৃতি বিভিন্ন কার্য্যবিভাগ আছে। প্রত্যেক বিভাগের সেক্রেটরি ও বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী আছেন। বড়োদা নগরীতে একটী উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণ আছে। সাধারণ লোকে উহাকে বরিষ্ঠ-আদালত বা হাইকোর্ট বলিয়া থাকে। উক্ত হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বা চিপ্-জষ্টিসের বেতন মাসিক ২২৫০ টাকা। উক্ত হাইকোর্টের দ্বিতীয় জজের বেতন ১৮০০ টাকা। এতদ্ভিন্ন ৪জন বিভাগীয় জজ আছেন। বড়োদা নগরীর জন্য পৃথক্ এক জন জজ্, এক জন সহযোগী জজ, একজন সহকারী জজ আছেন। হাইকোর্টের চিপ্‌জষ্টিস্ বা প্রধান বিচারপতি অপরাধীকে ১৪ বৎসরের জন্য কারাগৃহে প্রেরণ, ত্রিশ বেত্রাঘাত ও যে কোন সংখ্যক অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারেন। ইহার অতিরিক্ত কোন দণ্ড দিতে হইলে মহারাজের আদেশ প্রাপ্তির প্রয়োজন হয়। বিভাগীয় জজগণ অপরাধীকে ৭ বৎসরের জন্য কারাগৃহে প্রেরণ ও ত্রিশ বেত্রাঘাতের আদেশ করিতে পারেন।

বড়োদা নগরীতে একটি "সর্দ্দারকোট" বা বিশেষ-বিচারালয় আছে। উহার জজ্ রাজবংশীয়গণের অথবা রাজবংশ-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ব্যক্তিগণের অভিযোগের মীমাংসা করেন। গায়ক-বাড়-রাজ্য কয়েকটী জেলায় বিভক্ত, প্রত্যেক জেলায় জজ্ ও মুন্সেফ আছেন। সর্ব্বশুদ্ধ মুন্সেফের সংখ্যা ১৫টী। ইহারা ৪৫০০ টাকা পর্য্যন্ত দাবীর মোকদ্দামার বিচার করিতে পারেন। বড়োদা নগরীর উপকণ্ঠে এক জন ইংরেজ-রেসিডেণ্ট বাস করেন। রাজ্য-সংক্রান্ত কোন গুরুতর বিষয় উপস্থিত হইলে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতে হয়।

গায়কবাড়-রাজ্যের অধিবাসীর সংখ্যা ১৮৮১খ্রীষ্টাব্দে ২১৮৫০০৫ ছিল। তন্মধ্যে হিন্দু ১৯৫৪৩৯০ মুসলমান্ ১৭৪৯৮০ জৈন ৪৬৭১৮ খৃষ্টান ৭৭১ পার্শী ৮১১৮ অন্যান্য ২৮। এই রাজ্যের ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বরা সুতরাং কৃষিকার্য্যের বিশেষ উপযোগিনী। তজ্জন্য এদেশে নানা জাতীয় কৃষক দেখিতে পাওয়া যায়। বাহ্লেলানামক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে, উহারা স্বহস্তে কৃষি কার্য্য করে। তদ্ভিন্ন ঐ দেশীয় রাজপুত, কুণ্‌বী, কোলি, ভীল প্রভৃতি জাতিরও জীবিকার প্রধান উপায় কৃষি। এতক্ষণ গায়কবাড়-রাজ্যের ইতিবৃত্ত প্রকটনে অনেক সময় নষ্ট করিয়াছি, এই বার প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক।

বড়োদা নগরী।

সংস্কৃত-পাঠশালা। ১৮ই বৈশাখ প্রাতঃকালে একটী ভারবাহীর সহিত বড়োদা নগরীতে উপস্থিত হইলাম। পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলাম, ঐ নগরে বাঙ্গালী নাই। আমি কোথায় যাইব, চিন্তা করিতেছি, এমন সময় রাস্তায় রাজবাটীর পুরাতন দপ্তরের এক জন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু আমি উহার এক বর্ণও বুঝিলাম না, সুতরাং তাঁহার ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র ও মস্তকে গোষ্পদপরিমাণ শিখা দেখিয়া অসঙ্কোচে সংস্কৃত-ভাষায় আলাপ আরম্ভ করিলাম। কর্ম্মচারীটী অর্দ্ধ-মরাঠী ও অর্দ্ধ-সংস্কৃতে বলিলেন "আমি ব্রাহ্মণ বটে কিন্তু সংস্কৃত-ভাষা বিশেষ রূপ অবগত নহি। আপনি আমার সঙ্গে আসুন"। তাহার পর, তিনি আমাকে লইয়া মহারাজের সংস্কৃতপাঠশালার অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজারামকাশীনাথ শাস্ত্রী * মহাশয়ের নিকট পৌঁছাইয়া দিয়া স্বকার্য্যে গমন করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় আমাকে অল্পবয়স্ক ও বহুদূর হইতে সমাগত দেখিয়া অতিযত্নের সহিত গ্রহণ করিলেন। অনেক ক্ষণ সংস্কৃত-ভাষায় কথোপকথন হইল। তিনি উত্তরোত্তর আমার প্রতি অধিক স্নেহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। আমি প্রাতঃকৃত্য ও হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিলে

---

* সমুদয় মহারাষ্ট্রীয় জাতির মধ্যে নিজ নামের সহিত পিতৃনাম যোগ করিবার প্রথা আছে। ইহারা নিজ নামের পর পিতৃনাম যুক্ত করিয়া নাম লেখে। উপরি উক্ত শাস্ত্রীর নাম রাজারাম, কাশীনাথ পিতার নাম শাস্ত্রী উপাধি। সমুদয় মিলিয়া রাজারাম কাশীনাথ শাস্ত্রী হইয়াছে।

মস্তকে দিবার জন্য একবিন্দু ঘৃত আনাইয়া দিলেন। কারণ এদেশীয় ব্রাহ্মণেরা তৈল ব্যবহার করেন না। আমি ঘৃতবিন্দু ব্রহ্মরন্ধ্রে টিপিয়া পাঠশালার অঙ্গনে কলের জলে স্নান করিলাম। তাহার পর, বস্ত্র পরিবর্ত্তনান্তে চন্দন গ্রহণপূর্ব্বক দেবমন্দিরের বারান্দায় নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়া সন্ধ্যা পূজা শেষ করিলাম। তাহার পর, অধ্যক্ষ মহাশয় অধ্যাপনা প্রদর্শনের জন্য আমাকে ডাকিলেন। আমি তাঁহার সহিত ঘুরিয়া প্রত্যেক অধ্যাপকের অধ্যাপনা দেখিলাম। আমি যে পাঠশালার কথা বলিতেছি ইহাই বড়োদা নগরীর প্রধান সংস্কৃতপাঠশালা। এই বাড়ীটী দোতলা চক্‌মিলান। দক্ষিণদ্বারী মণ্ডপে অনেকগুলি দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। তন্মধ্যে শিবলিঙ্গ ও পাষাণময় বৃষভের সংখ্যাই অধিক। অপর তিন দিকের দোতলায় ও একতলায় অধ্যাপনার স্থান। এক একটী গৃহে সতরঞ্চের মধ্যভাগে একটী ক্ষুদ্র গালিচায় অধ্যাপক উপবিষ্ট আছেন, চতুর্দ্দিকে মণ্ডলী করিয়া বসিয়া ছাত্রগণ তাঁহার নিকট পাঠ গ্রহণ করিতেছে। ইহাদের কেহ বেদ, কেহ ব্যাকরণ, কেহ ন্যায়, কেহ মীমাংসা, কেহ সাংখ্য, কেহ বেদান্ত, কেহ জ্যোতিষ পড়াইতেছেন। অধ্যাপকের সংখ্যা প্রায় ৫০ হইবে। ইহার মধ্যে এক জন ইংরাজী-সাহিত্যের অধ্যাপক আছেন। অন্যান্য অধ্যাপকের ন্যায় তিনিও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ও শিখাধারী। উক্ত ইংরেজী-অধ্যাপক স্থাবর পদার্থের ন্যায় এক গৃহে বসিয়া আছেন, দৈনিক কার্য্য তালিকা অনুসারে সমপাঠী কতকগুলি করিয়া ছাত্র আসিয়া তাঁহার নিকট হইতে ইংরাজী পড়িয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান মহারাজের ইচ্ছা যে, প্রত্যেক সংস্কৃত-বিদ্যার্থী ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করে। তিনি

বলেন "ইংরেজী ভাষায় অভিজ্ঞতা ব্যতীত সংস্কৃত বিদ্যার উচ্চভাব অপরকে হৃদয়ঙ্গম করাইবার ক্ষমতা জন্মে না"। তজ্জন্য তিনি কয়েক বৎসর হইতে উক্ত নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার আদেশ দিয়াছেন। বড়োদা নগরীতে এই রাজকীয় সংস্কৃতপাঠশালা ভিন্ন আরও কয়েকটী পাঠশালা আছে। আর গায়কবাড়-রাজ্যের কতকগুলি গ্রামেও সংস্কৃত-পাঠশালা আছে। প্রত্যেক বৎসর শ্রাবণ মাসে বড়োদা নগরীতে নানা শাস্ত্রের পরীক্ষা গৃহীত হয়। উহার প্রণালী অতিসুন্দর। বহুদূরস্থ প্রধান প্রধান অধ্যাপক উক্ত পরীক্ষার পরীক্ষক থাকেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব নরপতিদিগের অধিকার কালে পরীক্ষোত্তীর্ণ বিদ্যার্থী ও তাহাদের অধ্যাপকগণকে প্রচুর অর্থ পুরস্কার ও বৃত্তিরূপে প্রদত্ত হইত। এখনও দেওয়া হয়, তবে পরিমাণে অল্প। কারণ বর্ত্তমান মহারাজের ইংরেজী শিক্ষা-বিস্তার ও শিল্পোন্নতির প্রতিই অনুরাগ অধিক। অধ্যাপনা সন্দর্শন করিয়া উপরে অধ্যক্ষ মহোদয়ের ঘরে গিয়া বসিলাম। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত রাজারামকাশীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় নানাশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। বিশেষতঃ দর্শন-শাস্ত্রে ইহার প্রগাঢ় অধিকার। শাস্ত্রী মহাশয়ের কয়েকটী কার্য্য করিতে হয়। প্রথম ইনি রাজকীয় সংস্কৃত-পাঠশালার ন্যায়দর্শনের অধ্যাপক এবং উক্ত পাঠশালার অধ্যক্ষ (Principal) তদ্ভিন্ন বড়োদা রাজ্যের সংস্কৃত শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা (Director of Sanscrit Academies Baroda.)

মঠে অবস্থিতি। যেই ১০টা বাজিল, অমনি বিদ্যার্থিগণ কলরব করিতে করিতে গৃহাভিমুখে ছুটিল। পূর্ব্বেই আমার অবস্থিতির স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। একটী নব্য অধ্যাপক আসিয়া

আমাকে ডাকিলেন। আমি একটী ভারবাহীর মস্তকে ব্যাগটি দিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলাম। গমন কালে অধ্যক্ষ শাস্ত্রী মহাশয় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন "যে কয়দিন বড়োদায় থাকিবে, প্রত্যহ যেন অন্ততঃ এক বার আমার সহিত সাক্ষাৎ হয়"। আমি বিনীত ভাবে তাঁহার অঙ্গীকার পালনে স্বীকৃত হইয়া প্রায় অৰ্দ্ধ মাইল দূরে এক শিবালয়ে উপনীত হইল্যম। গায়কবাড়-রাজ্যে ও বড়োদা নগরীতে বহুসংখ্যক দেবমন্দির ও মঠ আছে। আমি যে মন্দিরে উপস্থিত হইলাম, ঐ মন্দিরটী তত বড় নহে। উহার রাজদত্ত ভূমির আয় বার্ষিক তিন সহস্র টাকা মাত্র। যাঁহার সহিত আমি মঠে গমন করিলাম, তাঁহার নাম ছোটু শাস্ত্রী। তিনিই এখন মঠের অধিকারী ও সংস্কৃত-পাঠশালার একজন অধ্যাপক। পূর্ব্বোক্ত রাজদত্ত ভূমির আয় হইতে দেবার্চ্চনা ও অতিথিসেবা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য মঠাধিকারী এই দূরদেশাগত আগন্তুকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই মঠটী রাজপথ অপেক্ষা বহু উচ্চ ভূমির উপরি ভাগে অবস্থিত। পশ্চিম-দ্বারী মন্দিরে শিবলিঙ্গ ও কতিপয় দেবমূর্ত্তি আছেন। পূর্ব্বদ্বারী দোতলায় মঠাধিকারী সপরিবারে অবস্থান করেন। উত্তরদ্বারী গৃহটী অতিথিগণের অবস্থানের জন্য নির্দ্দিষ্ট এবং মধ্যভাগে প্রশস্ত নাটমন্দির। দক্ষিণ দিকে কোন গৃহ নাই, কিন্তু ঐ সমতল উন্নত ভূভাগ অপরাহ্নে উপবেশনের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। উহার এক পার্শ্বে জলের কল ও অপর পার্শ্বে মনোরম মাধবী-কুঞ্জ ও অন্যান্য পুষ্পিত বৃক্ষশ্রেণী শোভা পাইতেছে। এই মঠের অধিকারী উপরি উক্ত অধ্যাপক দেশস্থ-ব্রাহ্মণ। আর একটী বেদবিৎ কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ ঐ মঠে অবস্থান করেন। এ দেশে আহারের

পূর্ব্বে কার্পাসসূত্র-নির্ম্মিত বসন পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষৌম বসন পরিধানের নিয়ম। বলা বাহুল্য আমি সাদরে উক্ত পবিত্র-রীতির অনুসরণ করিলাম। আহারান্তে ঐ দিন আর কোথাও বাহির হইলাম না, কারণ নিয়ত রেলপথ ভ্রমণে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম।

কথকতা। ১৯ শে বৈশাখ অপরাহ্ন ২টার সময় পূর্ব্বোক্ত রাজারাম শাস্ত্রী মহাশয়ের বাসায় গমন করিলাম। আমি যে পল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলাম, শাস্ত্রী মহাশয়ও সেই পল্লীস্থ কোন একটী বৃহৎ মঠে অবস্থান করেন। মহারাষ্ট্র প্রদেশে কথকগণ হরিদাস নামে আখ্যাত। একজন হরিদাস ঐ দেবালয়ের প্রশস্ত নাটমন্দিরে পুরাণব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত আছেন। প্রায় দুই শত পুরসুন্দরী প্রফুল্ল পদ্মরাজির ন্যায় হরিদাস মহাশয়কে ঘিরিয়া বসিয়া পুরাণব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেছেন। মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রমহিলারা সকলেই অল্প বিস্তর লেখা পড়া জানেন। ইঁহাদের মধ্যে রীতিমত বিদুষী রমণীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। একটী অল্পবয়স্কা শিক্ষিতা মহিলা হরিদাস মহাশয়ের বর্ণিত পুরাণকথার মধ্যে একটী প্রশ্ন করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় কৌতূহলী হইয়া নীরবে আমাদিগকে ঐ বিতর্ক শুনিতে বলিলেন। আমরা সোৎসুকচিত্তে অনেক ক্ষণ পৌরাণিক বিচার শুনিলাম। হরিদাস মহাশয় বহুদর্শিতা প্রকটনের জন্যই হউক, অথবা ভ্রমক্রমেই হউক, এক যুগের ঘটনার মধ্যে পরবর্ত্তী যুগের ঘটনার গোঁজা মিল দিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু কোন সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া শেষে আমতা আমতা করিতে লাগিলেন অপরা বিদুষী অগ্রসর হইয়া ঐতিহাসিক সমস্যার মীমাংসা করিয়া

দিলে কুলবধূদের মধ্যে একটী হাসির তরঙ্গ বহিয়া গেল। পুনরায় হরিদাস মহাশয়ের যথাপূর্ব্ব পুরাণ-ব্যাখ্যা চলিতে লাগিল। তাহার পর, শাস্ত্রী মহাশয় বড়োদায় কিছুকাল থাকিয়া আমাকে পরীক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন এবং বলিলেন উহাতে যথেষ্ট পুরস্কার পাওয়া যায়। আরও বলিলেন "এক জন পরীক্ষার্থী বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষা দিতে পারে এবং তিন চারিটী বিষয়ে উত্তীর্ণ হইতে পারিলে পারিতোষিকের পরিমাণ যথেষ্ট হয়।" শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত বড়োদা নগরীতে অবস্থান করা আমার পক্ষে অসম্ভব জানিয়া শেষে তিনি আমাকে পুণা নগরীতে পরীক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় বলিলেন "বঙ্গদেশে যেমন নবদ্বীপ, আর্য্যাবর্ত্তে যেমন কাশী, দক্ষিণাপথে সেই রূপ পুণা একটী বিদ্বজ্জন-সমাজ। অতএব উক্ত স্থানে পরীক্ষা দিবার জন্য চেষ্টা করা তোমার আবশ্যক। আমি তাঁহার আদেশ পালন করিতে যথাশক্তি চেষ্টা করিব বলিলে, তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন। আমি আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথের অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিকে দেখিয়াছি। তাঁহাদের মধ্যে রাজারামকাশীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ন্যায় উদারচিত্ত ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। শাস্ত্রী মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় আমাকে একখানি প্রশংসাপত্র *,

* বঙ্গদেশান্তর্গত-নবদ্বীপনিবাসিনঃ শ্রীশরচ্চন্দ্রশর্ম্মাণো বিবিধদেশান্ পর্য্যটন্তঃ শ্রীবড়োদারাজধানীমলঙ্কুর্ব্বাণা মন্নিবাসস্থানং দৈবাৎ প্রাপ্তাস্তেন চিরমেভির্গীর্ব্বাণ-ভাষয়ালাপঃ সমভবৎ তত্রৈতেষাং নৈপুণ্যমবলোক্য বঙ্গা অপি সংস্কৃত-ভাষায়াং নিপুণা ভবন্তীত্যানন্দঃ সমজনীত্যেব কেবলং ন কিন্তু কলিকাতা রাজধান্যা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজনাম্নি বিদ্যালয়ে উপাধিপরীক্ষাং দত্বা প্রশংসাপত্রমাসাদিতবন্তঃ তৈন চৈমে পঞ্চকাব্যাদৌ তথা প্রসিদ্ধতরা-ভিজ্ঞানশকুন্তলপ্রমুখনানাবিধনাটকেষু তথৈব চ মন্বাদি-স্মৃতিশাস্ত্রেষপি কৃতপ্রবন্ধা

দিলেন। আমি উহা লইয়া সায়ংকালে দেবমন্দিরে প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

মহারাজের ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎকার। ২০ জ্যৈষ্ঠ ৯টার সময় বড়োদায় সৈনিক-কার্য্যালয়ে গমন করিলাম। এই বাড়ীটী নগরের মধ্যভাগে পুরাতন রাজবাটীর সন্নিহিত। এই বৃহৎ বাটীর তেতলায় সৈনিকবিভাগের কর্ত্তার কার্য্যালয়। এই সেনাপতি আনন্দরাওগায়কবাড় মহোদয় বড়োদার বর্ত্তমান মহারাজ সয়াজীগায়কবাড় মহোদয়ের ভ্রাতা। মহারাজের পরিচিত কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি মহারাজের নামে আমার পরিচয়-জ্ঞাপক একখানি পত্র দিয়াছিলেন। আমি বড়োদায় আসিয়াই শুনিলাম, মহারাজ তিন চারি দিন হইল, গ্রীষ্মযাপনের নিমিত্ত নীলগিরিতে গমন করিয়াছেন, আমি পত্রখানা ফিরাইয়া লইয়া যাইব ভাবিয়াছিলাম কিন্তু বড়োদার শাস্ত্রি-বন্ধুগণ মহারাজের ভ্রাতার হস্তে উহা প্রদান করিবার জন্য পরামর্শ দিলেন। সেই পত্রখানি দেওয়াই সৈনিক-কার্য্যালয়ে গমনের উদ্দেশ্য। প্রধান দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী বিদ্যমান। তাহাদের হস্তে পত্রখানি অর্পণ করিবামাত্র নিম্নতলের একজন পদাতিক ছুটিয়া গিয়া উহা সৈনিক-কার্য্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়ের হস্তে দিল। তিনি নিম্নতলে আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। পদাতিক একটী উৎকৃষ্ট গৃহে লইয়া গিয়া একখানি চেয়ারে বসিতে বলিল।

ইতি নিশ্চিনুমঃ অথৈতেষাং কুলশীলানুবর্ত্তনাদিকমবলোক্যেদং প্রতিষ্ঠাপত্রং দত্তমিতি শম্। সং ১৯৫২ বৈশাখে সিতপক্ষে নবম্যাং ভৃগৌ লেখো ব্যলেখি।

রাজারামকাশীনাথ শাস্ত্রী।

বড়োদারাজধানীয় সংস্কৃত পাঠশালাসর্ব্বাধিকারী।

ঐ গৃহে আরও কয়টী সাক্ষাৎ-কারার্থী অপেক্ষা করিতেছিলেন, যথাক্রমে তাঁহাদের আহ্বান করা হইল। আমি সর্ব্বশেষে গিয়াছি সুতরাং নিয়মানুসারে আমি সর্ব্বশেষে আহূত হইলাম। সেনাপতি মহাশয়ের বহু কার্য্য। চারিদিকে চারি জন সহকারীর কার্য্যালয়। মধ্যভাগে একটী গৃহে সেনাপতি একখানি উজ্জ্বল কেদারায় বসিয়া আছেন। আগন্তুদের জন্ত সম্মুখে একখানি উৎকৃষ্ট চেয়ার রক্ষিত হইয়াছে। আমি প্রবেশ করিবামাত্র সেনাপতি মহাশয় সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া প্রণিপাত করিকরিলেন এবং বসিতে অনুরোধ করিলেন। আমি আশীর্ব্বচন উচ্চারণ পূর্ব্বক বসিলে অতিবিনীতভাবে আলাপ আরম্ভ করিলেন। যে সময় আহ্বান করা হয়, তখনই সাক্ষাৎ-কারার্থীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া হয়, কোন্ ভাষায় কথোপকথন হইবে। আমি পূর্ব্বেই সংস্কৃত কিংবা হিন্দীতে আলাপ করিব বলিয়াছিলাম। তদনুসারে সেনাপতি মহাশয় আমার সহিত হিন্দীতে কথোপকথন করিলেন। সেনাপতি মহাশয় অতীব উদারচরিত। ইঁহাকে দেখিলে যেন একটী মূর্ত্তিমান্ বিনয়ের অবতার বলিয়া বোধ হয়। ঐশ্বর্য্যের গৌরব কিংবা ক্ষমতার অভিমান, কিছুমাত্র ইঁহাতে লক্ষিত হইল না। আমি এক জন দূরতর প্রদেশের অধিবাসী হইলেও চিরপরিচিতের ন্যায় আমার সহিত সম্ভাষণ করিলেন। আমি কোথায় আছি এবং আহারাদির কিরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা বারংবার জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা আমি তাঁহার তত্ত্বাবধানে কোন স্থানে অবস্থান করি কিন্তু আমি বড়োদায় অধিক দিন থাকিতে পারিব না সুতরাং ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন তত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হইলনা। তাহার পর, তিনি

বলিলেন "মহারাজ অল্প দিন গত হইল, নীলগিরিতে গিয়াছেন। কিছু দিন পূর্ব্বে আসিলেই সাক্ষাৎ হইত। যাহা হউক বড়োদা ত্যাগের পূর্ব্বে অবশ্য যেন আমার সহিত সাক্ষাৎ করা হয়"। আমি তাঁহার আদেশ পালন করিব, অঙ্গীকার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম। আসার সময় সংস্কৃত পরীক্ষা-সমূহের সম্পাদক (Registrar) শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল মোড়ে বি, এ, মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত-শিক্ষার একটী বিশেষত্ব এই যে, উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ্, এ, কিংবা বি,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিরাও সংস্কৃত ভাষায় এক রূপ মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার সহিত অনেক ক্ষণ কথোপ-কথনের পর বাসায় প্রত্যাগত হইলাম।

স্থানীয় প্রধান ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ। ২১ শে বৈশাখ রাজারামকাশীনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের উপদেশ অনুসারে মহারাজের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মণিভাইর সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত রাজকীয় নূতন কার্য্যালয়ে গমন করিলাম। নূতন কার্য্যালয়টী রাজবাটী হইতে দূরে অবস্থিত। এই বাড়ী উত্তর-দক্ষিণে বহুদূর বিস্তৃত। চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃক্ষশ্রেণী, দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী বিদ্যমান। মন্ত্রি সভা, রাজস্ব-কার্য্যালয়, জজকোর্ট, ও হাইকোর্ট বা বরিষ্ঠ আদালত এই সুদৃশ্য অট্টালিকা-শ্রেণীতে অবস্থিত। এখানেও রীতিমত ব্যবহারাজীব বা উকীল আছেন। তাঁহারা জজকোর্ট ও হাইকোর্ট ব্যতীত কখন কখন মন্ত্রিসভায় গিয়া ও অর্থী প্রত্যর্থীর পক্ষ সমর্থন করিয়া থাকেন। এখানে হিন্দু, জৈন, মুসলমান খৃষ্টান এবং কতকগুলি পার্শী কর্ম্মচারী আছেন। মহারাজ তাঁহার রাজ্যের সকলশ্রেণীস্থ প্রজার মধ্য হইতেই

সমভাবে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিয়া থাকেন। এই অট্টালিকার ত্রিতলের ঠিক মধ্যভাগে প্রধান মন্ত্রীর বসিবার স্থান। উক্ত গৃহের বাহিরে সাক্ষাৎকারার্থীদের জন্য কয়েকখানি চেয়ার রাখা হইয়াছে। আমি গিয়া কিছু কাল অপেক্ষা করার পর আহূত হইলাম। মন্ত্রিবর পূর্ব্বেই শাস্ত্রী মহাশয়ের লোকের নিকট আমার পরিচয় অবগত হইয়াছিলেন। প্রবেশ করিবামাত্র সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। প্রায় দশ মিনিট কাল কথোপকথন হইল। মণিভাই মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ। ইনি বোম্বাই-হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ছিলেন। কয়েক বৎসর হইল, মহারাজ-গায়ক-বাড়ের প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। তাহার পর, অমাত্য-প্রবরের শিষ্টতাপূর্ণ আলাপে আপ্যায়িত হইয়া বাসায় প্রত্যাগমন কালে বড়োদা-কলেজের পারস্যভাষার প্রোফেসর মুন্সী ফরিদ্‌উদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হইল। মুন্সীজী কৃতবিদ্য ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি। ইহার স্বাভাবিক শিষ্ট ব্যবহার দেখিয়া আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। মুন্সীজীর জন্মভূমি বাঙ্গালা দেশ। প্রায় পনেরো ষোল বৎসর হইল, বড়োদায় অবস্থান করিতেছেন। ইনি পারস্যভাষায় লিখিত গায়কবাড়-রাজ্যের ইতিহাসের ইংরেজী ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন।

২২শে বৈশাখ অপরাহ্নে পূর্ব্বোক্ত রাজারাম শাস্ত্রী মহাশয়ের নির্দ্দেশ অনুসারে বড়োদা-হাইকোর্টের দ্বিতীয় জজ পণ্ডিত সার্ঙ্গ-পাণির সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলাম। জজ্ বাহাদুরের বাসা শাস্ত্রী মহাশয়ের বাসস্থলীর সন্নিহিত। পূর্ব্বেই জজ্ বাহাদুরের সহিত আমার বিষয়ে শাস্ত্রী মহাশয়ের কথোপকথন হইয়াছিল। আমি নামটী লিখিয়া পাঠাইলেই তৎক্ষণাৎ তাঁহার প্রেরিত লোক

আসিয়া আমাকে উপরে লইয়া গেল। উপরি ভাগে উঠিয়া দেখিলাম জজ্ বাহাদুর তাঁহার শয়ন গৃহের সম্মুখস্থ সুসজ্জিত একটী গৃহে আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ঐ গৃহেই তাঁহার দুইটী শিক্ষিতা যুবতী কন্যা অধ্যয়নে নিরত আছেন। আমি উপস্থিত হইবামাত্র তিনি সুললিত সংস্কৃত-ভাষায় অভ্যর্থনা, স্বাগত-প্রশ্ন ও বসিতে অনুরোধ করিলেন। আমি বসিলে প্রায় দেড় ঘণ্টা কাল কথোপকথন হইল। পণ্ডিত সার্ঙ্গপাণি কোঙ্কণস্থ ব্রাহ্মণকুল-সম্ভূত। ইনি মহারাষ্ট্রীয় সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষায় একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি। এতদ্ভিন্ন ব্যবহার-শাস্ত্রে দক্ষতার জন্য ইঁহার সবিশেষ খ্যাতি আছে। পণ্ডিতের আকৃতি খর্ব্ব এবং দেহ বেশ সুগঠিত। বর্ণ এত উজ্জ্বল গৌরবর্ণ যে, দেখিলে মনে হয়, শরীর হইতে কান্তি উছলিয়া পড়িতেছে। ইঁহার আকৃতি যেমন সুন্দর, কথা বলিবার পদ্ধতি তদপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। পণ্ডিত সার্ঙ্গপাণি রীতিশুদ্ধ সরল সংস্কৃতে অত্যন্ত ধীরে ধীরে মনের ভাব প্রকাশ করেন। কন্যা দুইটীও বেশ সুশীলা ও বুদ্ধিমতী। তাঁহারা অতি নম্রভাবে বসিয়া আমাদের সংস্কৃতে কথোপকথন শুনিয়া আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন। পণ্ডিতবর আমাকে নিম্নলিখিত প্রশ্নটী করিলেন ;—

যদি কেহ না জানিয়া সগোত্রা কন্যার পাণিগ্রহণ করে, পরে জানিতে পারে, তবে সেই পরিণীতা সগোত্রা কন্যার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে? আর পরিণেতা পরিত্যাগ করিলে ঐ পাত্রীর অন্য পাত্রের হস্তে সম্প্রদান করা যাইতে পারে কি না?

আমি বলিলাম "আমাদের দেশের স্মৃতিশাস্ত্রের সংগ্রহকার

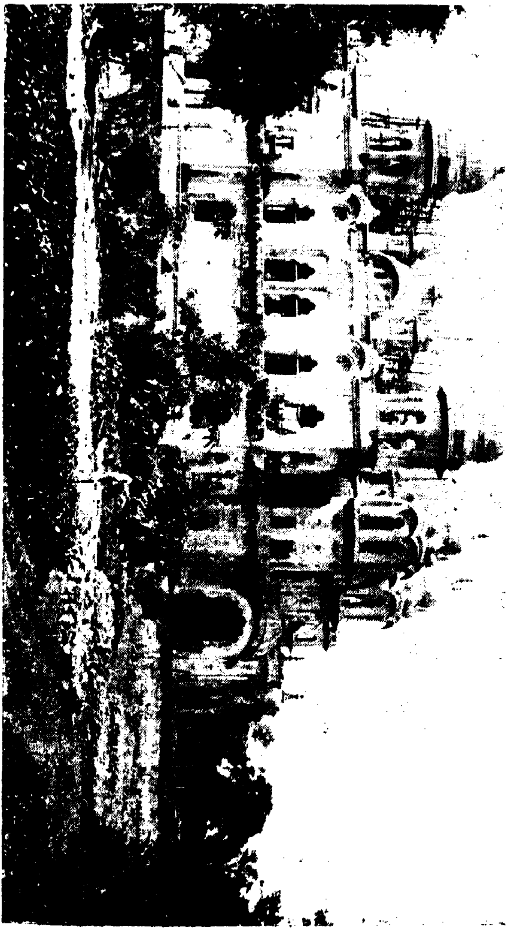
ও ব্যবস্থাপক মহামহোপাধ্যায় রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য। তাঁহার মতে যে কন্যার একবার পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার আর পুনরায় বিবাহ হইতে পারে না। পরিণয়কর্ত্তা উক্ত কন্যাকে মাতৃজ্ঞানে ভরণপোষণ করিবেন*।” জজ্ বাহাদুর একখানি ইংরেজীভাষায় লিখিত আইন হইতেও এবিষয়ে অনেক কথা পাঠ করিলেন। কিছু ক্ষণ পরে তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাসায় প্রত্যাগত হইলাম। বাসাস্থ শাস্ত্রি-বন্ধুগণের মুখে শুনিলাম বড়োদা-হাইকোর্টেও নাকি সগোত্রা কন্যার পাণি-গ্রহণ বিষয়ক একটী মোকোদ্দমা উপস্থিত আছে।

বড়োদা নগরীর সাধারণ দৃশ্য। বড়োদা নগরীর আয়তন ন্যূনাধিক তিন বর্গমাইল হইবে। খ্রীঃ ১৮৮১ অব্দে এখানে লোক সংখ্যা ১০১,৮১৮ ছিল। এখন জনসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। এই নগরীটী বিশ্বামিত্রী নাম্নী একটী ক্ষুদ্র নদীর তীরে অবস্থিত। নগরীর অতিনিকটে কোন পর্ব্বতমালা নাই, দুই তিনটী সেতু আছে। ঐ সেতুগুলি সুকৌশলে নির্ম্মিত। বড়োদা ষ্টেসন হইতে একটী বিস্তৃত রাজপথ নগরে প্রবেশ করিয়াছে। উক্ত রাজপথ ব্যতীত অন্যান্য রাজপথগুলিও বেশ প্রশস্ত। প্রত্যেক রাজপথের উভয় পার্শ্বে গ্যাসের আলোকস্তম্ভের মস্তকোপরি কারুকার্য্য-খচিত সুন্দর আলোকাধার সকল (Top of the glass-case) শোভা পাইতেছে। অনেক নগরের আলোকাধার দেখিয়াছি কিন্তু বড়োদার রাজপথের আলোকাধারের ন্যায় সুন্দর আলোকাধার কোথাও দেখি নাই। রাজপথের উভয় পার্শ্বে

* সগোত্রাকেদমত্তা উপযচ্ছেন্মাতৃবেদনাং বিভৃয়াদিতি আচারমাধবীয়-মদনপারিজাতয়োরাপস্তম্বঃ। (উদ্বাহতত্ত্বম্)।

শান্তিরক্ষার জন্য সশস্ত্র পুলিস্ প্রহরী দণ্ডায়মান। এই নগরে ধনিগণের প্রাসাদমালা প্রায়ই পাষাণময় অথবা কাষ্ঠনির্ম্মিত কিন্তু মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রলোকেরা খোলার ঘরে বাস করে। বাড়োদা নগরীতে বহুসংখ্যক দেবমন্দির আছে। তন্মধ্যে বিট্ঠল-মন্দির, স্বামি-নারায়ণের মন্দির, খাণ্ডোবা-মন্দিরই প্রধান। এই সকল মন্দিরের অভ্রস্পর্শী চূড়াসকল বহুদূর হইতে দৃষ্টিগোচর হয়।

২৩ শে বৈশাখ প্রাতঃকালে স্নানান্তে উপরি লিখিত দেবালয় গুলি সন্দর্শন করিয়া বড়োদার পুরাতন রাজবাটী দেখিবার জন্য গমন করিলাম। সহরের মাঝখানে এক দেশ জুড়িয়া রাজবাটী। উহাতে গগনস্পর্শী কাষ্ঠময় অনেক অট্টালিকাশ্রেণী বিদ্যমান। কোনটী চারিতলা, কোনটী ছতলা, কোনটী সাততলা। এই সকল অট্টালিকা নির্ম্মাণে কতই যে কাষ্ঠের প্রয়োজন হইয়াছিল, উহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। ইহার কোন বাটীতে রাজকীয় পারিবারিক দেবমন্দির, কোন বাটীতে রাজমহিলারা ও তাঁহাদের আত্মীয়ারা বাস করেন। কোনটীতে রাজমহিলাদের স্ব স্ব জায়গীরের কর্ম্মচারিগণের কার্য্যালয়। একটীতে শিক্ষাবিভাগ-সংক্রান্ত কর্ম্মচারিগণ বসেন। ইহার মধ্যে উত্তর দক্ষিণে লম্বমান একটী অট্টালিকাশ্রেণীর উচ্চতা ও গৃহসংখ্যা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। ইহাতে এতই কার্য্যালয় ও কর্ম্মচারী অবস্থান করে যে, উহা গণিয়া সংখ্যা করা যায় না। ঐ বাটীতে পুরাতন দপ্তরের যত বড় বড় কর্ম্মচারীর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যালয় বিদ্যমান। পূর্ব্বাহ্ন দশটা হইতে পাঁচটা পর্য্যন্ত এই বাটীতে পিপীলিকাশ্রেণীর ন্যায় অসংখ্য কার্য্যার্থীর সমাগম হইয়া থাকে। ইহাতে প্রবেশের দ্বার ও অসংখ্য। প্রত্যেক দ্বারে সশস্ত্র প্রহরী বিদ্যমান। আমি পুরাতন



রাজবাটী ঘুরিয়া দেখিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের কামান দেখিতে গেলাম। স্বর্ণনির্ম্মিত ও রৌপ্যনির্ম্মিত বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন ইহার আকার ক্ষুদ্র। প্রকৃত পক্ষে ইহা লৌহের কামান অপেক্ষা ও বড় বোধ হইল। দুইটী কামান স্বর্ণনির্ম্মিত ও দুইটী রৌপ্য-নির্ম্মিত। ইহার নির্ম্মাণে বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়াছিল। বড়োদা নগরীর পূর্ব্ব সীমায় একটী সৈন্যাবাস আছে। উহাতে দেশীয় সৈনিকগণ বাস করে। উহার কিঞ্চিৎ দূরে উত্তর দিকে মহারাজের প্রতিষ্ঠিত অভিনব সূতার কলে বড়োদা রাজ্যের উৎকৃষ্ট তুলা-রাশি সূত্ররূপে পরিণত হইতেছে। আমি ঐ সকল স্থান সন্দর্শন করিয়া ১১ ঘটিকার সময় বাসায় প্রত্যাগত হইলাম।

লক্ষ্মীবিলাস রাজপ্রাসাদ। ঐ দিন অপরাহ্নে বড়োদা নগরীর সৌন্দর্য্যের প্রধান নিকেতন লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত বহির্গত হইলাম। রাজকীয় অভিনব কার্য্যালয়ের নিকট দিয়া দক্ষিণাভিমুখে কিঞ্চিদূন অর্দ্ধ মাইল গমন করিলে রাজপথের দক্ষিণ পার্শ্বে প্রান্তর মধ্যে উপরি উক্ত সুপ্রসিদ্ধ লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া বহুক্ষণ সেই অভ্র-স্পর্শিনী রাজপুরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলাম। বস্তুতঃ ঐ দৃষ্টিরম্য প্রাসাদমালার যিনি প্রথম কল্পনা করিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয় যে কিরূপ অপূর্ব্ব কবিত্বময়, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। স্বর্গবাসী না হইলে কেহ অমরাবতীস্থ বৈজয়ন্ত ধামের সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না। যাঁহারা মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া শ্বেতদ্বীপের জনপদসমূহে গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই ইংলণ্ড বা প্যারিস্ নগরীর প্রাসাদ-নিচয়ের সহিত এই সৌধমালার শোভার তারতম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। ভারতবর্ষই আমাদের একমাত্র

গম্যস্থল, এই মহাদেশের যত দূর নিরীক্ষণ করিয়াছি, তন্মধ্যে এরূপ রম্যতম প্রাসাদ আর কখনও নয়ন-গোচর করি নাই। দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার যেসকল কৃতী সন্তান, কর্ম্মফলে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা তাঁহাদেরই স্থাপত্যবিদ্যায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই প্রাসাদ দেখিলে মনে হয়, কে যেন অলৌকিক কান্তিময় স্বর্গপুরীর এক খণ্ড আনিয়া এখানে স্থাপন করিয়া গিয়াছে; অথবা ইহার মেঘস্পর্শী চূড়াসকল নভোমণ্ডলে অবস্থিত হইয়া ত্রিদশালয়কে যেন উপহাস করিতেছে। এই প্রাসাদমালা আয়তনে অত্যন্ত বড়, প্রান্তরের একাংশ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। ইহার সমুদয় ভাগ সুদৃঢ় লৌহ-রাশির দ্বারা নির্ম্মিত। গৃহের মধ্যভাগও সোপানশ্রেণী উৎকৃষ্ট মর্ম্মর-পাষাণে মণ্ডিত। উপরে উঠিবার সময় দর্শকের সমস্ত অবয়ব স্বচ্ছ মর্ম্মর-প্রস্তরে প্রতিবিম্বিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে। এই মনোহর সৌধমালার উপরি ভাগে স্নানাগার, বিশ্রামগৃহ, শয়নমন্দির ক্রীড়াভবন প্রভৃতি প্রশস্ত ও পরিপাটীর সহিত সুসজ্জিত। মনোজ্ঞ গৃহগুলি বহুমূল্য প্রস্তর, নানাদেশের চিত্রিত ছবি, শোভাময়ী শয্যা, রমণীয় আসন ও নানাজাতীয় মণি-মাণিক্য-হীরকে সংশোভিত হইয়া যার পর নাই সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। মহারাজের প্রথমা মহিষী লক্ষ্মীবাই বিখ্যাত সুন্দরী ছিলেন। দৈহিক সৌন্দর্য্য ভিন্ন তাঁহার অন্তঃকরণের সৌন্দর্য্য আরও অধিক ছিল। তিনি অল্প বয়সেই দয়া দাক্ষিণ্য গুণে প্রজাবর্গের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি প্রাচীন রাজকর্ম্মচারিগণ ও প্রজারা তাঁহার করুণা ও বদান্যতার কথা উল্লেখ করিয়া অশ্রুপাত করে। উক্ত রাজ্ঞী-দুইটী পুত্র রাখিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন।

মহারাজও পুত্রদ্বয়ের সহিত মহারাজের পূর্ব্ব মহিষী এবং বর্ত্তমান মহিষী চিম্নাবাইর তৈলচিত্রিত ছবি ঐ প্রাসাদে বিদ্যমান আছে। এই প্রাসাদের একতলায় পুস্তকাগার। উহাতে সুন্দর আলমায়রায় সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন্, হিব্রু, পারশী, উর্দ্দু, জর্ম্মন্, ফ্রেঞ্চ, ইংরেজী মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভূখণ্ডের নানাভাষার স্বর্ণমণ্ডিত-আবরণ-বিশিষ্ট অসংখ্য পুস্তক শোভা পাইতেছে। প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে নানাজাতীয় লতিকা ও পুষ্পিত তরুসকল শ্রেণীবদ্ধরূপে রোপিত ও পরিপালিত হইয়া থাকে। রাজপথ হইতে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে প্রবেশের দ্বারদেশে সশস্ত্র প্রহরি-সকল বিদ্যমান। এই প্রাসাদ সন্দর্শন করিতে হইলে অনুমতিপত্র (Pass) লইতে হয়। স্বয়ং মহারাজ ও তাঁহার দুই তিনটী প্রধান কর্ম্মচারীর নিকট অনুমতিপত্র পাওয়া যায়।

২৪শে বৈশাখ মধ্যাহ্ন আহারের পূর্ব্বে একটী গৈরিক-পরিচ্ছদ পরিব্রাজক অতিথিরূপে মঠে উপস্থিত হইলেন। তিনি আপনাকে ভারতী উপাধিযুক্ত এবং মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায়-ভুক্ত বলিয়া পরিচিত করিলেন। আহারান্তে কথার স্বর শুনিয়া বাঙ্গালী বলিয়া আমার সন্দেহ হইল। আমি বিশেষ নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করায় শেষে হিন্দী ছাড়িয়া বাঙ্গলা ধরিলেন এবং অনেক ক্ষণ আমার সহিত বাঙ্গালা ভাষায় কথোপকথন্ হইল। কয়েক দিনের পর রসনা হইতে বাঙ্গালা শব্দ নির্গত হওয়ায় জিহ্বা যেন একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। আমি নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া জানিলাম, তাঁহার জন্মভূমি কলিকাতার সন্নিহিত কোন সমৃদ্ধ গণ্ডগ্রামে কিন্তু যৌবনে যোগী সাজিবার কারণ তিনি কিছুতেই প্রকাশ করিলেন না। বাঙ্গালী পরিব্রাজক অনেক দিন দক্ষিণাপথে

আছেন এবং মহারাষ্ট্রীর ভাষায় ও তেলেগু ভাষায় কথা কহিতে পারেন। তিনি আমাকে বলিলেন "আমার সহিত ভবনগরে চলুন" কিন্তু আমি তাঁহার সঙ্গী হইতে সম্মত হইলাম না। কারণ অবসর-সময়ে চিত্তবিনোদনের জন্ত দেশ পর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছি। এ অবস্থায় পরের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া চলা অপেক্ষা স্বাধীন ভ্রমণে আনন্দ অধিক।

শাস্ত্রি-বন্ধুগণ। ঐ দিন অপরাহ্ন ৪টা হইতে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায় বড়োদা নগরীর নব পরিচিত বন্ধুগণ উপস্থিত হইলেন। জলের কলের অনতিদূরে মাধবী-কুঞ্জের পার্শ্বস্থ ভূভাগ জলসিক্ত করিয়া কয়েকখানি খাটিয়া পাতা হইলে একে একে আসিয়া সকলে ঐ স্থানে সমবেত হইলেন। বন্ধুগণ সকলেই প্রায় শাস্ত্রবিৎ, তাঁহাদের সহিত আমি প্রতিদিন তিন চারি ঘণ্টা সংস্কৃত ভাষায় আলোচনা করিয়া বিশেষ আমোদ অনুভব করিতাম। এই বন্ধু-সমাজে চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ বৎসরের বালক হইতে সপ্ততি অশীতি বৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধ পর্য্যন্ত আছেন। শাস্ত্রালোচনায় বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করা কাহারই পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। বালকগণ আপন মনে সুমধুর স্বরে কালিদাসের সুধাসিক্ত কবিতা আবৃত্তি করিত। যুবকগণ মধ্যে মধ্যে উহার কোন একটী কবিতার ভাব ও রচনা-কৌশল অব-লম্বন করিয়া আমার সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হইতেন। দুই তিন জনে এক পার্শ্বে এক খাটিয়াতে বসিয়া ন্যায়দর্শনের কথা লইয়া ঘোরতর বিচারে প্রবৃত্ত থাকিতেন। তাঁহাদের কথায় সকলে যোগ দিতে পারিতেন না কিন্তু যখন বেদান্তের কথা উঠিত, তখন সকলেই সমবেত হইয়া উহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইত। ঐ মঠে একটী প্রাচীন শাস্ত্রী থাকেন, তাঁহার প্রকৃত নাম

কি আমি জানিনা, কখন জিজ্ঞাসা ও করি নাই। কারণ তাঁহার শান্তিময় জীবনের পবিত্র আচরণ নিত্য প্রত্যক্ষ: করিয়া আমি সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাভরে অবনত থাকিতাম। মঠে সমবেত বন্ধুগণের মধ্যে অধিকাংশই দেশস্থ-ব্রাহ্মণ সুতরাং এই কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত বৃদ্ধ শাস্ত্রীকে সকলেই কোঙ্কণস্থ-শাস্ত্রী বলিয়া সম্বোধন করিত। প্রায় অশীতি-বৎসর-বয়স্ক এই কোঙ্কণস্থ শাস্ত্রীর শরীরের বর্ণ সুপক্ক আম্রের ন্যায় উজ্জ্বল পীতবর্ণ। মস্তকে শুভ্রকেশ এবং এই বার্দ্ধক্যেও উজ্জ্বলদন্ত-পংক্তি আননচ্যুত হয় নাই। ইনি প্রত্যহ ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে উঠিয়া স্নান,সন্ধ্যা,বেদ পাঠ ও নিত্য হোম শেষ করিয়া গ্রামে গমন করেন এবং যে দিন যেখানে নিমন্ত্রণ থাকে, সেখানে বেদপাঠ করেন। বেদ পাঠান্তে মাধ্যাহ্নিক আহার সমাপ্ত করিয়া দক্ষিণা গ্রহণ-পূর্ব্বক সায়ংকালে পুনরায় মঠে আগমন করেন। যে দিন কোন স্থানে নিমন্ত্রণ না থাকে, সে দিন মঠেই আহার করেন। দুই তিন দিন কোন স্থান হইতে নিমন্ত্রণ না আসিলে কোঙ্কণস্থ শাস্ত্রী স্নান সন্ধ্যাদি শেষ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে স্বয়ংই কোন গ্রামে গমন করেন। ধার্ম্মিক গৃহস্থেরা শাস্ত্রীর আগমন অবগত হইয়া নিজগৃহে বেদ পাঠের অনুষ্ঠান করে। এই নিরীহ ব্রাহ্মণ বড়োদা-নগরীর সংলগ্ন এক পল্লীতে কোন সম্পন্ন ব্রাহ্মণের একমাত্র কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। গৃহিণী অধিকাংশ সময় পুত্র, পুত্রবধূ কন্যা প্রভৃতির সহিত পিতৃগৃহে অবস্থান করেন। ব্রাহ্মণ কদাচিৎ শ্বশুরালয়ে গমন করেন। একদিন ব্রাহ্মণের শরীর একটু অসুস্থ হওয়ায় সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণী, পুত্র ও পুত্রবধূর সহিত দেখিতে আসিলেন। পুত্র ও পুত্রবধূ সক্ষাৎ করিয়াই প্রতিগমন করিলেন। ব্রাহ্মণী দুই দিন মঠে অবস্থান করিয়া স্বামীর শুশ্রূষা করিলেন। এই ব্রাহ্মণীর

বয়স প্রায় ৪৭ কি ৪৮ বৎসর হইবে। আকৃতি দেখিলে যেন একটী দেবী মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়। তিনি ঠিক দেবতাবোধে স্বামীর সেবা করেন। পূজার দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে স্বামীর অগ্রে দাঁড়াইতেন, স্বামী পূজা করিতে বসিলে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতেন। আহার প্রস্তুত করিয়া আবার যুক্তকরে স্বামীর অগ্রে উপস্থিত, স্বামী আহারে বসিলে পার্শ্বে বসিয়া বাতাস করিতেন। স্বামী শয্যা গ্রহণ করিলে ভূতলে বসিয়া পাদ-সংবাহন করিতেন. স্বামীর নিদ্রাবেশ হইলে পৃথক্ শয্যার শয়ন করিয়া থাকিতেন। দক্ষিণী ব্রাহ্মণ-মহিলারা অবগুণ্ঠণে বদন আবৃত করেন না কিন্তু তথাপি সলজ্জভাবও স্বামীর প্রতি ভক্তি-পরায়ণতা দেখিয়া মনে হইত, ইনি যেন কোন জীবন্ত দেবতার অর্চ্চনে প্রবৃত্ত আছেন। আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অনেকেই গৃহিণীকে প্রমোদ-গৃহের সঙ্গিনীর ন্যায় দেখিতে ভাল বাসেন কিন্তু আমার বোধ হয় এইরূপ পবিত্র ভাবে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করা যেরূপ শান্তিদায়ক, অন্য কিছুতেই সেরূপ শান্তি লাভের সম্ভাবনা নাই। বৃদ্ধশাস্ত্রীর সমগ্র ঋগ্বেদ কণ্ঠস্থ। সাধারণতঃ ইনি চৌকীর একপার্শ্বে নিরীহের মত বসিয়া থাকিতেন। যেই কেহ বেদ পাঠ করিতে অনুরোধ করিত, অমনি উদাত্ত অনুদাত্ত ও স্বরিত স্বরে বেদ পাঠ আরম্ভ করিতেন। সেই পৃথক্ পৃথক্ বৈদিক শব্দের উচ্চারণ কালে, পৃথক্ পৃথক্ হস্তভঙ্গী ও অঙ্গসঞ্চালনের সহিত সুমধুর বেদধ্বনি উত্থিত হইলে বন্ধুসমাজ ক্ষণকাল নিস্তব্ধ হইয়া মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় উহা শ্রবণ করিতেন। বৃদ্ধ শাস্ত্রীর কিছুমাত্র আলস্য নাই। আমরা যখনই বেদের যে অংশ শুনিতে অভিলাষ করিতাম অমনি হৃষ্টান্তঃকরণে

তিনি উহা আবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইতেন। ঐ দিন আমরা সোমযাগের মন্ত্রগুলি পাঠ করিতে অনুরোধ করিলাম, শাস্ত্রী তৎক্ষণাৎসোমমন্য*ইত্যাদি মন্ত্র আবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কোঙ্কণস্থ শাস্ত্রী বলিলেন "তিনি কয়টী সোমযাগে উপস্থিত ছিলেন এবং সোমরস পান করিয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন সোমলতা দুর্লভ হইলেও একান্ত অপ্রাপ্য নহে, হিমালয়, বিন্ধ্য, মলয়, সহ্য প্রভৃতি শৈলরাজি সর্ব্ববিধ বনৌষধির আকর। ঐ সকল পর্ব্বতে অদ্যাপি সোমলতার অভাব হয় নাই"। উহার মধ্যে একটী মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু বলিলেন "সোম না পাইলেও সোমযাগের ব্যাঘাত হয় না। এবিষয়ে শ্রুতি আছে;—"যদি সোম না মিলে তবে তাহার পরিবর্ত্তে পূতিকা গ্রহণ করিতে পারি"†। তাহারপর, আমরা নানা কথায় জ্যোৎস্না-সমুদ্ভাসিত গ্রীষ্ম রজনীর প্রথম ভাগ অতিবাহিত করিয়া আহারান্তে শয়ন করিলাম।

২৫শে বৈশাখ অপরাহ্নে মহারাজের নূতন উদ্যান সন্দর্শন করিতে বহির্গত হইলাম। বড়োদা নগরীর দেশীয় ভদ্রপল্লী ত্যাগ করিয়া রেলপথের দিকে যে প্রশস্ত রাজপথ গিয়াছে ঐ রাজপথ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রায় এক মাইল গমন করিলে রাজকীয় উদ্যান, য়ুরোপীয় সৈন্যবাস, রেসিডেন্টের বাসভবন এবং ইংরেজীভাবাপন্ন দেশীয় রাজকর্ম্মচারীদের বাঙ্গলো সকল দৃষ্টিগোচর হইল। রাজকীয় উদ্যানটী প্রশস্ত। উহার মধ্যে শ্রেণীবদ্ধভাবে

* সোমমস্ত উপাসদৎ পাতবে চম্বোঃ সুতম্। কয়ং তমন্য ইচ্ছতি ॥২॥
(ঋগ্বেদ ৪র্থ মণ্ডল ৫৪ সূক্ত)

† যদি সোমং ন বিন্দেত তর্হি পূতিকামাহরেতেয়ম্ ইতি শ্রুতিঃ।

নানাবিধ মনোহর পুষ্প-বৃক্ষ ও অদৃষ্টপূর্ব্ব মনোজ্ঞ লতিকা-সকল সযত্নে রোপিত ও পরিপালিত হইয়া থাকে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ উদ্যানে একটীও তরু কিংবা লতা সতেজ দেখিলাম না, সমুদয়ই যেন তাপদগ্ধের ন্যায় শ্রীহীন পরিলক্ষিত হইল। অনন্তর নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া সায়ংকালে বাসায় প্রত্যাগত হইলাম।

মহারাষ্ট্রীয় ভোজ। ২৮শে বৈশাখ দেবালয়ের অধিকারী শাস্ত্রীর পুত্রের অন্নাশন হইল। এই উপলক্ষে পূর্ব্বদিন হইতে অনেক ব্রাহ্মণ মহিলা মঠে সমবেত হইয়া নানা প্রকার উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বাহ্নেই অন্নাশন ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। বাঙ্গালা দেশের ন্যায় পুত্রটীকে শিবিকায় করিয়া ঘুরাইয়া আনা হইল। শাস্ত্রী, স্বীয় গৃহিণী ও আত্মীয়-মহিলাগণ কর্ত্তৃক পরিবৃত হইয়া একটী পাঁড়ির উপর উপবেশনপূর্ব্বক পুত্রের মুখে দেবপ্রসাদি অন্ন প্রদান করিলেন। যখন পুত্রটী যুগপৎ মস্যাধার, লেখনী ও রৌপ্যমুদ্রা ধরিল, তখন সেই তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভা একান্ত-কৃশাঙ্গী ষোড়শী শাস্ত্রি-বধূর নেত্রদ্বয় হইতে প্রবলবেগে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। আত্মীয় মহিলারা চতুর্দ্দিক্ হইতে ধান্য দূর্ব্বা দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলেন। অন্নাশনের সমুদয় ব্যাপারই প্রায় বঙ্গদেশের ন্যায় হইল, কেবল আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ করিতে দেখিলাম না। বোধ হয়, উপনয়নের সময়ে ইহাদের নামকরণ, অন্নাশন প্রভৃতি সংস্কারের বৈদিক আচার সম্পন্ন হইয়া থাকে। কতকগুলি ব্রাহ্মণমহিলা রন্ধন-কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। এদেশীয় স্ত্রীলোকেরা বাঙ্গালী রমণী অপেক্ষা অধিক পরিশ্রমী। পুরুষদের প্রায় কিছুই দেখিতে হয় না, গৃহিণীরাই সমুদয় নির্ব্বাহ করেন। বাঙ্গালা দেশের কুলবধূদের মধ্যে যদিও অদ্যাপি রন্ধন-কার্য্যে

নিপুণা শ্রমপটু রমণীর একান্ত অভাব হয় নাই, তথাপি তাঁহাদের কোন কোন বিষয়ে কার্য্যে ক্ষিপ্রতা প্রদর্শন করিবার প্রতিবন্ধক আছে। বাঙ্গালী বধূদের অবগুণ্ঠনে সর্ব্বদা বদন আবৃত রাখিতে হয়, পুরুষদের সাক্ষাতে তাঁহারা বাহির হইতে পারেন না, অধিকন্তু বস্ত্র পরিধানের রীতি যেরূপ তাহাতে দ্রুত কোন কার্য্য সমাধা করা এক প্রকার দুরূহ। ইহারা অবগুণ্ঠনমুক্ত-বদনে সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া সম্পন্ন করেন এবং কাছা থাকায় চকিতের ন্যায় দ্রুত কাঠের সিঁড়ী সকল অতিক্রম করিয়া উপর নীচে যাতায়াত করেন এবং গোপ প্রভৃতির নিকট হইতে দধি ও অন্যান্য দ্রব্য গ্রহণ করিবার ত কোন আপত্তিই নাই। ভোজনের প্রায় দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে আহারের স্থান করা হইল। বৃহৎ নাটমন্দিরে সমসূত্র পাতে প্রথমে পাঁড়িগুলি সাজান হইল। পংক্তি-গুলি এত সোজা হইল যে, কম্পাস দ্বারা পরীক্ষা করিলেও কোন ইতর বিশেষ লক্ষিত হইত কি না সন্দেহ। তাহার পর, পাঁড়ি গুলির সম্মুখে যথাক্রমে একখানি করিয়া বৃহৎ শালপাতা পাতা হইল। অনন্তর পুরস্ত্রীগণ পিত্তলের কয়েকটী চোঙ্গার মত বাহির করিলেন, উহার দুই দিকে সূত্র ঝুলান। ঐ চোঙ্গার গায়ে লতাও ফুলকাটা ছিদ্র এবং ভিতর নানাবর্ণের গুঁড়ায় পূর্ণ। তাঁহারা অতিনিপুণ-ভাবে পাতের একপার্শ্বে চোঙ্গাটী গড়াইয়া দিয়া সূতো ধরিয়া টানিতে লাগিলেন, আর পাতের চতুর্দ্দিক্ নানা বর্ণ বিচিত্র লতা পত্র পুষ্পে শোভান্বিত হইয়া উঠিল। প্রত্যেক পাঁড়ির বামপার্শ্বে পিত্তলের পিলসুজের উপর অগুরু চন্দন ও ঘৃতে সৌরভান্বিত মসৃণ প্রদীপ সকল জ্বলিতে লাগিল। একটী বধূ

প্রত্যেক পাতে কর্পূরের ন্যায় শুভ্র এক হাতা করিয়া অন্ন রাখিয়া গেলেন। অপর দুই তিনটী অল্পবয়স্কা বধূ কোমল হস্তে অন্নগুলি গুছাইয়া মাজিয়া রাখিয়া যাইতে লাগিলেন। তাহার পর, প্রায় ত্রিশ চল্লিশ প্রকার ব্যঞ্জন অতি অল্প অল্প পরিমাণে পাতের নির্দ্দিষ্ট স্থানে পরিবেশন করা হইল। পাতের পার্শ্বে কয়েকটী করিয়া খুড়ী রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। উহার তিনটীতে তিন প্রকারের ডাউল ও অপর গুলির কোনটীতে দধি, কোনটীতে লাড্ডু, কোনটীতে কলাকন্ (সন্দেশ) ও অন্যান্য মিষ্টান্ন প্রদত্ত হইল। যখন পাতা সাজান শেষ হইল, তখন গৃহিণীরা সকলেই একে একে আসিয়া দেখিয়া গেলেন। এমন কি রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃতা রমণীরা পর্য্যন্ত সুসজ্জিত পত্রগুলি সন্দর্শনের সুযোগ ত্যাগ করিলেন না। প্রকৃত পক্ষেও তখন ভোজন স্থানের এক অপূর্ব্ব শোভা হইল। ব্রাহ্মণেরা কার্পাস-সূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্র ত্যাগ করিয়া গরদের ধুতি পরিয়া স্ব স্ব জলপাত্র সহ ভোজন স্থানে গমন করিলেন। অন্ন নিবেদিত হইবার পূর্ব্বে এক বার ঘৃত প্রদত্ত হইল। তাহার পর, সকলে সমস্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক ভোজনে ব্যাপৃত হইলে চারি পাঁচটী বধূ বৃহৎ বৃহৎ সুকোমল রোটিকা ও কুশীর ন্যায় একপ্রকার ক্ষুদ্র পাত্রের সাহায্যে সুগন্ধ গব্যঘৃত পরিবেশন করিতে লাগিলেন। ইহারা ঘৃতকে "তুপ্" বলেন। বধূরা ভোজনারম্ভের অব্যবহিত পরে এত তুপ দিতে লাগিলেন যে, বোধ হইল যেন তুপের এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল। বঙ্গদেশ হইলে কার্য্যকর্ত্তা কৃতাঞ্জলি হইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিয়া ভোজন করিতে অনুরোধ করিতেন কিন্তু এদেশে সে নিয়ম নাই। কার্য্য-কর্ত্তা নিজে ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের সহিত ভোজনে বসিয়া গেলেন। তাই বলিয়া

সে বিষয়ে ত্রুটী হইল না। আদর অভ্যর্থনার ভার গৃহিণীদের উপরে। তাঁহারা ভোজন-সামগ্রী লইয়া প্রত্যেক ভোক্তার নিকটে গিয়া বিশেষ আদর সহকারে অনুরোধ করিয়া ভোজন করাইতে লাগিলেন। ক্রমেই পরিবেশন-কারিণীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। নবপরিণীতা দশমবর্ষীয়া বালিকা বধূ হইতে প্রবীণা গৃহিণীরা পর্য্যন্ত নানা দ্রব্য লইয়া ঘুরিতে লাগিলেন। ভোক্তাদের হস্ত ও রসনার সংযোগ-নিবন্ধন অব্যক্ত শব্দ, পরিবেশনকারিণীদের অলঙ্কারের "ঝুন্-ঝুন্"রবের সহিত মিশিয়া এক অপূর্ব্ব ধ্বনি উৎপাদন করিতে লাগিল। এ দেশের নিয়মানুসারে ভোক্তা যতক্ষণ "পূরে পূরে" বলেন, ততক্ষণ পরিবেশনকারিণী ক্ষান্ত হন না। কারণ "পূরে" শব্দের অর্থ যথেষ্ট, একেবারে অনিচ্ছা প্রকাশ নহে। আর যখন ভোক্তা "না কো না কো" বলিয়া পাতের উপর উপুড় হইয়া পড়েন, তখন পরিবেশনকারিণী বিরত হন। যে সকল ভাগ্যবান্ যুবার শ্যালিকারা পরিবেশনে ব্যাপৃত হইয়াছেন, তাঁহাদের আনন্দের সীমা নাই। তাঁহারা "নাকো নাকো" বলিয়া পাতের উপর "ব্যাঘ্রঝম্প" প্রদান করিয়াও অব্যাহতি পাইতেছেন না, পৃষ্ঠোপরি হাস্যমুখীদের হস্ত-স্খলিত লড্ডুচূর্ণ ও দধিবিন্দু পতিত হইতেছে। এ দেশের গৃহিণীদের কোন কপটতা নাই, যে দ্রব্যটী ভাল হইয়াছে, উহা তাঁহারা নিজেই বলিয়া দিয়া ভোক্তার উদর-পূর্ত্তির সহায়তা করেন। মহারাষ্ট্রীর ভোজন-সামগ্রী বঙ্গদেশের ন্যায় না হইলেও নিতান্ত মন্দ নহে। ব্যঞ্জনগুলির অধিকাংশই অম্ল ঝাল তিক্ত লবণ ও ঘৃতের আধিক্য-প্রযুক্ত রসনাপ্রিয়। এই রূপে দুই ঘণ্টা কাল ব্যাপিয়া নানাবিধ অভুক্তপূর্ব্ব উপাদেয় দ্রব্য দ্বারা জঠরস্থ অগ্নিদেবের অর্চ্চনা করিয়া সকলে গাত্রোত্থান করিলাম। হস্তমুখ প্রক্ষালনান্তে

মুখশুদ্ধি করিয়া বড়োদা হইতে বোম্বাই অভিমুখে প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত হইলাম। আমি দুই দিন পূর্ব্বেই বড়োদা ত্যাগ করিতাম কিন্তু কেবল শাস্ত্রিপুত্রের অন্নাশন সন্দর্শনের নিমিত্ত অনুরুদ্ধ হইয়া দুই দিন অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। এখন অন্নাশন হইয়া গেল, আর বড়োদায় থাকার প্রয়োজন নাই, সুতরাং শাস্ত্রি-বন্ধুদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া একটী ভারবাহী সহ অবিলম্বে ষ্টেসন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। যেমন ইন্দোর হইতে ইন্দোর-টাকশালের কয়টী রৌপ্যমুদ্রা লইয়া ছিলাম, সেই রূপ যাত্রাকালে এখান হইতেও বড়োদা-টাকশালের কয়টী রজতমুদ্রা সংগ্রহ করিয়া লইলাম। ষ্টেসনে উপস্থিত হইয়া দেখি, তখনও ট্রেন্ আসিতে বিলম্ব আছে। পূর্ব্বদিন পূর্ব্বোক্ত শঙ্করলাল মোড়ে বি, এ. মহোদয়ের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করায় তিনি বলেন "সেনাপতি মহাশয় সৈন্যাবাস পরিদর্শনের নিমিত্ত মফস্বলে ভ্রমণ করিতেছেন, তিনি না আসা পর্য্যন্ত আপনার বড়োদা ত্যাগ করা উচিত নহে। যদি নিতান্তই যান, তবে নৌসরীতে নামিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন। অদ্য যে রাজকীয় পত্র আসিয়াছে, উহা পাঠে জানা গেল, তিনি গত কল্য নৌসরী পৌঁছিয়াছেন"। আমি বলিলাম "সেই ভাল, আমি বম্বে যাইবার কালে নৌসরীতে নামিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইব"। উক্ত অঙ্গীকার অনুসারে টিকিটের ঘণ্টা দিলে নৌসরীর টিকিট লইলাম। অপরাহ্ন ২॥০ টার সময় বড়োদা ষ্টেসন হইতে ট্রেন্ ছাড়িল। বড়োদা নগরী অতিক্রম করিলেই বিশ্বামিত্র নদের উপরিভাগ হইতে গগনস্পর্শী দেবমন্দির, সমুন্নত প্রাসাদমালা ও বিবিধ উদ্যান-সমন্বিত বড়োদা নগরীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নয়নপথে পতিত হইল। বড়োদা

রাজ্যের ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা। রেলপথের উভয় পার্শ্বে নয়নরঞ্জন শস্যক্ষেত্র সন্দর্শনে হৃদয়ে অপূর্ব্ব প্রীতি জন্মিল। এই রাজ্যে অনেক কার্পাস জন্মে। স্থানে স্থানে কার্পাসক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভরোচ-নগর।

ক্রমে গমন করিতে করিতে বাষ্প-শকট ভরোচ্ নামক ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। কথিত আছে;—পুরাকালে এই স্থানে ভৃগুমুনির আশ্রম ছিল, তজ্জন্য ইহার নামান্তর ভৃগুক্ষেত্র। অদ্যাপি ভার্গবগোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা এদেশে বসতি করিতেছেন। এই ক্ষেত্রটী অতিপ্রাচীন। মৎস্যপুরাণের মতে এই স্থল ভরুকচ্ছ নামে অভিহিত। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ইহা ভীরুকচ্ছ নামে উক্ত হইয়াছে। বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতায় ইহার ভরোচ্ছ নাম দৃষ্ট হয়। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক টলেমি এই ভরুকচ্ছ নগরীকে বারিগজ নামে বর্ণন করিয়াছেন। কচ্ছ শব্দের অর্থ জলসন্নিহিত স্থান। ভৃগু শব্দের অপভ্রংশ ভরু বা ভীরু, অতএব ভৃগুর অধিষ্ঠিত কচ্ছ বা বেলাভূমি বলিয়া ইহার ভৃগুকচ্ছ বা ভীরুকচ্ছ নাম হয়। বৃহৎসংহিতাকার কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত করিয়া উহার ভরোচ্ছ নামকরণ করেন। কালক্রমে উহা আরও সংক্ষিপ্ততর হইয়া ভরোচ্ সংজ্ঞায় পরিণত হইয়াছে। এই প্রদেশের মৃত্তিকা কৃষ্ণবর্ণ। পূর্ব্বকালে সমুদ্র ও নর্ম্মদার সঙ্গম স্থলে ভীরুকচ্ছ নগরী বিরাজিত ছিল। এখন এই নগরীর নিকট

হইতে সমুদ্র অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছেন। এই প্রদেশ গুর্জ্জরের অন্তর্গত। পূর্ব্বকালে গুর্জ্জরের রুদ্রবংশীয় নরপতিগণ এই জনপদ শাসন করিতেন। অনন্তর ৩৩০ শকে (৪৭৮ খ্রীঃ) ইহা বলভীরাজ ৪র্থ ধ্রুবসেনের শাসনাধীন হয়। ভট্টিকাব্যপ্রণেতা মহাকবি ভট্টি এই সেনবংশীয় নরপতিগণের গৃহশিক্ষক ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে যখন চীনদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক হুয়েন্‌সাঙ্ ভারতভ্রমণে আগমন করেন, তখন এখানে ১০টী বৌদ্ধসঙ্ঘারাম, ১০টী বৌদ্ধ-মন্দির ও তিনশত বৌদ্ধভিক্ষু দেখিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে অনহিলবাড়পতি সিদ্ধরাজ জয়সিংহ নর্ম্মদার বেগ হইতে এই নগরীকে রক্ষা করিবার জন্য উন্নত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। নদীতীরে ঐ প্রাচীরের উচ্চতা ৪০ ফিট ছিল। এখন স্থানে স্থানে উহার সামান্য চিহ্ন বিদ্যমান আছে। মুসলমান-রাজত্বের সময় এই নগরীর অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছিল। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ বাণিজ্যার্থ এখানে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। এখন এখানে ১৫টী তীর্থক্ষেত্র বিদ্যমান। তন্মধ্যে হিন্দুদিগের ১১টী ও মুসলমানদিগের ৪টী। হিন্দু-তীর্থের মধ্যে ভৃগুর আশ্রম, গঙ্গানাথ-মহাদেব, অম্বাজী মাতা, পিঙ্গলেশ্বর মহাদেব, বহুচারাজী মাতা, সিন্ধু-বাই মাতার মন্দির, কবীরস্থান প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতে পারসীকগণ এখানে আসিয়া বাস করেন। এক সময় ভরোচের তন্তুবায়গণের নির্ম্মিত বস্ত্রের অতিশয় প্রসিদ্ধি ছিল। বোম্বাই নগরীর বর্ত্তমান তন্তুবায়গণের অধিকাংশের পূর্ব্ব-নিবাস ভরোচে ছিল। অদ্যাপি এখানকার তন্তুবায়ের নির্ম্মিত বস্ত্রের নিতান্ত অনাদর ঘটে নাই। ভরোচ্ একটী বিখ্যাত বাণিজ্য-স্থান। এখানকার কার্পাস-বস্ত্র, লৌহ, কাষ্ঠ, সুপারি, গুড়,

চাউল, বিক্রয়ার্থ নানাস্থানে নীত হইয়া থাকে। এই নগরটী বিলক্ষণ সমৃদ্ধ। ধনী পারসীক ও হিন্দুগণের অত্যুচ্চ সৌধমালায় নর্ম্মদাতীর অতীব শোভাযুক্ত দেখায়। এখান হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে গিয়া নর্ম্মদা সমুদ্রের সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। এই প্রদেশের নর্ম্মদাভক্ত হিন্দুগণের বিশ্বাস ছিল, বেগবতী নর্ম্মদাকে কেহ সেতু দ্বারা শৃঙ্খলিত করিতে সমর্থ হইবে না। গ্রেটইণ্ডিয়ান্‌-পেনেন্সুলা-রেলকোম্পানির প্রথম উদ্যম বিফল হওয়ায় লোকের উক্ত ধারণা আরও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছিল কিন্তু ইংরেজ-স্থপতিগণ ভগ্নোৎসাহ হইবার পাত্র নহেন। তাঁহারা অধ্যবসায়-প্রভাবে ভরোচের নিকটে নর্ম্মদাবক্ষে একটী সেতু নির্ম্মাণ করিয়া লোকের ঐ সংস্কার দূর করিয়াছেন। বাষ্পশকট ষ্টেসন ত্যাগ করিলে আমরা উক্ত সেতুর উপরি ভাগ হইতে রেবাকূলস্থ ভরোচ্‌ নগরীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে করিতে সুরাট অভিমুখে চলিলাম। এখান হইতে ক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, আর রেলপথের উভয় পার্শ্বে কেবল প্রান্তর, তালবন ও মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতমালা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল।

সুরাট বন্দর।

ঠিক সায়ংকালে সুরাট ষ্টেসনে বাষ্প-শকট থামিল। সুরাটের প্রাচীন নাম সুরাষ্ট্রনগরী। ষ্টেসনের অনতিদূরে তাপীনদীর তীরে বর্ত্তমান সুরাষ্ট্র নগরী অবস্থিত। পুরাকালে এই নগরী উচ্চ প্রাচীর-দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল, এখনও স্থানে স্থানে উহার ভগ্নাবশেষ

বিদ্যমান আছে। এই নগরী পুরাকাল হইতে বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে পারসীকেরা এখানে আসিয়া বাস করেন। পূর্ব্বকালে সুরাটে অর্ণবযান নির্ম্মিত হইত। ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ-বণিকেরা এখানে কুঠী নির্ম্মাণ করেন। সুরাষ্ট্র-নগরীর পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসকল তীর্থক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত। ইহার সমীপবর্ত্তিনী তাপীনদীর নামান্তর তপতী। এই নদীর উৎপত্তি সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণের তাপীখণ্ডে লিখিত আছে :—বরুণ অগস্ত্য মুনির শাপে সোম বংশে রাজা সম্বরণ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কঠোর তপঃসাধন করিয়া সূর্য্যকন্যা তাপীকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হন। তাপী অশেষ রূপলাবণ্যবতী ও সর্ব্বপাপনাশিনী। মৎস্যপুরাণ-মতে এই নদী বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে উৎপন্না*। মধ্য প্রদেশের বেতুল জেলায় মূলতাই নগরে একটী তীর্থ আছে। অনেকে ঐ তীর্থকেই তাপীর উৎপত্তি স্থান বলিয়া স্থির করিয়াছেন। তাপী মূলতাই হইতে প্রবলবেগে বহির্গত হইয়া সাতপুরানামক গিরিশৃঙ্গ ভেদ করিয়া খান্দেশ জেলার উচ্চ ভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। তাহার পর, সুরাট জেলায় উপস্থিত হইলে উহা হইতে কতিপয় শাখানদী বহির্গত হইয়াছে। ঐ সকল শাখানদীর মধ্যে পূর্ণা, অরুণাবতী ও গোমতী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। তাপী নদীর উৎপত্তি স্থান হইতে সঙ্গম স্থল সমুদ্র পর্য্যন্ত, উভয়তীর বিবিধবৈচিত্র্যময়। কোন স্থানে অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা, কোথায় ও শ্যামল শস্য-ক্ষেত্র, স্থানে স্থানে

---

* তাপী পয়োষ্ণী নির্ব্বিন্ধ্যা ক্ষিপ্রাচ ঋষভা নদী।
বিন্ধ্যপাদপ্রসূতাস্তাঃ সর্ব্বাঃ শীতজলাঃ শুভাঃ ॥
মৎস্যপুরাণ ১১৪।২৭।

গিরিশৃঙ্গ-বেষ্টিত দুর্গম অরণ্যানী। কোন কোন অংশে লোকালয় নাই, সম্পূর্ণ বিজন। মধ্যে মধ্যে দুই এক ঘর ভীলের বাস আছে। তাপীর সঙ্কীর্ণপথের নাম হরণফাল (হরিণলম্ফ)। একটী সহযাত্রী বলিলেন "হরিণ যেমন উল্লম্ফন করিতে করিতে গমন করে, এই নদীর প্রবাহ ও অল্পপরিসর গিরিপথে সেই রূপে আগমন করিয়াছে" তজ্জন্য ইহাকে হরণফাল বলে। সুরাট হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে গিয়া তাপী সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। তাপীর উভয় তীরে ১০৮টী মহালিঙ্গ বিদ্যমান। স্কন্দপুরাণের তাপীখণ্ডে ঐ সকল লিঙ্গরূপী মহাদেবের মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। ঐ সকল লিঙ্গের মধ্যে চ্যবন-ক্ষেত্রে সুজাতীশ্বর পুরূরবার ক্ষেত্রে নরবাহনলিঙ্গ, বশিষ্টক্ষেত্রে মচুকুন্দেশ্বর, অরুন্ধতীবনে জামদগ্ন্যেশ, শরভঙ্গমুনির ক্ষেত্রে উজ্জ্বলে-শ্বর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। যেখানে তাপী সমুদ্রজলে প্রবেশ করিয়া-য়াছেন, সেখানে ও বারিতাপ্য নামক একটী পুণ্যতীর্থ বিদ্যমান। এখন তপতী বা তাপী "তাপ্তী নামে আখ্যাত এবং বারিতাপ্য "বারি আব" নামে উক্ত হইয়া থাকে। স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে;— আষাঢ় মাসে তাপীতে স্নান করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়* এবং উক্ত মাসে তাপীতীরে যে দীপ দান করে, সে সহস্র কোটি কুলকে উদ্ধার করে। †

* জ্ঞানতোঽজ্ঞানতোবাপি আষাঢ়ে তাপ্নুজাজলম্।
সেবেত মানবো যস্তু যাতি ব্রহ্মসনাতনম্॥

স্কন্দপুরাণ, তাপীখণ্ড ৩।৩০।

† যো দীপদানং কুরুতে আষাঢ়ে তপতীতটে।
কুলকোটিসহস্রাণি স তারয়তি মানবঃ॥

স্কন্দপুরাণ, তাপীখণ্ড ৩।৪১।

সুরাটে অনেকক্ষণ গাড়ী থামে। এখানে নামিবার সঙ্কল্প ছিল। কারণ মনে করিয়াছিলাম প্রাচীন বাণিজ্য-ক্ষেত্রটী কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া দেখিয়া যাইব। কিন্তু যে সময়ে এখানে আগমন করিলাম, ঐ সময়ে অবতরণ করিলে নানা অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে ভাবিয়া পূর্ব্ব সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। সুরাট-নগরীও বেশ সুদৃশ্য। এখানে বল্লভাচার্য্য সম্প্রদায়ের অতি উচ্চ চূড়া-বিশিষ্ট শ্রীনাথজীর মন্দির আছে। ইংরেজ-পল্লীতে অনেক ইংরেজেরবাস ক্লকটাওয়ার (ঘটীস্তম্ভ) ভিক্টোরিয়া-উদ্যান, দাতব্য-ঔষধালয়, ইংরেজীবিদ্যালয় প্রভৃতি অনেক আধুনিক দর্শনীয় বস্তুও দর্শকের অতৃপ্তিকর নহে। এখানকার ধনী পারসীকগণেরও হিন্দু-বণিকগণের সুন্দর অট্টালিকাসমূহ ও বিশেষ সমৃদ্ধির পরিচায়ক। সুরাটের মিষ্টান্ন অতি উপাদেয়।

নৌসরী।

সুরাট নগরী ত্যাগ করিয়া পুনরায় বাষ্পশকট দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইল এবং অনেক প্রান্তর, নদ, নদী, গ্রাম অতিক্রম পূর্ব্বক প্রায় রাত্রি দশ ঘটিকার সময় নৌসরী ষ্টেসনে পৌঁছিল। নৌসরী একটী অতিপ্রাচীন নগরী। গ্রীক্-ইতিহাসিক টলেমি এই নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন। এক্ষণে ইহা মহারাজ গায়কবাড়ের রাজ্যের অন্তর্গত। এখানে মহারাজের নিযুক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট্, জজ্ ও অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ বাস করেন। নৌসরীতে মহারাজের

একটী সেনানিবাস আছে। এখানকার তিনটী রাজভবন ও উদ্যান বিশেষ দৃষ্টিরম্য। ষ্টেসনটী অতিক্ষুদ্র। ষ্টেসনগৃহ, ষ্টেসন-মাষ্টারের ক্ষুদ্রতম আবাস ও তিন চারি খানি মুদীর দোকান ব্যতীত এখানে অন্য কোন আশ্রয় নাই। ষ্টেসন হইতে সহর প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আসিষ্টাণ্ট-ষ্টেসনমাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "বড়োদা হইতে আসিতেছেন, ভাবনা কি? ডাকবাঙ্গালায় গিয়া থাকুন।" রেলপথের পূর্ব্ব-পার্শ্বে উদ্যানের মধ্যে মহারাজের নির্ম্মিত একটী সুন্দর ডাক-বাঙ্গালা আছে। গিয়া দেখি একজন মৃগয়াবিহারী শ্বেতাঙ্গ, সঙ্গিনী ও অনুচরগণ সহ সেখানে অবস্থিতি করিতেছেন। দ্বারদেশে দ্বারবানের মুখেই সেখানে প্রবেশের অনবসর-বার্ত্তা অবগত হইয়া ষ্টেসনে প্রত্যাগত হইলাম। ক্রমে মুদীদিগকে এক টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া অঙ্গীকার করিলাম, তথাপি কেহ থাকিতে স্থান দিল না। তখন ভারবাহীরাও সরিয়া পড়িয়াছে। অগত্যা প্রকাণ্ড ব্যাগের ভারে ক্লিষ্ট হইয়াও উপায়ান্তর না থাকায় একাকী রাজপথ অবলম্বন পূর্ব্বক সহর অভিমুখে চলিলাম। ষ্টেসন হইতে সহর পর্য্যন্ত একটী বৃহৎ প্রান্তর বিদ্যমান। উহার কোথাও কোন লোকালয় নাই। জ্যোৎস্না অস্তগত প্রায়। অচিরে নৈশ-অন্ধকারে সমুদয় অচ্ছন্ন হইয়া যাইবে। সেই সমুদ্রতীরবর্ত্তী অদৃষ্টপূর্ব্ব জনপদের বিজন প্রান্তরে বায়ুবিকম্পিত তালবনের কড় কড় শব্দে আমি অগ্রসর হইতে পারিলাম না, পুনরায় ষ্টেসনে ফিরিয়া আসিলাম। তখন ষ্টেসনমাষ্টার নিদ্রাগত। অনেক বলিয়া এক পদাতিক-পুত্রের নিকট ব্যাগটী দিয়া রাত্রি ১২টার কিছু পূর্ব্বে সহরে পৌঁছিলাম। সেই গভীর রজনীতে রাজপথে শারী শারী

বাটীর গৃহস্বামিসকল নিদ্রাবিষ্ট। আমাদিগকে দেখিয়া কোন পান্থশালার বারান্দা হইতে কুকুর ডাকিয়া উঠিল। কোন রূপে তাহাকে শান্ত করিয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। রাজবাটীর প্রধান দ্বারে আলোক জলিতেছে এবং যমদূতের ন্যায় চারিজন প্রহরী কোমরে তরবারি আঁটিয়া বন্দুক স্কন্ধে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা আমাকে উপস্থিত দেখিয়া বিনীতভাবে বলিল "ইহা রাজকীয় কার্য্যালয়, এখানে সেনাপতি আসেন নাই। এ বাটীর দরজা খুলিবার অধিকার আমাদের নাই। অতএব আপনি শিবালয়ে কিংবা পান্থশালায় গিয়া অবস্থান করুন"। তখন আমি ভাবিলাম "ইহা অপেক্ষা আর এই প্রহরীদের কি ক্ষমতা আছে"? সুতরাং ঐস্থান ত্যাগ করিয়া অপেক্ষাকৃত সন্নিহিত শিবালয়ে উপনীত হইলাম। একটী বাগানের মধ্যে শিবালয়। দক্ষিণদ্বারী মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। পূর্ব্বদ্বারী ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহে নবাগত অভ্যাগত কিংবা সন্ন্যাসিগণ আশ্রয় গ্রহণ করেন। এখানে কোন স্থায়ী লোক নাই, পূজারি দিনের বেলায় পূজাশেষ করিয়া চলিয়া যায়। অনাথমন্দির, যাহার যখন ইচ্ছা হয় আসিয়া বাস করে। আমি উপস্থিত হইলে দ্বিতল হইতে একটী যুবক সন্ন্যাসী আসিয়া নীচের ঘেড়া বারান্দায় আমার স্থান দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার নিকট হইতে লোটা ও দড়ি লইয়া নদীতীরস্থ ইন্দারায় জল আনিতে গেলাম। ঐ নদীর নাম পূর্ণা। রাত্রিকালে উহা সমুদ্রের ন্যায় পরিসরবিশিষ্ট বোধ হইল। উহার জল নিতান্ত বিস্বাদ, মুখে দেওয়া যায় না। নদীর ঘাটের উপরে দুইটী ইন্দারা আছে। উহার একটীর জল বিস্বাদ, একটীর জল সুস্বাদু। এক স্থানের

দুইটী ইদারার জলের ঐরূপ আস্বাদের তারতম্য কেন হইয়াছে বলা দুরূহ। সন্ন্যাসীর কথিত দক্ষিণদিকের ইদারা হইতে জল তুলিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক একখানি শিলাখণ্ডে বসিয়া সন্ধ্যা করিলাম। এখন স্মরণ হইলে মনে ভয়ের সঞ্চার হয় কিন্তু তখন সেই বনাকীর্ণ নদীর তীরদেশে গভীর রজনীতে নদী সম্মুখে করিয়া একাকী বসিয়া সন্ধ্যা করিতে কিছু মাত্র ভয় হয় নাই। নদীর ঘাটও শিবালয় হইতে নিতান্ত নিকটে নহে। যাহা হউক জল লইয়া শিবালয়ে আসিয়া দেখি ভারবাহীটী যাওয়ার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে। আমি কোমরের টাকার থলি হইতে যখন সিকিটী বাহির করিয়া ভারবাহীর হস্তে দিলাম, তখন সন্ন্যাসি-যুবা সস্পৃহ-লোচনে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। তাহার পর, আমি শয্যা প্রস্তুত করিয়া শয়ন করিলে তাঁহার বন্ধু কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তিনি উপরে গেলেন। আমি শয়ন করিলাম বটে কিন্তু সন্দেহ দূর হইল না। সন্নিহিত তমালতরুসমূহের নিবিড় পত্রের ভিতর হইতে সামুদ্রিক প্রদেশের কোন এক পাখীর অশ্রুতপূর্ব্ব কণ্ঠরব নিয়ত হৃদয়ে বিরক্তি উৎপাদন করিতে লাগিল। আমি শুইয়া কত কি চিন্তা করিতে লাগিলাম। যেই চোখে একটু তন্দ্রা আসিয়াছে, অমনি সিঁড়ীতে পদশব্দ শ্রুত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইল। একবার ভাবিলাম মৃত্যুত হইবেই যদি এই শিবালয়ে হয় হউক, ক্ষতি কি? কিন্তু পরক্ষণে পুত্র পরিবারের চিন্তা হৃদয়কে বিচলিত করিয়া তুলিল, সহসা উঠিয়া বসিলাম, আর কোন শব্দ শুনা গেল না। রাত্রি প্রায় দুইটা বাজিতে চলিল, আর বসিয়া থাকিতে পারিলাম না, যেই শুইয়াছি রীতিমত নিদ্রায় অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। ঘুমের ঘোরে হটাৎ যেন কাহার গাত্রের

ছায়া আমার শরীরে পড়িল বলিয়া বোধ হইল। তাড়াতাড়ী উঠিয়া নিমীলিতনেত্রেই জিজ্ঞাসা করিলাম "কে"? সন্ন্যাসি-যুবা উত্তর করিলেন "উপরে বড় গরম, তজ্জন্য নীচে বেড়াইতে আসিয়াছি"। আমি বলিলাম "সন্ন্যাসি-মহারাজ! উপরে হাওয়া অধিক না? সন্ন্যাসী বলিলেন "হাঁ উপরে বেশ হাওয়া, তুমি ইচ্ছা করিলে উপরে যাইতে পার। এই দেবালয়ে সকল অভ্যাগতেরই সমান অধিকার"। আমি "বলিলাম কাহারও নিকটে শুইলে আমার ঘুম হয় না, আপনি উপরে যান, আমি একাকী থাকাই অধিক পছন্দ করি"। সন্ন্যাসী উপরে গেলে আর বিলম্ব না করিয়া নিঃশব্দে দেবালয় ত্যাগ করিয়া রাজপথ অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে চলিলাম। কিছু দূর গেলেই অনতিদূরে আলোক দেখা গেল। নিকটে গিয়া দেখি সেই"পান্থশালা"। বহু পথিক নর নারী বাহিরের দুইটী বারান্দা ব্যাপিয়া শুইয়া আছে। দ্বারবান্‌কে বলিয়া আমি ও দেশলায়ের কাঠার আলোকে শয্যা প্রস্তুত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রাগত হইলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে 'আমি বড়োদা হইতে আসিতেছি' শুনিয়া দ্বারবানেরা বিশেষ সমাদর প্রকাশ করিল এবং বলিল "সেনাপতি মহারাজের আরাসবাটীতে অবস্থান করিতেছেন। কার্য্যালয়ের প্রহরীরা বোধ হয় জানে না, তজ্জন্য আপনাকে বলিতে পারে নাই"। তাহার পর, তাহারা রাজবাটীতে রাখিয়া আসিবার জন্য আমার সহিত একটী লোক দিল। কিছু দূর অগ্রসর হইলেই একটী দরিদ্র-পারসীকপল্লী দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ঘন ঘন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন খোলার ঘর। পাড়ার মাঝখানে নিম্ববৃক্ষতলে একটী বড় ইদারা। প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটী অতসীপুষ্পবর্ণাভা পারসীকমহিলা

সেখানে সমবেত হইয়াছেন। কেহ জল তুলিতেছেন, কেহ ঘড়া পুরিয়া দিতেছেন, কেহ লইয়া যাইতেছেন। ইহাদের দরিদ্রতা-নিবন্ধন সামান্য পরিচ্ছদ হইলেও বর্ণের মাধুর্য্য এবং অঙ্গসৌষ্টব দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহারা ভারতের পূর্ব্বতন অধিবাসী নহে। পারসীক-বালিকারা মাথায় করিয়া ঘড়া বহিতেছে, ইহারা কাঁকালে লইতে জানে না। পারসীকপল্লী অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বাহ্ন সাতটার সময় রাজবাটী উপস্থিত হইলাম। সহরের বিজন অংশে নানাবিধ বৃক্ষরাজি-শোভিত উপবনের মধ্যে রাজকীয় অট্টালিকা-সমূহ বিদ্যমান। দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেই একজন রাজ-কর্ম্মচারী আমাকে সেনাপতি মহাশয়ের নিকট লইয়া গেলেন। অনেকক্ষণ কথোপকথনের পর আমার আহারের ব্যবস্থা করিবার আদেশ হইল। আমি প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক স্নান করিয়া সন্ধ্যা করিতে বসিলে আহার্য্য বস্তু সকল আসিয়া উপস্থিত হইল। নৌসরীতে আমাদের আহার-যোগ্য যে সকল উৎকৃষ্ট বস্তু মিলে উহার কোনটীরই অভাব রহিল না। সুরাষ্ট্রনগরীর উপাদেয় কলাকন্ (সন্দেশ) ক্ষীর, মিষ্টদধি, নির্জ্জল দুগ্ধ, গব্যঘৃত, নবনীত প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আনীত হইল। আমি সেই সূক্ষ্ম তণ্ডুলের অন্ন, উৎকৃষ্ট গোধূমচূর্ণের রোটিকা ডাউল তরকারী, ভাজী ও টক্ প্রস্তুত করিয়া ভোজন শেষ করিলাম। অপরাহ্ন দুইটার সময় আবার জলযোগের ব্যবস্থা করা হইল। ঐ জলযোগের সময় এক প্রকার খরবুজা আনীত হইয়াছিল, ঐরূপ সুমিষ্ট খরবুজা আমি কখনও আহার করি নাই। তিনটার সময় একাকী ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। একটী উদ্যান ত্যাগ করিলেই প্রান্তর, তাহার পর বেলাভূমি। ঠিক সমুদ্রতটে

মহারাজের একটী মনোহর প্রাসাদ আছে, উহা দূর হইতে বড় সুন্দর দেখায়। ঐ প্রাসাদ পর্য্যন্ত যাওয়া ঘটিল না, কিঞ্চিৎ দূর হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পুনরায় নগরে প্রবেশ করিলাম। নৌসরীর "অগ্নিমন্দির" একটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ দর্শনীয় পদার্থ। পারসীকগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়া প্রথমে এই স্থানে অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক আবাস গ্রহণ করেন। অন্যত্র ভরোচ, সুরাট্, বোম্বাই পুণা প্রভৃতি পারসীক-অধিষ্ঠিত স্থানে অগ্নিমন্দির থাকিলেও নৌসরীর অগ্নিমন্দির, উক্ত সম্প্রদায়ের একটী পরমপূজ্য তীর্থবিশেষ। সেই পুরাকাল হইতে প্রতিদিন ইন্ধন অর্পণপূর্ব্বক পারসীকগণ তাঁহাদের আদিম জন্মভূমি পারস্যদেশ হইতে আনীত হুতাশনকে অতিযত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। অগ্নি-মন্দিরও ধনী পারসীকগণের শ্রেণীবদ্ধ মনোহর সৌধমালা সন্দর্শন-পূর্ব্বক বণিক্‌পল্লীর মধ্য দিয়া রাজকীয় ধর্ম্মাধিকরণের নিকট উপস্থিত হইলাম। কিন্তু সেখান হইতে কোন পথে রাজবাটী যাইতে হইবে উহা ভুলিয়া গেলাম। নৌসরীর রাজপথ অন্যান্য নগরীর রাজপথের ন্যায় লোকবহুল নহে। এমন কি অনেক দূর অগ্রসর হইয়াও কোন লোকের সাক্ষাৎ পাইলাম না। রাজপথের উভয় পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ অট্টালিকা দেখা যায়, অথচ মানুষ নাই। সকলেই ঐসময় সান্ধ্যভ্রমণে বহির্গত হইয়াছে। আমি বড়ই চিন্তা-কুল হইয়া দ্রুতপদে যাইতেছি, এমন সময় মনোহর পরিচ্ছদে ভূষিতা দুইটী সুন্দরী পারসীক-মহিলার সহিত দেখা হইল। তাঁহাদের নিকট রাজবাটীর পথের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা অতিপ্রসন্নবদনে প্রথম ইংরেজী-ভাষায়, তাহার পর, হিন্দুস্থানীতে কোন দিক্ দিয়া কোন্ কোন্ পথে যাইতে হইবে বলিয়া দিলেন। অনন্তর,

আমার মুখের দিকে তাকাইয়া বুঝিলেন নিতান্ত নবাগত আমি সকল রাজপথের ধারণা করিতে পারি নাই। তখন বলিলেন "আমাদের সঙ্গে আসুন।" তাঁহারা প্রায় অর্দ্ধ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া রাজবাটীর দরজায় আমাকে রাখিয়া প্রত্যাগমন করিলেন। আমি সেই সদাশয় মহিলাদ্বয়ের ধন্যবাদ করিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। মৌসরী নগরীটা পারসীক-সম্প্রদায়ের জন্যই প্রসিদ্ধ। অনেকেই পারসীক-জাতির কথা শুনিয়াছেন এবং কেহ কেহ এই সুসভ্য সম্প্রদায়ের নরনারীর আচার ব্যবহারও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কিন্তু সকলে বোধ হয় ইহাদের ইতিবৃত্ত অবগত নহেন। তজ্জন্য এখানে প্রসঙ্গক্রমে পারসীক-সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

পারসীক জাতি। পারসীক জাতির আদিম বাসস্থান পারস্য। পূর্ব্বকালে পারস্যরাজ্য পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর হইতে পূর্ব্বে সিন্ধুনদী পর্য্যন্ত এবং উত্তরে ককেসস্ পর্ব্বতমালা হইতে দক্ষিণে পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই পারস্যের আদিম অধিবাসিগণই পারসীক নামে আখ্যাত। পারসীকগণ আর্য্যজাতির একটী প্রধান শাখা। পুরাকালে আর্য্যগণ কাশ্মীরের উত্তরে বিন্দুসরোবর-সন্নিধানে বাস করিতেন। উক্ত বিন্দুসরোবরই বেদোক্ত অতিপবিত্র সরস্বতী নদীর উৎপত্তিস্থান। অথর্ব্ববেদে ঐ স্থান "প্রত্নৌকস্" অথবা প্রাচীনগণের আবাস বলিয়া উক্ত আছে। ঐ স্থান হইতে আর্য্যগণ ক্রমে কাশ্মীরে আসিয়া বসতি করেন। তাহার পর, একভাগ পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, অপর ভাগ সিন্ধুনদী পারহইয়া পারস্ নামক স্থানে গিয়া বাস করেন। এই পারসের অধিবাসী আর্য্যগণই পারসীক নামে প্রসিদ্ধ। যখন সিন্ধু-পারগামী

আর্য্যগণ, ভারতবর্ষগামী আর্য্যসম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হন, তখন বোধ হয় তাঁহাদের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন রূপ মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল। তজ্জন্য ভারতীয় আর্য্যগণের ধর্ম্মশাস্ত্র বেদে দেবগণের অর্চ্চনা ও অসুরগণের নিন্দা কীর্ত্তিত হইয়াছে। পারসীকগণের অবস্তা গ্রন্থে অসুরের (অহুরের) পূজা ও দেবগণের কুৎসা বর্ণিত আছে। কিন্তু যখন ইহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হন নাই, তখন সকলেই অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, ইন্দ্র, নাসত্য (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) প্রভৃতির উপাসক ছিলেন। অদ্যাপি অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণের নিত্য অগ্নিতে হোম ও পারসীকগণের অগ্নির উপাসনা সমভাবে বর্ত্তমান আছে। সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন দেশে অবস্থান করিয়া বিভিন্ন রাজবিপ্লব ও ধর্ম্মবিপ্লবের মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়ায় এই উভয় জাতির ভাষা ও আচার ব্যবহারগত এত পার্থক্য ঘটিয়াছে যে, এই উভয় জাতি পূর্ব্বে যে এক ছিল, উহা অনুমান করাও দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ ভাষাতত্ত্বের পর্য্যালোচনা দ্বারা এই উভয় জাতির আশ্চর্য্যরূপ ঐক্য প্রদর্শন করিয়াছেন। যখন পারসীকগণের ও ভারতীয় দ্বিজাতিগণের পূর্ব্বপুরুষগণ অবিচ্ছিন্ন অবস্থায় বর্ত্তমান ছিলেন, তখন যে সকল শব্দ সৃষ্ট হইয়াছিল, উহা অদ্যাপি উভয় জাতির মধ্যে তুল্য অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। তবে আকারগত ও উচ্চারণগত যে কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ, উহা কেবল উভয় জাতির মধ্যে ভাষার বিবর্ত্তন বশতঃ ঘটিয়াছে। আমরা এখন বেদে যে ভাষা দেখিতে পাই, উহা আদিমতম আর্য্য-ভাষা নহে, কালপ্রভাবে রূপান্তরিত। পারসীকগণেরও সে আর্য্যভাষা নাই, তাহার স্থানে অভিনবজাত জেন্দভাষা আপন অধিকার বিস্তার করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু উক্ত জেন্দ ভাষার অভ্যন্তরে সেই প্রাচীন শব্দ সমূহের অনেকগুলি

কঙ্কাল দৃষ্ট হয়। ভারতীয় বৈদিক সূক্তের অথর্ব্বন্, বৃত্রহন্, অঙ্গিরস্, অর্য্যমন্, কাব্য উশনস্, নাসত্য, মিত্র, যম, অসুর, বায়ু, সোম, আর্য্য প্রভৃতি শব্দ জেন্দভাষায় আবস্তিক গ্রন্থে যথাক্রমে আথ্রবন্, বেরেথ্রঘ্ন, অঙ্গ্র, অইর্যমন্, কবউশ, নাওংহইথ্য, মিথ্র, যিম, অহুর, বয়ু, হোম, অইর্য্য, প্রভৃতি আকার ধারণ করিয়াছে বটে, কিন্তু অর্থগত কোনই বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই। এই সকল দেখিয়া পারসীকগণ যে আর্য্যগণের একটী প্রধান শাখা সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না। প্রথমে পারসীকগণ ভারতীয় আর্য্যগণের ন্যায় অগ্নি, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, নাসত্য প্রভৃতির উপাসনা করিতেন, শেষে জরথুস্ত্র-নামক এক মহাপুরুষ পারসীকজাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়া বর্ত্তমান ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠা করেন। বেদের সহিত পারসীকগণের ধর্ম্মগ্রন্থ অবস্তার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। উহারও কোন অংশে দেবগণের স্তুতি, কোন অংশে কথোপকথনচ্ছলে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যনির্ণয়, কোন অংশে বা দেবগণের গুণবর্ণনা আছে। কি জন্য পারসীকগণ পারস্য ত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন এবং তাঁহাদের বর্ত্তমান আচার ব্যবহার কি প্রকার উহা সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

অনুমান ৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে আরবগণ পারস্যদেশ জয় করিয়া ঐ দেশে মুসলমান-ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করে, ইহাতে অনেক পারসীক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণে বাধ্য হয়। কতকগুলি স্বধর্ম্মানুরাগী পারসীক প্রাচীন জরথুস্ত্র-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত পরিত্যাগপূর্ব্বক মহম্মদীয় ধর্ম্ম গ্রহণে অসম্মত হইয়া পারস্য হইতে পলায়নপূর্ব্বক খোরাসান প্রদেশে (বর্ত্তমান আফ-গানিস্থান ও বেলুচিস্থানে) আসিয়া প্রায় একশত বৎসর বাস

করেন। আরবগণ সেখানে আসিয়া পুনরায় তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। আবার তাঁহারা সে স্থান ত্যাগ করিয়া অর্ণবযানে আরোহণ-পূর্ব্বক পারস্যোপসাগরের অর্ম্মজদ্বীপে আসিয়া বসতি করেন। সেখানেও আরবগণকে সমাগত দেখিয়া প্রায় সাত শত পারসীক স্ত্রীপুত্র সহ নিরাশহৃদয়ে উক্ত দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া আরবসাগর অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করেন। কয়েক দিবস গমনের পর তাঁহারা এক প্রকার ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়েন। সহসা কুকুরের শব্দে জানিতে পারেন যে, স্থলভূমি অতিসন্নিহিত। তাহার পর, তাঁহারা কাম্বে উপসাগরের অন্তর্গত ডিউ নামক স্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন কিন্তু দ্বীপভূমি বাসযোগ্য নয় ভাবিয়া গুজ-রাটের দক্ষিণপ্রান্তে সঞ্জানা নামক স্থানে অবতরণ করেন। তখন জয়দেব নামা এক রাজা সঞ্জানার অধীশ্বর ছিলেন। তিনি বিবাহকালে বৈদিক-মন্ত্রপাঠ এবং রাজার আদেশ ব্যতীত অস্ত্রধারণ-নিষেধ, এই রূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া নিজ রাজ্যে পারসীকদিগকে বসতি করিতে আজ্ঞা করেন। কিছুকাল সঞ্জানায় বাস করার পর পারসীকগণ পুনরায় নবাগত আরব-গণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। তাহার পর, সেখান হইতে পলায়ন করিয়া বাহারত নামক কোন দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে কিছুকাল প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করেন। ক্রমে বংশ বিস্তৃত হওয়ায় উক্ত স্থান হইতে বান্‌সা এবং বান্‌সা হইতে নৌসরীতে আসিয়া স্থায়ি-রূপে বাস করেন। এই নৌসরীই পারসীকগণের ভারতীয় আদিম বাসভূমি;এবং এই স্থানের অগ্নিমন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সুতরাং ইহা পারসীক সম্প্রদায়ের নিকট একটী তীর্থরূপে পরিগণিত। এখন ভরোচ, সুরাট, বোম্বাই ও পুণাপ্রভৃতি স্থানে যে সকল

পারসীক দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা নৌসরী হইতে গিয়া ঐ সকল স্থানে বাস করিয়াছেন। ভারতীয় পারসীক-গণ আপন মনীষা ও ব্যবসায়-বুদ্ধি-প্রভাবে একটী ধনবান্ ও ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়রূপে পরিগণিত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রাণান্তে ও স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করেন না। পারসীক-গণের ধর্ম্মগ্রন্থ একুশখানি। উহার সাধারণ নাম নস্ক্। ঐ সকল গ্রন্থ জরথুস্ত্র-প্রণীত। পারসীকগণ অগ্নি সূর্য্য প্রভৃতির উপাসক হইলেও জরথুস্ত্রের বিধানানুসারে সম্পূর্ণ একেশ্বরবাদী। তবে ভারতীয় হিন্দুগণের প্রতিবেশী হওয়া অবধি মধ্যে মধ্যে কোন কোন দেবদেবীর উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহারা বৎসরের মধ্যে ছয়টী সাধারণ উৎসব সম্পন্ন করেন। প্রথম, অর্দ্দি-বেহেস্ত যশন্ উৎসব। ইহা অগ্নিদেবতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনার্থ অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন পারসীকগণ অগ্নিমন্দিরে সমবেত হইয়া জগদীশ্বরের উপাসনা করেন। দ্বিতীয়, অব্‌অর্দ্দ্ইসুরযশন্ উৎসব। ইহা অপ্ নামক সমুদ্র দেবতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত সম্পন্ন হইয়া থাকে। ঐ দিন পারসীকগণ কোন নদী বা সমুদ্রতীরে গমন করিয়া জগদীশ্বরের উপাসনা করেন। তৃতীয়, অমরদাদ-সাল পর্ব্বাহ। চতুর্থ, পতেতি নৌরোজ বা নববর্ষোৎ-সব। পারস্যরাজ যজ্‌দেজার্দ্দের সম্মানার্থ ১লা ফরবরদিনে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ঐ উপলক্ষে পারসীকগণ সকলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও দরিদ্রদিগকে দান করেন। পঞ্চম, রাপ্থি-বার উৎসব। ইহা অগ্নিদেবতা অর্দ্দিবেহেস্তের সম্মানার্থ সম্পন্ন হয়। ষষ্ঠ, খুরদাদ-সাল উৎসব। ইহা বর্ত্তমান পারসীক ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক জরথুস্ত্রের সম্মানার্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বাল্যাবস্থায় পারসীক বালক বালিকারা রেশমী জামা ব্যবহার করে তাহার পর, সপ্তমবর্ষ বয়সে বালকেরা উপবীত ধারণ করে, ইহা কস্তি গ্রহণ সংস্কার নামে কথিত। এই সময় হইতে তাহারা রেশমী জামা পরিত্যাগ করিয়া "সদরো" নামক পবিত্র জামা ব্যবহার করিতে থাকে। উপবীত গ্রহণের পর, পারসীক বালকেরা জন্দ অবস্তার কতিপয় স্তোত্র মুখস্থ ও জরথুস্ত্র-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের সাধারণ বিষয় গুলি শিক্ষা করিয়া থাকে। পারসীক-সম্প্রদায়ে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিষিদ্ধ নহে। পারসীকগণের নিজবাটীতে বিবাহ হয় না। প্রত্যেক পারসীক-পল্লীতে একটী করিয়া বিবাহমন্দির আছে। বিবাহদিবসে বর ও কন্যা স্ব স্ব স্নানাগারে প্রবেশপূর্ব্বক প্রথমে গোমূত্র ও তাহার পর, বালুকা দ্বারা সর্ব্বশরীর ধৌত করিয়া স্নানকার্য্য সম্পন্ন করেন। অনন্তর তাঁহারা যথাক্রমে নূতন জামা পিশোরী * ও শাড়ী পরিধান পূর্ব্বক কয়েকটী দাড়িম্বপত্র চর্ব্বণ করিয়া নিজ গৃহে আসিয়া উপবেশন করেন। তাহার পর, কন্যার মাতা একখানি থালায় সাতটী নারিকেল স্থাপনপূর্ব্বক ঐ থালা লইয়া বরের গৃহে গমন করেন এবং উক্ত নারিকেলপূর্ণ থালা মস্তকোপরি সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া বরকে বিবাহসভায় আসিবার জন্য সাদরে আহ্বান করেন। বর ও কন্যা বিবাহমণ্ডপে আগমন করিলে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক কতকটা হিন্দুপ্রথার ন্যায় পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করেন। এই সময় তপ্তকাঞ্চন-বর্ণাভা পারসীকযুবতীরা বহুমূল্য রেশমী শাড়ী ও হীরকের

* জামা পিশোরী (জোব্বা ও চাদর) ইহা পারসীকগণের পবিত্র পরিচ্ছদ।

অলঙ্কারে সুশোভিত হইয়া কোন সুসজ্জিত গৃহের মধ্যভাগে একটী উজ্জ্বল প্রদীপ স্থাপনপূর্ব্বক উহার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মধুর হাস্য ও করতালী সহ নৃত্য গীত করিতে থাকেন। তখন ঐ বিবাহভবন অপ্সরোমণ্ডলী-পরিশোভিত অমরাবতীর ন্যায় অপূর্ব্ব সুষমা ধারণ করে। পারসীক-বালিকাদের অল্পবয়সে বিবাহ হইলেও রীতিমত বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা স্বামি-গৃহে গমন করিতে পারে না। পারসীক-রমণীরা সকলেই প্রায় পতিব্রতা। তাঁহারা স্বামীর নাম ধরিয়া আহ্বান করেন না। পারসীকেরা গোমাংস ও শূকরমাংস স্পর্শও করেন না। এই সম্প্রদায়ের লোকের মধ্যে ধূমপানও নিষিদ্ধ। গোমূত্র পারসীকদিগের নিকট অতিপবিত্র বস্তু বলিয়া গণ্য। তাঁহারা নিদ্রাভঙ্গের পর গোমূত্র হস্তে মুখে দিয়া তৎপরে হস্তমুখাদি ধৌত করিয়া ফেলেন। প্রত্যেক ধার্ম্মিক পারসীক দিবসে যোলবার উপাসনা করেন। উপাসনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহারা হস্তমুখ প্রক্ষালনপূর্ব্বক উপবীত খুলিয়া ফেলেন এবং উপাসনা শেষ হইলে পুনরায় উহা গ্রহণ করেন। উপাসনারম্ভে সারসনামক স্বর্গীয় দূতের স্তুতিপাঠ করা হয়। স্ত্রীলোকেরাও উপাসনা করিয়া থাকেন। সন্তান হইবার পর দশ দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যেক পারসীক-রমণীকে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিয়া অশৌচ পালন করিতে হয়। পারসীক-গৃহস্থের প্রত্যেকের গৃহে পবিত্র অগ্নি রক্ষিত হয় এবং প্রতিদিন উহাতে ইন্ধন প্রদত্ত হয়। ইহারা গোজাতিকেও অত্যন্ত ভক্তি করেন। সকলের গৃহেই একটী করিয়া বৃষ পরিপালিত হইয়া থাকে। পারসীকেরা বলেন "পবিত্র চিন্তা কর, পবিত্র বাক্য প্রয়োগ কর, এবং পবিত্র কার্য্য কর"। ইহারা ঋণগ্রহণ করাকে অত্যন্ত ঘৃণা

করেন। পারসীকেরা বলেন "ঋণীকে বাধ্য হইয়া মিথ্যা বলিতে হয়"। পারসীক জাতির আর একটী মহত্ব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এই জাতিতে বেশ্যা ও ভিক্ষুক নাই।

পারসীকদিগের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এক প্রকার অদ্ভুত প্রণালীতে সম্পন্ন হয়। যে সকল চিকিৎসক, পারসীকরোগীর চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত হন, জীবনের আশা না থাকিলে পূর্ব্বেই তাঁহাদিগকে উহা রোগীর আত্মীয়দিগকে জানাইতে হয়। আত্মীয়গণ মুমূর্ষু-অবস্থায় আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির মুখে গব্য ঘৃত মাখাইয়া গৃহপালিত সারমেয়কে ঐ মুখ লেহনে নিযুক্ত করেন। কুকুর মুমূর্ষুর মুখ না চাটিলে লোকে উহাকে পাপী বলিয়া সন্দেহ করে। তজ্জন্য আত্মীয়েরা যে কোন উপায়ে মুমূর্ষুর মুখ চাটাইয়া লয়েন। মৃত্যু হইলে পারসীকেরা শ্বেতবস্ত্রদ্বারা শবদেহ আচ্ছাদিত করিয়া লৌহ খাটে স্থাপনপূর্ব্বক শববাহকদ্বারা দোখ্মায় লইয়া যান। এই দোখ্মার অর্থ, প্রেতগৃহ বা শুষ্কাগার। মৃতদেহ প্রেতগৃহে আনীত হইবার সময়ে সর্ব্বাগ্রে এক ব্যক্তি দুই খানি রুটি লইয়া যায়। তৎপর শববাহকেরা, তাহার পর, একটী শ্বেতবর্ণ কুকুর এবং সর্ব্বশেষে শুভ্রপরিচ্ছদে আবৃতদেহ পুরোহিত ও বন্ধুবান্ধবগণ গমন করেন। বান্ধবগণ প্রত্যেক দুই জনে একখানি করিয়া রুমালের দুই ধার ধরিয়া শবদেহের অনুসরণ করেন। মৃতদেহ প্রাচীর-বেষ্টিত আচ্ছাদনশূন্য বৃহৎ প্রেতনিকেতনের ৩০ হাত দূরে স্থাপন করিয়া কুকুরটীকে লইয়া দেখান হয় এবং ঐ কুকুরকে রুটি খাইতে দেওয়া হয়। এই প্রথার নাম "সগ্‌দাদ"। ইহার পর, শববাহকেরা প্রেতক্ষেত্রে শবদেহ লইয়া গিয়া অনাবৃত করিয়া রাখে। ঐ কার্য্য সম্প[illegible] তাহারা নিকটবর্ত্তী জলাশয়ে স্নান করতঃ পরিচ্ছদ

ছাড়িয়া নূতন পরিচ্ছদ পরিয়া চলিয়া যায়। প্রেতগৃহ মধ্যে মৃতদেহ স্থাপিত হইবামাত্র সমীপস্থ তরুশাখা হইতে গৃধ্র শকুনি কাক প্রভৃতি মাংসলোলুপ পক্ষিগণ সবেগে আপতিত হইয়া উহা কঙ্কালাবশেষ করিয়া ফেলে। হিন্দুদের ন্যায় পারসীকগণেরও দশমদিবসে পুরক-পিণ্ডের ন্যায় একটা ব্যাপার সম্পন্ন হইয়া থাকে। হিন্দুরা যেমন শ্রাদ্ধাদির সময় কুশ ব্যবহার করেন পারসীকেরাও তদ্রূপ এক প্রকার তৃণ ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই সকল আচার ব্যবহার সন্দর্শনে পারসীকেরা যে প্রাচীন আর্য্য-জাতির একটি শাখা সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ থাকে না।

পারসীক-সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত প্রকটনে পুস্তকের অনেকাংশ ব্যয়িত হইয়াছে, এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করা যাউক। রাজবাটীতে আসিয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাপ্ত করিলাম। তাহার পর, জলযোগ শেষ করিয়া সেনাপতি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি আমাকে কিছুদিন নৌসরীতে থাকিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু আমি আমার সময়ের সংক্ষিপ্ততা জানাইয়া ঐ দিবসই রাত্রি ১০টার ট্রেনে বোম্বাই গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। সেনাপতি একটু চিন্তা করিয়া একজন কর্ম্মচারীর প্রতি আমার পাথেয় প্রদানের আদেশ করিয়া আমার সহিত বসিয়া গল্প করিতে লাগিলেন। এ পর্য্যন্ত অনেক ব্যক্তির সহিত আলাপ হইয়াছে কিন্তু বিষয়ী লোকের মধ্যে এরূপ শিষ্ট ও মিষ্টভাষী বিরল। যথা সময়ে পাথেয় উপস্থিত হইল, আমি পূর্ব্বে কল্পনাও করি নাই যে, আমার ভ্রমণের সমুদয় রেলভাড়া সেনাপতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবে। যাহা হউক সংস্কৃত-শাস্ত্রব্যবসায়ীদের গ্রহণে আলস্য নাই, সুতরাং উহা লইয়া সেনাপতির নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ

করিলাম। পূর্ব্বেই দ্বারবানেরা একখানি অশ্বশকট ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। উহাতে আরোহণপূর্ব্বক অবিলম্বে ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। কিছুক্ষণ পরেই ট্রেন্ আসিল, সমুদয় গাড়ীই লোকে পরিপূর্ণ। অবশেষে আসিষ্টাণ্ট-ষ্টেসন-মাষ্টারের সাহায্যে একখানি গাড়ীতে স্থান পাইলাম। রাজপুতানার মরুভূমির লোক ভারত-বর্ষের সকল প্রদেশেই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। আমি যে গাড়ীতে উঠিলাম উহা মারোয়ারী স্ত্রীপুরুষে পূর্ণ। গাড়ী ষ্টেসন ত্যাগ করিলেই স্তন্যপায়ী মারোয়ারী শিশু রোদন আরম্ভ করিল, রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত তাহার স্বর অব্যাহত ছিল। শেষরাত্রে আমি ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রভাতে বাষ্পশকট বোম্বাই নগরীর সন্নিহিত হইলে এক বৃদ্ধ আমাকে ডাকিয়া তুলিল। তখন রেলশকট একটী জলাভূমির মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছিল।

বোম্বাই নগরী।

৩০শে বৈশাখ প্রত্যূষে বোম্বাই নগরীস্থ বান্দারা ষ্টেসনে অব-তরণ করিলাম। এই নগরী একটী দ্বীপের উপরিভাগে অবস্থিত। পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে মহাসমুদ্র। উত্তরদিকে ও যে এক সময় সমুদ্র ছিল রেলপথের উভয় পার্শ্বস্থ সুদূরব্যাপী জলময় স্থান দেখিয়াই সহজে উহা অনুমান করা যায়। বম্বে দ্বীপে প্রথমে কোন সভ্যজাতির বাস ছিল না। পূর্ব্বে এই স্থান প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সামুদ্রিক সর্প ও অন্যান্য জলচর এবং স্থলচর হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ

ছিল। জলদস্যুরা নৌকারোহণে প্রচ্ছন্নভাবে ইহার নিকট অবস্থান করিত। বৈদেশিক বণিক্‌গণ দুস্তর সমুদ্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক এই স্থলভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিলে তাহারা অর্থ ও পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠনপূর্ব্বক তাহাদের প্রাণবিনাশ করিয়া প্রস্থান করিত। ভারতসম্রাট্ সেকেন্দরলোদীর সময়ে পর্ত্তুগীজ্‌গণ ভারতবর্ষে আগমনপূর্ব্বক দক্ষিণাপথের অশ্বারোহী দস্যুগণের অগম্য বলিয়া এই দ্বীপভূমিতে বাণিজ্যাগার নির্ম্মাণ করেন এবং ইহার "বন্‌বে"(উৎকৃষ্ট বন্দর) এই নাম রাখেন। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ পর্ত্তুগালের রাজকুমারী ইন্‌ফেণ্টাকেথিরিন্‌কে বিবাহ করিয়া যৌতুকস্বরূপ বোম্বাই-নগরী প্রাপ্ত হন। সেই সময় হইতে ইহা ইংরেজ অধিকারে আসিয়াছে। এখন সমৃদ্ধিতে ব্রিটিস্‌নগরী লণ্ডনের নিম্নেই বোম্বাই নগরীর স্থান।

শকট হইতে অবতরণ করিয়া একখানি ঘোঁড়ার গাড়ী ভাড়া করিলাম। কিন্তু যে বাঙ্গালী বাবুটীর বাসায় থাকার কথা ছিল, তাঁহার বাসার অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলাম না। নগরীর লোকাধিক্যই উহার কারণ। এই নগরে মহারাষ্ট্রী গুজরাটী মারোয়ারী পাঞ্জাবী তৈলঙ্গী উড়িয়া পার্শী মুসলমান্ জাপানী বার্মিজ্ ও নানা-শ্রেণীস্থ য়ুরোপীয় জাতির এতদূর ভিড় যে, নগরে প্রবেশ করিলে যেন কেমন এক প্রকার দিশেহারা হইয়া যাইতে হয়। নানাভাষা-ভাষী লোক, কেহ কাহারও কথা বুঝেনা, সামান্য কয়েকটী বাঙ্গালী বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে আছেন, তাঁহারা কে কোথায় থাকেন, অনেকেই তাহার সন্ধান জানে না। বিশেষতঃ বোম্বাইবাসী অনেক হিন্দু পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানী ও বাঙ্গালীর পার্থক্য বুঝেনা। অগত্যা কাল্‌কা-

দেবী-রোডে এক বাঙ্গালী মণিকারের* বিপণিতে উপনীত হইলাম। তত্রত্য কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত নীলমণি মুখোপাধ্যায় নামক এক ব্রাহ্মণ-যুবার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি সাদরে আমাকে গ্রহণ করিলেন। কালকাদেবী রোডের ঠিক উপরিস্থ একটী বড় বাটীর একাংশ উক্ত মণিকারের অধিকৃত। দোতলায় একটী ঘরে কার্য্যালয় ও অপর কয়টী ঘর, কর্ম্মচারীদের বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। মণিকারের পরিবারেরা অন্য একটী বাটীতে অবস্থান করেন। একটী ঘরে আমার বাসস্থান নির্ণীত হইল। পূর্ব্বোক্ত ভ্রাতৃকল্প নীলমণি বাবুর যত্নে বোম্বাই-নগরীতে অবস্থান-কালে আমার কোনই অসুবিধা হয় নাই। ভারতবর্ষের নিখিল পুণ্যনদীর গম্যস্থল মহার্ণব, অতএব তীর্থরাজ সমুদ্রের পুণ্যসলিলে অবগাহন করা একান্ত কর্ত্তব্য বিবেচনায় প্রাতঃকৃত্য হস্ত মুখ প্রক্ষালনান্তে সাগরে গমন করিলাম। এখানকার মহার্ণবের সুনীল জলরাশি সমধিক তরঙ্গসঙ্কুল নহে। সমুদ্রের লবণাক্ত সলিলে স্নান সন্ধ্যা শেষ করিয়া পুনরায় বাসায় আসিয়া মিষ্ট জলে (মিঠা পানীতে) সর্ব্বশরীর বিধৌত করিলাম। পাকের উদ্‌যোগ হইতেছে, এমন সময় শিবানন্দব্রহ্মচারী নামক এক প্রবীণ বাঙ্গালী সাধু সেখানে আগমন করিলেন। ব্রহ্মচারী গৈরিক-বসন ও সর্ব্বদা কাষ্ঠ-পাদুকা ব্যবহার করেন। অনেক দিন যাবৎ নগরীতে অবস্থান করায় ইঁহার অনেকের সহিত পরিচয় হইয়াছে। ব্রহ্মচারী শিবানন্দ সরল ও মিষ্ট কথায় মানুষকে হাঁসাইতে পারেন।

---

* উক্ত মণিকারের নাম শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দাস। রাজা মহারাজদের অন্তঃপুরে ব্যবহারের জন্য ইনি কারকর রাখিয়া বহুমূল্য হীরকের অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

মুম্বাদেবী সন্দর্শন। আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া ৩টার সময় নগর সন্দর্শনে বাহির হইতেছি, দ্বারদেশে একটী একবিংশ কি দ্বাবিংশ-বর্ষবয়স্ক বাঙ্গালী পরিব্রাজকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। ইহারও গৈরিক পরিচ্ছদ। বিশেষত্বের মধ্যে ইনি ইংরেজী বাঙ্গলা ও কিছু কিছু সংস্কৃত জানেন। এই উদাসীন যুবা অত্যন্ত চতুর, কথা বলিবার সময় যেন নাক মুখ দিয়া কথা বাহির হয়। তিনিও ঐ দিন বম্বে আগমন করিয়াছেন। আমাকে গমনোৎসুক দেখিয়া পুনরায় দেখা করিবেন বলিয়া চলিয়া গেলেন কিন্তু আর সাক্ষাৎ হইলনা। বম্বের রাজপথে কেবল জনতা। সেই গাড়ী ঘোঁড়া ও মানুষের ভিড় ঠেলিয়া অনেকক্ষণ পরে মুম্বাদেবীর মন্দিরে উপনীত হইলাম। একটী জলাশয়-তীরে উক্ত দেবীর মন্দির। জলাশয়ের চতুর্দ্দিকে পাষাণনির্ম্মিত সোপানশ্রেণী, তীরদেশে নানাবিধ দেবমন্দির। স্থানীয় হিন্দুরা বলেন ;—মুম্বাদেবীর নামেই এই নগরের নাম মুম্বই হইয়াছে। বৈদেশিকেরা মুম্বই শব্দকে অপভ্রংশ করিয়া বোম্বে বা বোম্বাই শব্দে পরিণত করিয়াছে। তাঁহাদের মতে পর্ত্তুগিজদের আগমনের পূর্ব্বেও মুম্বাদেবী বিদ্যমান ছিলেন। তজ্জন্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা ও বণিকেরা "শ্রীমুম্বই" লিখিয়া থাকেন। মুম্বাদেবীর মন্দিরে এত ভিড় যে, অনেক কষ্টে দর্শন ও প্রণামাদি শেষ করিতে হইল। তাহার পর, উহার অনতিদূরবর্ত্তী ভুলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে উপস্থিত হইলাম। একটী অতিবৃহৎ মন্দিরে উক্ত মহাদেব বিরাজমান। সিদ্ধি এবং ধুস্তুরপ্রিয় অবধৌত ও সন্ন্যাসিগণ মন্দিরের চতুর্দ্দিকে দূরে দূরে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করিয়া ঔষধার্থিনী বন্ধ্যা নারী ও রোগক্লিষ্টদের আত্মীয় স্বজনের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। বণিক্‌মহিলাদের

ভিড়ে ভুলশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করা দুরূহ। গুজরাটী নিতম্বিনীরা পুরুষদের বড় গ্রাহ্য করেন না। বহু আয়াসে ভুলেশ্বরের সন্দর্শন ও প্রণিপাত করিয়া মন্দির হইতে নির্গত হইলাম। এই পল্লীতে অনেকগুলি জৈনমন্দিরও আছে। প্রত্যেক মন্দিরে পার্শ্বনাথের সুবর্ণ ও হীরক-মণ্ডিত উজ্জ্বল মূর্ত্তি বিরাজমান।

সমুদ্রতীর। অপরাহ্ণ পাঁচ ঘটিকার সময় নগর-সন্নিহিত সমুদ্রতীরে (ব্যাক্‌বে) নামক স্থানে ভ্রমণার্থ গমন করিলাম। তত্রত্য সাগরতটের শোভা অনির্ব্বচনীয়। পশ্চিমভাগে প্রশান্ত জলধির অনন্ত নীলাম্বুরাশি স্তরে স্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গমালা বক্ষে ধারণ করিয়া পুরোভাগস্থ মহানগরীর অসীমসৌভাগ্য সূচিত করিতেছে। উত্তর পশ্চিম কোণে বালুকেশ্বর শৈলবর সুরম্য হর্ম্ম্য ও উদ্যানরাজি মস্তকে করিয়া দণ্ডায়মান। পূর্ব্ব দক্ষিণে আলোক-গৃহ, রাজাবাই-স্তম্ভ প্রভৃতি দর্শনীয় পদার্থসকল শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বদিকে নিউমার্কেট্ ও কাল্‌কাদেবীরোড্ প্রভৃতি স্থানের ত্রিতল পঞ্চতল সপ্ততল সৌধমালা শ্রেণীবদ্ধভাবে বিরাজিত হইয়া বাণিজ্য-প্রধান অক্ষিনগরীর অধিবাসিগণের ঐশ্বর্য্যগরিমা প্রকাশ করিতেছে। প্রান্তরের একাংশ দিয়া "বম্বে-বড়োদা-সেণ্ট্রাল্‌ইণ্ডিয়া" নামক রেলপথে বাষ্পশকট কোলাবা হইতে বান্দারা পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্তে গমনাগমন করিতেছে। উল্লিখিত লৌহপথের পশ্চিম পার্শ্ব হইতে সমুদ্র-সলিল পর্য্যন্ত আয়ত দূর্ব্বাদলমণ্ডিত প্রশস্ত ক্ষেত্র, ভ্রমণ ও ক্রীড়ার জন্য নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রান্তর মধ্যে বালক বালিকা ও কিশোর কিশোরীরা বিবিধ প্রকার ব্যায়ামে নিরত। তীরোপান্তে মধ্যে মধ্যে পাষাণময় ঘাটসমূহে অপূর্ব্বলাবণ্যবতী পারসীক-মহিলারা কটিদেশে বিলম্বমান উপবীত হস্তে ধারণ করিয়া।

সমুদ্র-সলিলে নানাবিধ মনোজ্ঞ কুসুম ও পুজোপহার সমর্পণ করিতেছেন। কোন কোন পারসীক পুরুষ ও মহিলা বীচিমালা-বিচুম্বিত উপলখণ্ডে উপবেশন করিয়া জেন্দভাষায় লিখিত আবেস্তা নামক ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছেন। সায়ংকালে বম্বের জলধিতটের সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিলে হৃদয় প্রীতিরসে অভিষিক্ত হয়। বস্তুতঃ এখানকার সমুদ্রতীরের শোভার সীমা নাই, পারসীক-মহিলার পরিচ্ছদ ও সৌন্দর্য্যের উপমা নাই। বম্বে সহরে পারসীক গুজরাটী ও মরাঠী জাতিই অধিক। গুজরাটী মহিলারা অবগুণ্ঠিত-বদনে দেবমন্দিরে স্বাধীনভাবে গমনাগমনে সমর্থ কিন্তু অন্যত্র নহে। মরাঠী রমণীগণ সুবর্ণময় কুসুমে বেণী বা কবরী শোভিত করিয়া বগী বা ফেটিং গাড়িতে অন্তরীক্ষচারিণী দেবীর ন্যায় ভ্রমণ করিলেও একাকিনী বা সঙ্গিনী সহ এই বেলাভূমির বিমুক্ত বায়ু সেবনের অধিকারিণী নহেন। এ ক্ষেত্রে কেবল পারসীক-মহিলা ও ইংরেজ-রমণীরাই সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-সুখ উপভোগ করিয়া থাকেন। যখন পাঁচ ছয়টী রূপবতী পারসীক তরুণী উজ্জ্বল সিল্কের শাড়ী ও দুই একখানি হীরকালঙ্কার পরিয়া চস্মা-চোখে ঈষৎ-হাস্যবদনে শ্রেণীবদ্ধ রাজহংসীর ন্যায় হরিদ্বর্ণ দূর্ব্বাক্ষেত্রে পাদ-চারণা করেন, তখন পার্শ্বস্থিত শ্বেতাঙ্গী ইংরেজ-মহিলাদের সৌন্দর্য্য যেন সূর্য্যালোকে দীপকান্তির ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়া যায়। পারসীক-ললনারা যথার্থ ই বিধাতার অপূর্ব্বসৃষ্টি। ইহাদের যেমন স্পৃহণীয় কান্তি, তেমন কমনীয় মুখ। ইংরেজকামিনীর ভ্রূযুগল পারসীক সীমন্তিনীর ন্যায় আকর্ণ বিশ্রান্ত ও এত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ নহে। পারসীক-রমণীর ওষ্ঠাধর অধিক লোহিত বর্ণ, দৈহিক গঠন ও ইংরেজ-মহিলা অপেক্ষা অনেক পরিমাণে সুরুচি-সম্পন্ন। দক্ষিণদিকে

কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলেই দেখা গেল ভিন্ন ভিন্ন কতিপয় প্রস্তরাসনে ও কাষ্ঠাসনে ছয় সাতটী করিয়া পারসীক যুবক যুবতী একসঙ্গে মিলিয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন। কোথায় বা প্রণয়ী প্রণয়িনীর গ্রীবাদেশে বাম বাহু বিন্যস্ত করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। কোন স্থানে বা প্রণয়িযুগলের প্রীতিপূর্ণ আলাপে পূর্ব্বরাগ সূচিত হইতেছে। যাঁহারা য়ুরোপীয় মহিলাদের স্বচ্ছন্দ বিহার সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট ও এই স্থানের কোন কোন বিষয় নূতন বোধ হইবে। যাঁহারা "বলনৃত্যের" সংবাদ রাখেন না, নিতান্ত পল্লীগ্রামের অধিবাসী, তাঁহারা এই বিস্ময়জনক উজ্জ্বল বেশ ভূষা, স্বাধীনতাপূর্ণ হাবভাব সন্দর্শন করিলে প্রথম ক্ষণে মনে করিতে পারেন, এ কি স্বপ্ন-রাজ্যে বিচরণ করিতেছি, না ইহাই গন্ধর্ব্ব-লোক, অথবা নন্দন কাননের একদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি?

কিছুক্ষণ পরে আমরা বিশ্রামের নিমিত্ত পাদুকা ত্যাগ করিয়া জলসন্নিহিত একখানি উপলখণ্ডে উপবেশন করিলাম। এক একটী তরঙ্গাঘাতে আমাদের গাত্রবস্ত্র সিক্ত ও পাদদেশ বিধৌত হইতে লাগিল। নিকটে একটী প্রবীণ পারসীক বসিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট জেন্দ-আবেস্তার পাঠ শ্রবণের প্রস্তাব করিলে তিনি অদূরস্থিতা দুইটী রমণীর সন্নিধানে গিয়া বসিতে বলিলেন। কিন্তু আমরা অপরিচিত, বড় সঙ্কোচ বোধ হইল। শেষে পারসীক-প্রবর স্বয়ং আমাদিগকে লইয়া সেই মহিলাদ্বয়ের সমীপে বসাইয়া দিলেন। তাঁহারা উৎসাহসহকারে অতিস্পষ্টরূপে ঐ গ্রন্থের গাথাসকল পাঠ করিতে লাগিলেন। শুনা যায় বর্ত্তমান পারসীক-ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক জরদষ্ট্রের উপদেশ-সমূহই জেন্দ বা (ছন্দ অর্থাৎ প্রাচীন

বৈদিক) ভাষায় লিখিত, তদ্ভিন্ন পরবর্ত্তী ধর্ম্মগ্রন্থ-সকল পহ্লবী ভাষায় রচিত হইয়াছে। আমরা জেন্দ বা পহ্লবী কিছুই অবগত নহি, সুতরাং রমণীযুগলের মুখনিঃসৃত বাক্যসমূহের কোনই মর্ম্ম-গ্রহ করিতে সমর্থ হইলাম না, তবে মধ্যে মধ্যে দুই একটী শব্দের ঝঙ্কার যেন সংস্কৃতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। আর ঐ বিদুষী মহিলাদের সুন্দর স্বর ও পাঠনৈপুণ্যবশতঃ উহা শুনিতে বেশ মধুর বোধ হইল। দেখিতে দেখিতে সায়ংকাল উপস্থিত, সূর্য্যকিরণ ক্ষীণ অপেক্ষা ক্ষীণতর হইল, অংশুমালী ক্রমে ক্রমে একটী লোহিত বর্ণ বৃহৎ গোলকের ন্যায় আকার ধারণ করিলেন। সাগরসলিলে অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের শোভা দেখিতে বড়ই রমণীয়। যাঁহারা প্রত্যহ জলধি-জলে সূর্য্যের অন্তর্ধান নয়নগোচর করেন, তাঁহারা ও এই সময় একবার উদ্‌গ্রীব হইয়া সতৃষ্ণ-নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন। অকস্মাৎ একখানি তাম্রথালা যেমন সরসী-সলিলে নিক্ষিপ্ত হয়, তদ্রূপ দেখিতে দেখিতে জবাকুসুমসঙ্কাশ সহস্রাংশুদেব অনন্তনীলাম্বু-মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। অমনি জ্যোৎস্নালোকে সাগরতীর আলোকিত হইয়া গেল, গগনমণ্ডলে তারকারাজির ন্যায় অসংখ্য গ্যাসের আলোক জলধিতটকে সুশোভিত করিল।

আমরা সুশীতল সমীরণ-পরিষেবিত সমুদ্রতীরে কিছুক্ষণ ভ্রমণের পর নগরাভিমুখে চলিলাম। নগরের সন্নিহিত একটী মনোহর উদ্যান আছে। সময়াভাবে উক্ত উদ্যানে প্রবেশ করা ঘটিল না। রাজপথের পার্শ্বেই পারসীকদিগের অগ্নিমন্দির ও উচ্চ উচ্চ সৌধমালা। অগ্নিমন্দির বা আতস্‌বেহরমের পার্শ্বেই চন্দন-কাষ্ঠ ও ধর্ম্মপুস্তক বিক্রীত হয়। রাজপথের সন্নিহিত উদ্যানের

মধ্যে সুন্দর একটী অট্টালিকা, বিবিধ প্রকার উজ্জ্বল আলোকমালা ও পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত হইয়া পথিকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছে। রাজপথে অসংখ্য ফেটিং, বগী ও অন্যান্য শকটরাজি দাঁড়াইয়া আছে। নানাবিধ উজ্জ্বল বসন ও হীরকালঙ্কারে সুসজ্জিতা পারসীক-রমণীরা বিমানচারিণী অপ্সরোমণ্ডলীর ন্যায় শকট হইতে অবতরণ করিয়া ঐ অট্টালিকা অভিমুখে যাইতেছেন। শুনিলাম ইহা পার্সীদিগের একটী বিবাহমন্দির। অদ্য একটী বিবাহ, তজ্জন্য এখানে এত সমারোহ।

অনন্তর রাত্রি নয় ঘটিকার সময় বাসায় উপস্থিত হইলাম। পরীক্ষার দিন অতিসন্নিহিত। অতএব বোম্বাই নগরীর অন্যান্য দ্রষ্টব্য গুলি প্রত্যাগমন কালে দেখিব সঙ্কল্প করিয়া রাত্রি সাড়ে দশ ঘটিকার সময় পুণা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। ভ্রাতৃকল্প শ্রীমান্ নীলমণি মুখোপাধ্যায় “ভিক্টোরিয়া টারমিনাস্” নামক সুপ্রসিদ্ধ ষ্টেসনে আসিয়া আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন। সমস্ত নিশা প্রায় নিদ্রিত-অবস্থায় অতিবাহিত করিয়া পরদিন ৩১ শে বৈশাখ পূর্ব্বাহ্ন ৭ টার সময় পুণাষ্টেসনে অবতরণ করিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

মহারাষ্ট্র-রাজ্য।

প্রাচীনকালে বর্ত্তমান মহারাষ্ট্রের অধিকাংশ স্থল দণ্ডকারণ্য নামে অভিহিত হইত। এই প্রদেশ ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত। ইহার উত্তর দিকে সুরাট ও সাতপুরা-গিরিশ্রেণী, দক্ষিণে কর্ণাট প্রদেশ, পূর্ব্বদিকে গোণ্ডবন ও তৈলিঙ্গ, পশ্চিমে আরব-সমুদ্র। এই দেশের পরিমাণ প্রায় ১২৫০০০ বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা তিনকোটির অধিক। সহ্যপর্ব্বত মহারাষ্ট্রদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া বিরাজমান। ইহার পূর্ব্বাঞ্চলের নাম দেশ ও পশ্চিমাংশ কোঙ্কণ নামে প্রসিদ্ধ। এই দেশের অধিকাংশ স্থল পর্ব্বতবহুল ও দুর্গম-অরণ্যানী-পরিব্যাপ্ত। মহারাষ্ট্র অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় অনুর্ব্বর, তবে অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যপ্রদ। পুরাকালে এই দেশ কেবল নিশাচরগণের লীলাস্থল ছিল। কথিত আছে, সর্ব্বপ্রথম মহর্ষি অগস্ত্য বিন্ধ্যাদ্রি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক এই দুর্গম আরণ্য প্রদেশে প্রবেশ করেন। তিনি অনেক রাক্ষসকে নিগৃহীত করিয়া এই প্রদেশে স্বীয় আশ্রম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাহার পর, পরশুরাম একবিংশতি বার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া বীরহত্যা-পাপ হইতে মুক্তিলাভের জন্য মহর্ষি কশ্যপকে সমস্ত পৃথিবী প্রদানপূর্ব্বক তপস্যার্থ পশ্চিম সমুদ্রের তীরবর্ত্তী কোঙ্কণ প্রদেশে বাস করেন। তাঁহারই প্রযত্নে কোঙ্কণে ব্রাহ্মণ-প্রতিষ্ঠা হয়। তাহার পর, রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র বনবাস কালে রাক্ষসকুলের বিনাশ সাধন করিয়া এই প্রদেশকে

অনেকটা নির্ব্বিঘ্ন করেন। তদবধি এই জনপদে আর্য্যজাতির বসতি-বিস্তার হয়। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহোদয় নানাবিধ শিলালিপি ও পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধান দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, খিষ্টখ্রীষ্টের জন্ম গ্রহণের চারিশত বৎসর পূর্ব্বে রঠ্‌ঠ ও ভোজ উপাধিধারী ক্ষত্রিয়গণ মহারাষ্ট্রদেশে বাস ও আধিপত্য করিতেন। ইহারা আপনাদিগকে শিনিপ্রবর সাত্যকির বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতেন। উক্ত রঠ্‌ঠ ও ভোজ-জাতিই কালক্রমে মহারঠ্‌ঠ ও ও মহাভোজ নামে প্রসিদ্ধ হন। মহারঠ্‌ঠ জাতির সহিত মহাভোজ-জাতির কন্যা আদান প্রদান প্রচলিত ছিল। উক্ত প্রাচীন মহারঠ্‌ঠ শব্দ হইতেই বর্ত্তমান মাহ্রাট্টা ও মহারাষ্ট্র শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। মহারঠ্‌ঠ-গণের নামানুসারে খ্রীষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতেও এই দেশ মহারঠ্‌ঠ নামে পরিচিত ছিল। পূর্ব্বকালে এই দেশের আয়তন, বর্ত্তমান মহারাষ্ট্রের ন্যায় সুবিস্তৃত ছিল না। প্রাচীনকালে পুণা, সাতারা, আহম্মদনগর জেলা ও শোলাপুর জেলার পশ্চিমাংশ প্রকৃত মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল। কালক্রমে মহারাষ্ট্রীয়-জাতির বংশ বিস্তার ও ক্ষমতা বৃদ্ধির সহিত কোঙ্কণ, গোণ্ডবন, কোলবন, আভীরদেশ, বিদর্ভ ও উত্তরকর্ণাট মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্ভূত হইয়াছে।

নাসিক ও কোল্হাপুর প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপি পাঠে অবগত হওয়া যায়, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৭৩ অব্দ হইতে ২১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শালিবাহনবংশীয় নরপতিগণ মহারঠ্‌ঠ ও মহাভোজ প্রভৃতি জাতীয় ক্ষত্রিয়গণের পরাজয় সাধনপূর্ব্বক মহারাষ্ট্রদেশে স্বীয় আধিপত্য-বিস্তার করেন। গোদাবরী-তীরবর্ত্তী প্রতিষ্ঠানপুরে

তাঁহাদিগের রাজধানী ছিল। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এই দেশে চালুক্যবংশীয় নরপতিগণের শাসন প্রবর্ত্তিত হয়। ইহারা বাতাপিপুরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে রাষ্ট্রকূট-বংশীয়েরা মহারাষ্ট্র-প্রদেশের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। ৯৭৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অপর এক চালুক্য-রাজবংশ মহারাষ্ট্রদেশ শাসন করেন। কল্যাণ-নগরে এই রাজবংশের রাজধানী ছিল। ইহাদের অধিকার কালে লিঙ্গায়ৎ-সম্প্রদায়ের অত্যন্ত প্রাবল্য হয় ও বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। চালুক্যবংশীয় নরপতিগণ অতিশয় বিদ্যানুরাগী ছিলেন। কাশ্মীরদেশীয় বিহ্লন কবি, এই বংশীয় ২য় বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং উক্ত নরপতির মন্ত্রী বিজ্ঞানেশ্বর সুপ্রসিদ্ধ মিতাক্ষরা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইতিমধ্যে কলচুরি রাজবংশ কিছুকালের জন্য মহারাষ্ট্র-প্রদেশে অভ্যুদয় লাভ করিয়াছিল। তাহার পর, শিলাহার নামে পরিচিত তিনটী সামন্ত রাজবংশ, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া মহারাষ্ট্রের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। মহালক্ষ্মী ইহাদের কুল দেবতা ছিলেন। ১০১৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যাদববংশীয় নরপতিগণ মহারাষ্ট্রদেশে প্রভুত্ব লাভ করেন। এই বংশীয় ভূপতিগণের কীর্ত্তিকলাপ অনন্ত। ইহাদের প্রথম নরপতির নাম সিন্ধন, তাঁহার পুত্র মল্লগী। মল্লগীর পুত্র ভিল্লম। প্রথমে ইহারা ভিন্ন ভিন্ন স্থলে রাজধানী স্থাপন করেন, শেষে ১১০৯ খ্রীষ্টাব্দে যাদববংশীয় পরাক্রান্ত ভূপতি ভিল্লম দেবগিরিতে (দৌলতাবাদে) একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং ঐ বৎসরেই তথায় রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। ভিল্লমের পুত্র রাজা জৈত্রপাল। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করা-

চার্য্যের পুত্র লক্ষ্মীধর এই জৈত্রপালের সভাপণ্ডিত ছিলেন। জৈত্র-পালের পুত্র ২য় সিঙ্ঘণের সময়ে প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেব দেবগিরির রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১১৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সিঙ্ঘণের লোকান্তর প্রাপ্তি ঘটিলে তাঁহার পুত্র জয়সিংহ দেবগিরির সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি অধিক দিন রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারেন নাই। ঐ বর্ষেই তাঁহার পুত্র কৃষ্ণরাজ শাসন দণ্ড অধিকার করেন। এই নরপতি অনেক যাগ যজ্ঞ ও রাজ্য-বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ১১৮২ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণরাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ত্রৈলিঙ্গ কর্ণাট লাট গুর্জ্জর মালব প্রভৃতি দেশের রাজন্যবর্গের দর্পহরণ করিয়া ছিলেন। ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে মহাদেবের মৃত্যুর পর, তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র রামচন্দ্র মহারাষ্ট্রের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন। ইনি সাধারণের মধ্যে রামদেবরাও ও রামরাজ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। রামচন্দ্র অতিশয় পরাক্রান্ত ছিলেন। তিনি বাহুবলে দক্ষিণাপথের সর্ব্বভৌম প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ খিলিজী পাঁচ হাজার সৈন্য সহ মৃগয়াচ্ছলে দেবগিরির সন্নি-হিত হইয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক অতর্কিতভাবে রাজধানী আক্র-মণ করেন। ঐ সময় হইতেই মহারাষ্ট্র-রাজলক্ষ্মী একান্ত চঞ্চলা হইয়া উঠেন। ১৩১২ খ্রীষ্টাব্দে পর্য্যন্ত যাদববংশীয় রাজগণই দেবগিরিতে অবস্থান করিয়া এই দেশের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ মহম্মদ তোগলক এই প্রদেশ আক্রমণ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন। ১৩৪৫ খ্রীঃ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য ভূমি দিল্লীশ্বরের অধীন ছিল। উহার পর দক্ষিণাপথে বাহ্মনী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৪২৬ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদশাহ

বাহ্মনী, প্রাচীন হিন্দুরাজধানী বিদর্ভনগরে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ হয় এবং অন্নাভাবে মহারাষ্ট্র জনশূন্য হইয়া পড়ে। মহারাষ্ট্র-সর্দারগণ সুযোগ বুঝিয়া মুসলমান-কবল হইতে পার্ব্বতীয় প্রদেশ ও দুর্ভেদ্য দুর্গাদি অধিকার করিয়া লয়েন। ১৪৭২ খৃষ্টাব্দে বাহ্মনীবংশের শেষ স্বাধীন-রাজের মন্ত্রী মামুদ-গবান্ উহার কতকাংশ উদ্ধার করেন। বাহ্মনীবংশের রাজ্যকালে হিন্দুরাই রাজস্ব-সংগ্রহ-কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। বিভাগীয় রাজস্ব-সংগ্রাহকগণকে দেশমুখ বলিত। বাহ্মনী রাজ্য-ধ্বংস হইলে হিন্দু দেশমুখগণ কতক নিজামসাহী, কতক আদিলসাহী রাজবংশের অধীন হন। সুধু রাজস্ব সংগ্রহ করাই ইহাদের একমাত্র কার্য্য ছিল না, দুর্গরক্ষা ও যুদ্ধকালে স্বীয় দলবল সহ মুসলমান-সেনাপতির সাহায্য করা ও ইহাদের অপর কর্ত্তব্যের অন্তর্গত ছিল। অনেকে এই সময় রাজকার্য্যে বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। যে সকল দেশমুখ ঐরূপ প্রতিপত্তি লাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে মরাঠাবংশ-সম্ভূত রাজা মালজী-ভোঁশলা অন্যতম। নিজামসাহী রাজগণের অধীনে পুণায় ইহার জায়গীর ছিল। নিজামসাহী-রাজ্য ধ্বংস-প্রাপ্ত হইলে দিল্লীর বাদসাহ, পুণাও উহার সন্নিহিত প্রদেশ বিজাপুর-রাজকে অর্পণ করেন, তদবধি মালজী-ভোঁশলার জায়গীর বিজাপুর রাজের অধীন হয়। এই মালজীর পুত্র শাহজী। ইনি কিছু কাল মালিক-অম্বরের অধীনে যুদ্ধ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে মোগলশাসন-কর্ত্তা বিদ্রোহী হইলে পুনরায় যুদ্ধারম্ভ হয়। ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে দৌলতাবাদ মোগলের হস্তগত হয় এবং রাজা বন্দী কৃত হন। সেই সময় মরাঠা-সর্দারগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাহজী,

পূর্ব্বতন রাজবংশের এক জনকে সিংহাসনে বসাইয়া বিজাপুরের সৈন্যের সহিত পরেণ্ডা হইতে মোগলদিগকে তাড়াইয়া দেন এবং পুণাও গঙ্গথর জেলা লুট করিয়া লয়েন। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে বিজাপুররাজ পরাজিত হইয়া সম্রাট্ শাহজাহানের পদানত হন। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে শাহজীও আত্মসমর্পণ করেন। ভীমানদীর উত্তরতীরবর্ত্তী জুন্নরপ্রভৃতি স্থান মোগলসাম্রাজ্য-ভুক্ত ও দক্ষিণতীরবর্ত্তী ভূভাগ বিজাপুরের রাজাকে প্রদত্ত হইলে শাহজী বিজাপুরের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং স্বীয় কার্য্যের পারিতোষিক-স্বরূপ পুণা প্রভৃতি কতিপয় স্থান জায়গীর প্রাপ্ত হন।

বিজাপুর-রাজের অধীনে মরাঠা-সর্দ্দারের বর্গী নামক শিক্ষিত অশ্বারোহী সেনাদল মোগল-যুদ্ধে রণপাণ্ডিত্য দেখাইয়া জনসাধারণের নিকট বিশেষ সম্মান লাভ করিয়াছিল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গগুলি মরাঠা সর্দ্দারগণের হস্তে ন্যস্ত ছিল। মুসলমান-মোকাস্দারের অধীনে হিন্দু কর্ম্মচারিগণ রাজস্ব সংগ্রহ ব্যাপারে এবং প্রাচীন মরাঠাবংশীয়গণ দেশমুখের কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। যখন সকলদিকেই মরাঠাগণ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত এবং চারিধারের দুর্গগুলি প্রায় মরাঠাসর্দ্দারগণের দ্বারা পরিচালিত হইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই বিজাপুররাজবংশের অবনতির সূত্রপাত হয়। ঐ সময় সুযোগ বুঝিয়া শাহজীর পুত্র শিবাজী মস্তকোত্তোলন করেন। তাঁহারই বীরত্বমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া মরাঠাগণ দলে দলে আসিয়া তাঁহার দলভুক্ত হইতে থাকে। শিবাজী শৈশবে তাঁহার পৈত্রিক জায়গীরের তত্ত্বাবধায়ক দেশস্থ-ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত দাদাজীপন্থের যত্নে প্রতিপালিত হন। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না কিন্তু বাল্যকাল হইতে

রামায়ণ ও মহাভারতোক্ত বীরপুরুষগণের শৌর্য্যকাহিনী শ্রবণে তাঁহার হৃদয়ে বীরত্বের বীজ রোপিত হইয়াছিল। উহার ফলে তিনি গোলকুণ্ডা ও বিজাপুর-রাজ্য ব্যতীত সমগ্র দক্ষিণাপথের অধীশ্বর হন। রায়গড়নামক স্থানে শিবাজীর রাজ্যাভিষেক সম্পন্ন হয়। উক্ত নগরীই তাঁহার রাজধানী ছিল। শিবাজীর ন্যায় সাহসী চতুর ও কার্য্যকুশল বীরপুরুষ অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি যেমন যুদ্ধ-বিদ্যায় নিপুণ, তেমন শাসন-কার্য্যে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন। তাঁহার শৌর্য্য-প্রভাবে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দিল্লীর মোগলসিংহাসন ভয়ে কম্পমান ছিল। তিনি মহারাষ্ট্রীয়-জাতির হৃদয়ে যে আত্মগৌরব ও বীরত্বের বীজ রোপণ করিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই ফলে মুসলমানরাজত্বের অবসান কালে ভারত-সাম্রাজ্যের সমুদয় প্রভুত্ব মহারাষ্ট্রীয়গণের হস্তগত হইয়াছিল। শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীও পরাক্রম এবং তেজস্বিতায় ন্যূন ছিলেন না। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে শম্ভুজী পরলোকগত হইলে তাঁহার পুত্র নাবালক ২য় শিবাজী রাজা হন। ইনি সাধারণ লোকের মধ্যে সাহু নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহার খুল্লতাত (শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র) রাজারাম প্রথম সাহুর অভিভাবক নিযুক্ত হন। শেষে তিনি সাহুকে ত্যাগ করিয়া সেতারায় রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক স্বয়ং রাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। নানা ঘটনার পর, মহারাষ্ট্রের হিন্দুরাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হয়। রাজারামের দ্বিতীয় পুত্র শম্ভুজীর বংশধরেরা কোল্লাপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া সহ্যাদ্রির অনেকাংশ অধিকার করেন। অদ্যাপি রাজারামের বংশধরগণ সেখানে ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের মিত্রনরপতিরূপে স্বীয় রাজ্য ভোগ করিতেছেন। এদিকে সাহুর রাজত্বকালে কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ-

কুলসম্ভূত * বালাজী বিশ্বনাথভট্ট নামক এক ব্যক্তি রাজস্ব সংগ্রহের কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করায় মহারাজ সাহু তাঁহাকে পেশোয়া (প্রধান মন্ত্রীর) পদে নিযুক্ত করেন। ঐ সময় সেতারায় সাহুর রাজধানী ছিল। বালাজী বিশ্বনাথকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করায় সাহুর রাজ্যের বিলক্ষণ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যু হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাজীরাও পেশোয়াপদে অভিষিক্ত হন। বাজীরাও অসাধারণ ক্ষমতাশালী ছিলেন। মহারাষ্ট্র-রাজ্যে তাঁহার একাধিপত্য ছিল। তিনি প্রায় ২০ বৎসর কাল পেশোয়াপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময় সাহু কোন রূপ রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিতেন না, বাজীরাওই সকল বিষয়ে প্রভু ছিলেন। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সাহু নিঃসন্তান-অবস্থায় পরলোক গমন করিলে বাজীরাওর পুত্র বালাজী বাজীরাও, শিবাজীর বংশসম্ভূত একটী বালককে সেতারার সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া মহারাষ্ট্রের সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা আত্মসাৎ করেন। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ-গবর্ণমেণ্ট পেশোয়ার আধিপত্য ধ্বংস করিয়া সেতারার রাজাকে স্বাধীন করিয়া দেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সেতারার শেষ রাজা নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিলে সেতারা ইংরেজ-রাজ্য ভুক্ত হয়। বাজীরাওর পুত্র বালাজী বাজীরাও অসাধারণ ক্ষমতাশালী বীরপুরুষ ছিলেন। যে সময় মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধ্‌-সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা রঘুজীভোঁশলার দেওয়ান্ ভাস্কর পণ্ডিত বিহারের নবাব আলীবর্দ্দী খাঁকে পরাজিত করিয়া মুরশিদাবাদের জগৎশেঠের কুঠি লুণ্ঠনপূর্ব্বক আড়াই কোটি

* মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের বিবরণে কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণের বিবৃত্ত পাঠ করুন।

টাকা সংগ্রহ করিয়া প্রস্থান করেন। তখন আলীবর্দ্দী ভীত হইয়া দিল্লীর বাদসাহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাদসাহ নিরুপায় হইয়া বালাজী বাজীরাওকে বাঙ্গালাদেশ রক্ষার জন্য অনুরোধ করেন। সেই সময় বালাজী অত্যন্ত ক্ষিপ্রকারিতার সহিত রঘুজীকে বাঙ্গালা দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন। এই কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া বাদসাহ, বালাজী বাজীরাওকে মালবের সুবাদারী পদ প্রদান করেন। বালাজী বাজীরাও, সিন্ধিয়া হোলকর প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সর্দ্দারগণকে উহা ভাগ করিয়া দেন। বালাজী বাজীরাও পুনায় অবস্থিতি করিতেন, তজ্জন্য তাঁহার সময় হইতে পুণা মহারাষ্ট্রের রাজধানী হয়। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের সমুদয় প্রদেশেই মহারাষ্ট্রীয় জাতির প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সে সময় আর পেশোয়া-বংশ মন্ত্রিস্থানীয় ছিলেন না। বালাজী বাজীরাও মহারাষ্ট্র-রাজ্যের সার্ব্বভৌম নরপতির পদে আসীন হইয়া অবলীলাক্রমে ঐ শত্রু-সঙ্কুল বিস্তৃত রাজ্যের শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মাধবরাও পেশোয়া-রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়াও অতিবিচক্ষণতার সহিত মহারাষ্ট্র দেশের শাসন কার্য্য পরিচালন করেন। তিনি ব্রাহ্মণোচিত ধ্যান ধারণা ও জপ তপে অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাহারপর, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণরাও পেশোয়া-রাজপদ লাভ করেন কিন্তু তিনি অধিক দিন উক্ত পদে অবস্থান করিতে পারেন নাই। কয়েক মাসের মধ্যে তাঁহার পিতৃব্য রঘুনাথরাও তাঁহার প্রাণ সংহার করিয়া পেশোয়া-রাজপদ অধিকার করেন। এই ঘটনায় বৃদ্ধ মন্ত্রী রামশাস্ত্রী পদ ত্যাগ করেন। নানাফর্নবীশ—প্রভৃতি প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ, নিহত নারায়ণরাওর মহিষীর গর্ভজাত শিশুকে পেশোয়া-রাজপদে প্রতি-

ষ্ঠিত করেন। এই সময় মহারাষ্ট্রীয় ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে বালক মাধবনারায়ণরাও পেশোয়ার সহিত ইংরেজগবর্মেণ্টের সন্ধি হয় এবং নারায়ণরাওর প্রাণহন্তা রঘুনাথরাও ২৫০০০ হাজার টাকা বৃত্তি লইয়া গোদাবরী-তীরে কোন গ্রামে বাস করিতে বাধ্য হন। মাধবনারায়ণরাওর মন্ত্রী নানাফর্নবীশ যেমন পরাক্রান্ত তেমনই অসাধারণ বুদ্ধিমান্ ছিলেন। তাঁহার প্রভাবও রাজনীতি-কৌশল ভারত-বর্ষের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। তিনি হায়দরাবাদের নিজামকে পরাস্ত করিয়া তিন কোটি টাকা ও নিজামরাজ্যের অনেকাংশ গ্রহণ করেন। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মাধবনারায়ণরাও পেশোয়া ছাদ হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিলে পূর্ব্বোক্ত রঘুনাথরাওর পুত্র বাজীরাওপেশোয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইহার সময়ে অনেক ঘটনা ঘটে। বাজীরাও কয়েক বার সন্ধির পর পুনরায় দুরাশাগ্রস্থ হইয়া ইংরেজদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অবশেষে ইংরেজগণের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ইংরেজগবর্মেণ্ট তাঁহাকে আটলক্ষ টাকা বৃত্তি প্রদানপূর্ব্বক কাণপুরের সন্নিহিত বিঠুর নামক স্থানে বাস করিতে দেন। বাজীরাওর দত্তকপুত্র নানাসাহেব ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মিউটিনির সময় কাণপুরের হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকায় ইংরেজগবর্মেণ্ট তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছেন।

পুণা নগরীতে অবস্থিতি।

পুণার পুরাতন নাম পুণ্যপুর। পুণ্যসলিলা মূলা ও মুঠা নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত বলিয়া ইহার পুণ্যপুর নাম হয়। এই নগরী সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৮৫০ ফিট্ উচ্চ। পুণার ৩১ ক্রোশ পশ্চিমে মহাসমুদ্র বিদ্যমান। বোম্বাই নগরী হইতে পুণা প্রায় ৫৫ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকেই প্রায় শৈলশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। ইহা মুঠানদীর দক্ষিণ তীরে বিরাজমান এবং সুদৃঢ় দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত। নগরীর মধ্যে নাগঝরি, ভৈরবা, মাণিকনালা, আম্বিলওড়া, খড়ক, বাসলার খাল প্রভৃতি কতিপয় জলপ্রণালী প্রবাহিত হইয়া পার্ব্বতী-হ্রদের জলের দ্বারা নগরবাসিগণের জলের অভাব দূর করিয়া থাকে। পুণানগরীর এক একটী পাড়া বা মহল্লাকে পেট্ বলে। নগরটী ১৮টী পেট্ বা পাড়ায় বিভক্ত। প্রাতঃকালে বাষ্পশকট হইতে অবতরণপূর্ব্বক একখানি এক্কা ভাড়া করিয়া প্রায় ৮টার সময় নানাচাপেটে বঙ্গীয় ছাত্রাবাসে উপস্থিত হইলাম। বহুদিন হইতে পুণায় বাঙ্গালী ছাত্রগণের একটী ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত ছাত্রাবাসে অবস্থান করিয়া বাঙ্গালী বিদ্যার্থিগণ অত্রত্য ইঞ্জিনিয়ারিং-কলেজে স্থপতিবিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। শিবপুর-ইঞ্জিনিয়ারিং-কলেজে পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া যে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হয়, এখানে তিন বৎসর অধ্যয়ন করিলেই উক্ত পরীক্ষা প্রদানের অধিকারী হওয়া যায়। এই দুইটী বৎসর বাঁচাইবার জন্য প্রতিবৎসর ১৭।১৮টী বাঙ্গালী বিদ্যার্থী সুদূর বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া অত্রত্য ইঞ্জিনিয়ারিংকলেজে প্রবিষ্ট

হইয়া থাকেন। আমাকে উপস্থিত দেখিয়া ছাত্রগণ অত্যন্ত আহ্লাদ সহকারে আমাকে গ্রহণ করিলেন। ঐ সময় গ্রীষ্মাবকাশ-নিবন্ধন কলেজ্ বন্ধ থাকায় তিনটীমাত্র বিদ্যার্থী ছাত্রাবাসে উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে কলিকাতা বাগ্‌বাজারনিবাসী অবসর-প্রাপ্ত ডিপুটীমাজিষ্ট্রেট্ বাবু নবীনকৃষ্ণ সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার সরকারের * নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চন্দ্র বাবুর যত্নাতিশয়ে পুণায় আমি অত্যন্ত সুখে ছিলাম। তিনি আমার প্রয়োজনীয় সমুদয় বিষয়ের উদ্‌যোগ করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সর্ব্বদা সকলবিষয়ে বিশেষরূপ তত্ত্বাবধান করিতেন। তাঁহার ঐ মধুর ব্যবহারের কথা বহুদিন আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে। ৩১শে বৈশাখ বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি। ঐ দিবস আর কোথাও বাহির হইলাম না। প্রাতঃকৃত্য স্নান সন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া আহারান্তে বিশ্রাম করিলাম।

১লা জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে স্নানান্তে আমি শ্রীযুক্ত পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী গড়বোলের সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি একটী বড় বাটীর দোতলার একাংশে গৃহিণী, কন্যা পুত্র, পুত্রবধূ, শিশুপৌত্র প্রভৃতি পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করেন। আমাকে অত্যন্ত আদরের সহিত তাঁহার বাসগৃহে লইয়া গিয়া বসাইলেন। নবাগত পুরুষ দেখিয়া পণ্ডিতের গৃহিণী কন্যা পুত্রবধূ কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। অনাবৃতমস্তকে কেহ পূজা করিতে লাগিলেন, কেহ রন্ধন কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন, কেহ বা শিশুর আদর করিতে লাগিলেন।

* শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার সরকার পুণা ইঞ্জিনিয়ারিং-কলেজ হইতে এল্, সি, ই, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বেণারস ও অন্যান্য স্থানে কিয়ৎকাল কার্য্য করতঃ এখন ব্রহ্মদেশে এসিষ্টাণ্ট-ইঞ্জিনিয়ারের পদে নিযুক্ত আছেন।

আমি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ প্রকাশ করিলে শাস্ত্রী বলিলেন "এদেশের ইহাই সনাতনী প্রথা, অতএব সঙ্কুচিত হইবেন না, নিরুদ্বেগে বসিয়া কথোপকথন করুন"। তাহার পর, আমি পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত রাজারাম শাস্ত্রীর একখানি পত্র তাঁহার হস্তে দিলাম। পণ্ডিতবর সাদরে পত্র খানি পাঠ করিয়া বলিলেন "আপনি বেদশাস্ত্রোত্তেজক-সভায় পরীক্ষা প্রদানের নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন, অবগত হইয়া আমি বড় সন্তোষ লাভ করিলাম। পণ্ডিত রাজারাম শাস্ত্রী আমার পিতার ছাত্র এবং ভ্রাতৃকল্প। অতএব তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে সমস্ত ব্যবস্থা করিতে পারিলাম না বলিয়া বড় দুঃখিত হইতেছি। কারণ সংপ্রতি পুরাণনগরীস্থ হিন্দুসমাজে কোন কারণে দুইটী দল হইয়াছে। আমি প্রতিবাদকারীদের পক্ষভুক্ত। কালমাহাত্ম্যে উক্ত পক্ষ বড়ই দুর্ব্বল। প্রতি বৎসরই আমাকে পরীক্ষা-কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক ও পরীক্ষক নিযুক্ত করা হইত, এবার করা হয় নাই। যাহা হউক, তজ্জন্য আপনার কোন হানি হইবে না। আদিত্যবার-পেটে যে সংস্কৃতপাঠশালা আছে, আপনি সেখানে গেলে পুস্তকের তালিকা ও নিয়মাবলী পাইবেন। পাঠশালা হইতে প্রত্যাগমন কালে অবশ্য আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবেন"। পণ্ডিত নারায়ণ শাস্ত্রী বেশ শান্তস্বভাব ও সুপণ্ডিত। ইহার গৃহটী সংস্কৃত-গ্রন্থের প্রাচীন হস্তলিপিতে পরিপূর্ণ। উক্ত পণ্ডিতবরের সহিত সংস্কৃত ভাষায় বহুক্ষণ কথোপকথন করিয়া অত্যন্ত সুখী হইলাম। ঐ দিন বেলা অধিক হওয়ায় সংস্কৃতপাঠশালায় যাওয়া ঘটিল না, প্রায় ১॥০ টার সময় বাসায় প্রত্যাগত হইলাম। পরদিন ২রা জ্যৈষ্ঠ স্নানান্তে ৭॥০ টার সময় আদিত্যবারপেটে সংস্কৃতপাঠশালায় গমন করিলাম। উক্ত বৃহৎ

পাঠশালার দ্বিতল ও ত্রিতল গৃহে অনেক বিদ্যার্থী এবং কতিপয় অধ্যাপক নানাশাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। আমি গেলে তাঁহারা সাদরে অভ্যর্থনা ও আনন্দ সহকারে সম্ভাষণ করিলেন। অনেক ক্ষণ কথোপকথনের পর পরীক্ষিতব্য পুস্তকের নামমালা ও পরীক্ষার নিয়মাবলী আমার হস্তে প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন "আপনি এক মাসের পূর্ব্বে আবেদন করেন নাই, এ অবস্থায় আপনি পরীক্ষায় উপস্থিত হইবার অনুমতি পাইবেন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষ, আপনি কলিকাতা-সংস্কৃতকলেজের উপাধি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ, যাঁহারা অন্য কোন স্থানে উপাধি পরীক্ষা দিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন 'বেদশাস্ত্রোত্তেজক-সভা' তাঁহাদিগকে পরীক্ষা প্রদানের অনুমতি করেন না। যাহা হউক আমাদের কথায়ই ক্ষান্ত হইবেন না, নারায়ণ শাস্ত্রীর চিঠি লইয়া সভার সম্পাদক, বলবন্ত রামচন্দ্র সহস্রবুদ্ধির সহিত সাক্ষাৎ করিলে সমুদয় জানিতে পারিবেন।" আমি সংস্কৃতপাঠশালা হইতে বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অপরাহ্নে বলবন্ত রামচন্দ্র সহস্রবুদ্ধির সহ সাক্ষাৎ করিলাম। সহস্রবুদ্ধি মহাশয় বেশ শিক্ষিত ব্যক্তি, ইংরেজী সংস্কৃত উভয় ভাষায়ই কৃতবিদ্য। তিনি আর কয়েকটী সদস্যের সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন "আপনি দূরদেশ হইতে সমাগত, অতএব এক মাস পূর্ব্বে আবেদনের নিয়ম আপনার সম্বন্ধে সঙ্কোচ করা গেল। আর আপনি যে সকল গ্রন্থের পরীক্ষা দিয়াছেন, উহা প্রায় আমাদের পরীক্ষিতব্য পুস্তকের তালিকায় নাই, সুতরাং আপনি একখানি আবেদন করুন।" আমি তৎক্ষণাৎ দেবনাগরাক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় একখানি আবেদনপত্র লিখিয়া দিলে সম্পাদক মহাশয় পরীক্ষাদানের অনুমতিপত্র প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন

"আপনার সঙ্গে পুস্তক নাই, সুতরাং আপনি ইচ্ছা করিলে আনন্দাশ্রমে বসিয়া পড়িতে পারেন।" তাহার পর আমি তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম।

আনন্দাশ্রম। পরদিন ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্নে স্নানান্তে আনন্দাশ্রমে উপস্থিত হইলাম। আনন্দাশ্রম পুণা নগরীর সর্ব্বপ্রধান পুস্তকালয়। একটী পাষাণনির্ম্মিত বৃহৎ ত্রিতল বাটীতে এই পাঠাগার অবস্থিত। স্থানীয় লোকের সম্পূর্ণ ব্যয়ে এই আশ্রমটী নির্ম্মিত হইয়াছে। পুণা-নিবাসী বোম্বাই-হাইকোর্টের একজন প্রসিদ্ধ উকীল ইহার নির্ম্মাণকল্পে প্রায় তিন লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এখানে দুর্লভ সংস্কৃত-গ্রন্থের সহস্র সহস্র হস্তলিপি বিদ্যমান আছে। পুস্তকের হস্তলিপি প্রণয়নও অমুদ্রিত গ্রন্থের সংগ্রহ কার্য্যে অনেকগুলি পণ্ডিত নিযুক্ত আছেন। আশ্রমে প্রবেশ করিলেই পুস্তকালয়াধ্যক্ষ পণ্ডিত মহাদেব শাস্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি সংস্কৃত ভাষায় আমার নাম, নিবাস ও দেশপর্য্যটনের উদ্দেশ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। আমি ও দেববাণীতে উহার যথাযথ উত্তর করিলাম। তাহার পর, বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্র-প্রদেশের উপাসক-সম্প্রদায়ের কথা উঠিল। তাঁহার সহিত দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে অনেক কথা অবগত হইলাম। মহাদেব শাস্ত্রী বিলক্ষণ শিষ্টাচার-পরায়ণ ব্যক্তি; আমি যে যে পুস্তক প্রার্থনা করিলাম, শাস্ত্রী তৎক্ষণাৎ উহা বাহির করিয়া দিলেন। তাঁহার সাহায্যে মুদ্রিত ও হস্তলিখিত সকল প্রকার পুস্তক দেখারই সুবিধা হইল। ৪ঠা ৫ই দুই দিন পূর্ব্বাহ্ন ৮টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত আনন্দাশ্রমে বসিয়া পাঠ করিলাম। পুস্তকালয়ের

কর্ম্মচারিগণের সদয় ব্যবহারে আমি অতিশয় আপ্যায়িত হইয়াছিলাম।

৬ই জ্যৈষ্ঠ আহারান্তে ১০টার সময় বেদশাস্ত্রোত্তেজক-সভায় উপস্থিত হইলাম। এই সভা আদিত্যবারপেটে ফড়কের সুবৃহৎ প্রসাদের দ্বিতল গৃহে অবস্থিত। বোম্বাই-প্রদেশের যাবতীয় কৃতবিদ্য ও ধনী লোকের উদ্‌যোগে ও অর্থব্যয়ে কিয়ৎকাল পূর্ব্বে এই সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত প্রদেশসমূহের সংস্কৃতশিক্ষার উৎসাহদান-কল্পে এই সভাই সর্ব্বাগ্রগণ্য। সভায় প্রবেশ করিয়া দেখিলাম দ্রাবিড়ী ও মহারাষ্ট্রী অধ্যাপক ও দাক্ষিণাত্য বিদ্যার্থিগণে সভাগৃহ পূর্ণ হইয়াছে। নিম্নলিখিত অধ্যাপকগণ উক্ত বৎসর পরীক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন।

(১)	বেদমূর্ত্তি কাশীনাথভট্‌জী বাবা চিতলে	ঋগ্বেদ
(২)	বেদমূর্ত্তি রামভট্‌জী থরে	আপস্তম্ব।
(৩)	বেদমূর্ত্তি কৃষ্ণভট্‌ ও	যাজ্ঞিক।
(৪)	বেদমূর্ত্তি বালশাস্ত্রী দিবাকর	
(৫)	নরসিংহ শাস্ত্রী শেজবলকর	ব্যাকরণ।
(৬)	জয়রামাচার্য্য	ন্যায়।
(৭)	বাসুদেব শাস্ত্রী দেড়গাঁওকর	জ্যোতিষ।
(৮)	শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত	ধর্ম্মশাস্ত্র।
(৯)	নারায়ণশাস্ত্রী সাঠে	সন্ধ্যাভাষ্য।
(১০)	বলবন্ত রামচন্দ্র সহস্রবুদ্ধি	অলঙ্কার।
(১১)	বলবন্ত সদাশিব দাতে	ব্যুৎপত্তি।
(১২)	গণেশকৃষ্ণ গর্দ্দে	বৈদ্যক।

উপরি উক্ত অধ্যাপকগণ প্রথম দিন মৌখিক প্রশ্ন দ্বারা

পরীক্ষা-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। পরীক্ষাগৃহে সংস্কৃতভাষা ব্যতীত অন্য ভাষার ব্যবহার নিষিদ্ধ। আমি চারি জন অধ্যাপকের নিকট ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষা দিয়া সায়ংকালে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। রাত্রিতে আর পাঠ করিতে ইচ্ছা হইলনা, পূর্ব্বোক্ত বন্ধু বাবু চন্দ্রকুমার সরকারের সহিত তাঁহার সঙ্গীতগুরু প্রসিদ্ধ কলাবৎ শ্রীযুক্ত পুরুষোত্তমগণেশ ঘাড়পোড়ে মহাশয়ের গৃহে গমন করিলাম। ঘারপোড়ে মহাশয়ের ক্ষুদ্র উদ্যান-মধ্যস্থ বৈঠকখানায় সঙ্গীত আরম্ভ হইল। আরও কতিপয় শ্রোতা সমবেত হইলেন। মাঘকবির শিশুপালবধকাব্য অধ্যয়নকালে বীণাযন্ত্রের বর্ণনা পাঠ করিয়াছিলাম মাত্র কিন্তু উক্ত যন্ত্র প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ কখনও ভাগ্যে ঘটে নাই। ঐ দিন উত্তমরূপে বীণাযন্ত্র নয়নগোচর করিলাম এবং উহার সেই উদাত্ত স্বরলহরীর মাধুর্য্য অনুভব করিয়া নিতান্ত প্রীত হইলাম। সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে রাত্রি প্রায় এগারটা বাজিয়া গেল, তখন আমি ও চন্দ্রবাবু গাত্রোত্থান করিলাম।

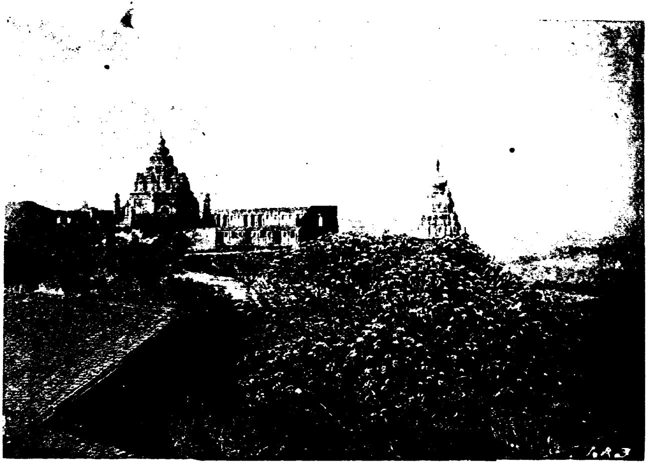
বাঙ্গালী জজ্। ৭ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে চন্দ্রবাবুর সহিত সেতারার তদানীন্তন ডিষ্ট্রিক্ট জজ্ মিঃ সত্যেন্দ্রনাথঠাকুর C, S, মহোদয়ের বাসায় গমন করিলাম। সত্যেন্দ্র বাবু কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে পুণা-সহরের উত্তরভাগে একটী বাঙ্গলোতে সপরিবারে অবস্থিতি করিতেছেন। সহধর্ম্মিণী, পুত্র, কন্যা ব্যতীত তদীয় অগ্রজ মহাত্মা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অনুজ শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও সেখানে ছিলেন। বাঙ্গালাদেশে কলিকাতার ঠাকুরবংশ বিদ্যা বুদ্ধি ঐশ্বর্য্যে চির-প্রসিদ্ধ। কখনও ইঁহাদের সহিত আলাপ করিবার সুযোগ ঘটে নাই, ঐ দিন সাক্ষাৎ ও

কথোপকথন করিয়া অত্যন্ত পরিতোষ লাভ করিলাম। শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশধরগণ উন্নতচরিত্র ও নানাবিদ্যায় শিক্ষিত। দ্বিজেন্দ্রবাবু কিছু অসুস্থ ছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার সহিত অধিক কথা হইল না। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সহিত কাব্য, দর্শন, বাঙ্গালা ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষা সম্বন্ধে প্রায় দুই ঘণ্টা কথোপকথন হইল। শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় যেমন সঙ্গীত সাহিত্যে, তেমন চিত্রবিদ্যায় ও বিশেষ নিপুণ। তিনি একটী ভিন্ন স্থানে বসাইয়া পেন্সিলের সাহায্যে আমার মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া রাখিলেন। তাঁহার খাতায় সমাগত বহু ব্যক্তির প্রতিকৃতি অঙ্কিত দেখিলাম। ইঁহারা কয়েক ভ্রাতাই বিনয়ী এবং অমায়িকস্বভাব, ইঁহাদের আদর্শ শিষ্টাচার নব্যশিক্ষিতদের অনুকরণীয়।

প্রায় ১১টার সময় বাসায় আসিয়া আহারান্তে পুনরায় বেদ-শাস্ত্রোত্তেজক-সভায় গমন করিলাম। ঐ দিন লিখিত প্রশ্ন-সকল প্রদত্ত হইল। আমি ১টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত পরীক্ষাগৃহে বসিয়া প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিয়া দিয়া বাসায় গমন করিলাম। পূর্ব্বে পরীক্ষকগণ বলিয়াছিলেন "সংস্কৃতভাষায়" প্রশ্নের উত্তর লিখিতে হইবে, বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিলে ক্ষতি হইবে না কিন্তু শেষে বাঙ্গালা বর্ণমালার আকৃতি দেখিয়া অবাক্। তেলেগু,

---

* শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়, উহার পর বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার অনেক উপকার করিয়াছেন। তিনি অভিজ্ঞানশকুন্তল, বিক্রমোর্ব্বশী, মৃচ্ছকটিক, মুদ্রারাক্ষস, রত্নাবলী, নাগানন্দপ্রভৃতি কয়েক খানি সংস্কৃত নাটক এবং দুই তিন খানি অন্য ভাষার দৃশ্যকাব্যের বঙ্গানুবাদ করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের পুষ্টিসাধন বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন।



পার্ব্বতী-পাহাড় পুণা।

উৎকল, দেবনাগর প্রভৃতি কোন বর্ণমালার সহিতই ইহার সৌসা-দৃশ্য নাই। সুতরাং তাঁহারা পূর্ব্বের আদেশ প্রত্যাহার করিলেন এবং বলিলেন "দেবাক্ষরে লিখিতে হইবে, নতুবা আমরা বুঝিতে পারিব না"। অগত্যা দেবনাগরই অবলম্বন করিতে হইল, অনভ্যাসবশতঃ কিছু অধিক সময় আবশ্যক হইল। দাক্ষিণাত্য বিদ্যার্থিগণও আমার তুল্য সময় গ্রহণ করিলেন।

পার্ব্বতীশৈল। ৮ই জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্নে পার্ব্বতীশৈল সন্দর্শন করিতে গমন করিলাম। পুণানগরীর দক্ষিণে প্রায় এক ক্রোশ দূরে পার্ব্বতীহ্রদের তীরবর্ত্তী পার্ব্বতীশৈলের শিখরদেশে পাষাণময় অট্টালিকা ও সুন্দর মন্দির বিদ্যমান। ঐ মন্দিরে বাজীরাও পেশোয়া কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত সুবর্ণময়ী পার্ব্বতী ও পাষাণময় শিবলিঙ্গ বিরাজমান। নগরপ্রান্ত হইতে ঐ দেবমন্দির-পরিশোভিত শৈলশৃঙ্গের শোভা যে কি মনোমুগ্ধকর উহা বর্ণনা করিয়া বুঝান যায় না। একটী কৃত্রিমনদীর তীর হইতে পার্ব্বতীশৈলে আরোহণের নিমিত্ত পৈঠা-সকল আরম্ভ হইয়াছে। ঐ সমুদয় পৈঠার অত্যধিক দৃঢ়তা ও বিশাল পরিসর দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাজীরাওপেশোয়া সসৈন্যে এই প্রশস্ত সোপানপথে পর্ব্বতারোহণ করিতেন। ঐ পথে সহস্র লোক এক সঙ্গে ঊর্দ্ধে উঠিতে পারে। প্রায় অর্দ্ধ মাইল পৈঠা ভাঙ্গিয়া অতিশ্রান্ত ও গলদ্ঘর্ম্ম-কলেবরে পার্ব্বতী-মন্দিরে উপনীত হইলাম। ঐ পর্ব্বতশিখরে শিবপার্ব্বতীর মন্দির ব্যতীত উচ্চ-প্রাচীর ও বিশাল দ্বার-বিশিষ্ট পেশোয়ারাজগণের প্রাসাদ বিদ্যমান। মন্দিরে অনেক পূজারি ও পরিচারক আছে, দেব-সেবার ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত ইংরেজগবর্ণমেণ্ট বার্ষিক সহস্র মুদ্রা প্রদান করেন। শিব

পার্ব্বতীর সন্দর্শন, প্রদক্ষিণ প্রণামাদি শেষ করিয়া শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত মন্দিরের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী অট্টালিকায় গিয়া বসিলাম। বজ্রপাতে এই অট্টালিকার ছাদ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম পার্শ্বের জানালার নিকটে বসিলে জলকণসংসর্গী বিমল বায়ুতে অল্প ক্ষণের মধ্যেই শরীর শীতল হইয়া গেল। নিম্নে দৃষ্টিপাত করিলে অদূরস্থ প্রান্তরবাহিনী স্বচ্ছতোয়া মূলা ও মুথা নাম্নী নদী দুইটী রজতরেখার ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে বোধ হয়। পূর্ব্ব ও উত্তরদিকে নিদাঘকালের নানাবিধ বিকসিত কুসুমালঙ্কারে বিভূষিতা সৌধমালিনী পুণানগরী সৌন্দর্য্যগর্ব্বে অমরাবতীর ন্যায় বিরাজিত। দূরে দূরে শৈলশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে শস্যক্ষেত্র। আহা এই স্থানের প্রকৃতি কেমন এক প্রকার অভিনব বৈচিত্র্যশালিনী। আমি অনেকক্ষণ ঐ স্থানে বসিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অনুভব করিলাম। যে সকল বাঙ্গালী পার্ব্বতী-মন্দির সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা প্রাসাদগাত্রে আপন আপন নাম লিখিয়া রাখিয়া আসিয়াছেন। আমিও কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া আপন নামটী অঙ্কিত করিয়া ধীরে ধীরে অবতরণ করিলাম। আমি এই পর্ব্বতে আরোহণ ও অবরোহণে কত শ্রান্তিবোধ করিলাম, এদেশীয় লোকেরা উহা যে একটা আয়াস সাধ্য কর্ম্ম তাহাই স্বীকার করিতে চাহে না। বলকর বস্তু আহার ও শ্রমসাধ্য জীবিকাই ইহাদের ঐরূপ সহিষ্ণুতা উৎপাদন করিয়াছে। পার্ব্বতীশৈল হইতে প্রত্যাগমন করিয়া মধ্যাহ্ন আহারের পর পুনরায় বেদশাস্ত্রোত্তেজক-সভায় গমন করিলাম। ঐ দিন সংস্কৃতভাষায় একটি প্রবন্ধ লিখিতে হইল। প্রশ্নের বিষয় "সংস্কৃতবিদ্যার ইতিহাস"। বৈদিক কাল হইতে কি প্রকারে সংস্কৃতভাষাও সংস্কৃত-শাস্ত্রসমূহ সৃষ্ট পুষ্ট ও বিস্তৃত হইয়াছে, তাহার

সবিস্তার বর্ণনাই ঐ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। যথাশক্তি প্রবন্ধটী লিখিয়া দিয়া সায়ংকালে বাসায় ফিরিলাম।

৯ই জ্যৈষ্ঠ অপরাহ্ণ ৩টার সময় ছাত্রাবাসের অন্যতম বিদ্যার্থী শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রনাথ বসুর সহিত ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। ছাত্রাবাস যে পল্লীতে অবস্থিত, উহার নাম "নানাচাপেট্"। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া সবাই মাধবরাওর রাজত্বকালে নানাফড়নবীশ কর্ত্তৃক এই পল্লীটী প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার পূর্ব্বাংশে একটী প্রান্তরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পারসীক ও ইংরেজবালক বালিকারা ক্রীড়া করিতেছে। কিছুদূর অগ্রসর হইলেই পারসীকদিগের অগ্নিমন্দির ও হিন্দুদের বিঠোবা-মন্দির এবং ঘোড়েপীরের আস্তানা প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হইল। নগরের এই অংশে সুন্দর সুন্দর বৃক্ষবাটিকা-পরিশোভিত ইংরেজ ও ধনী পারসীকগণের দৃষ্টিরম্য অট্টালিকা-রাজি দর্শকের পক্ষে অতিশয় চিত্তহারিণী। কিঞ্চিৎ দূরে দূরে শৈলশ্রেণী, মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র প্রান্তর ও উদ্যান-সমূহ নয়নগোচর করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। যতীন্দ্রবাবু বলিলেন "আষাঢ় মাসে এখানে দিবারাত্রি প্রায় অবিশ্রান্ত বিন্দু বিন্দু বর্ষণ হইতে থাকে, উদ্যানের বৃক্ষ লতা, নূতন পত্র পুষ্প পল্লবে বিভূষিত হওয়ায় ঐ সময় নগরের অপূর্ব্ব শোভা হয়। তখন এখানকার স্বাস্থ্য এত উৎকৃষ্ট হয় যে, জীবনের আশাহীন কোন চিররোগী ব্যক্তি ও কিছুকাল বাস করিলেই সবলদেহ ও প্রফুল্লবদন হইতে পারে। বম্বের গবর্ণর্ ঐ সময় পুণায় অবস্থিতি করেন।

সারদা-সদন। ১০ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে পণ্ডিতা রমাবাইর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য সারদা-সদনে গমন করিলাম। দ্বারদেশ হইতে নাম লিখিয়া পাঠাইলেই তৎক্ষণাৎ তিনি যাইতে

আদেশ করিলেন এবং বারান্দার সিঁড়ি পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। বসিবার ঘরটী বেশ সুসজ্জিত এবং অনেক মুদ্রিত গ্রন্থ ও সংবাদপত্রে পরিপূর্ণ। পণ্ডিতাবাইর সংপ্রতি শ্রবণশক্তির কথঞ্চিৎ ক্ষীণতা ঘটিয়াছে, তজ্জন্য চেয়ারখানি অতিনিকটে স্থাপন করিয়া কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। প্রথম পরিচয়ের পর, তাঁহার কন্যা ও মাতৃস্বসার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন "ইয়ং মে দুহিতা, অসৌ মম মাতৃস্বসা। কন্যাটীর বয়স দ্বাদশ বৎসর হইবে, নাম মনোরমাবাই। কুমারীবাইকে দেখিয়াও বেশ বুদ্ধিমতী বলিয়া বোধ হইল। রমাবাই চিকিৎসা-বিদ্যা-শিক্ষার্থ আমেরিকায় পাঠাইবার উদ্দেশ্যে আপন দুহিতাকে ইংরেজী ও লাটিন্ পড়াইতেছেন। কন্যা মাতার ন্যায় সম্পূর্ণ গৌরাঙ্গী না হইলেও সর্ব্বদা প্রফুল্লমুখী। রমাবাই কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন "বাঙ্গালাদেশ হইতে ফিরিয়া আসার পর নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতভাষায় কথোপকথন ঘটে নাই। ইংলণ্ডে অবস্থান কালে দুই দিন অক্সফোর্ড-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতাধ্যাপক ভট্ট মোক্ষমূলারের সহিত সাক্ষাৎ হয়। প্রথম দিন কথোপকথন কালে সংস্কৃতে আরব্ধ করিয়া ইংরেজীতে শেষ হইল। দ্বিতীয় দিন আলাপের সময় দুই চারিটী সংস্কৃত কথা ব্যতীত অধিকাংশই ইংরেজীতে সম্পন্ন করিতে হইয়াছিল। স্বদেশীয় যে সকল পণ্ডিত আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন, তাঁহারা মরাঠী ভাষায়ই কথা বলেন, আজ আপনার সহিত দেবভাষায় কথা বলায় আমার বড় আনন্দ বোধ হইতেছে"। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "য়ুরোপে বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত-চর্চ্চা কিরূপ হইতেছে?" রমাবাই বলিলেন সমস্ত য়ুরোপে যে কয়টী সংস্কৃতবিদ্ আছেন, তাঁহাদের সংখ্যা নখাগ্রে গণনা করা যায়"। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা

করিলাম "আপনি য়ুরোপে অবস্থান কালে কিরূপ পরিচ্ছদ ও খাদ্য পানীয় ব্যবহার করিতেন ?" তিনি বলিলেন "এখন যেরূপ পরিচ্ছদ দেখিতেছেন, আমি য়ুরোপ এবং আমেরিকায় অবস্থানকালেও এই রূপ পরিচ্ছদই ব্যবহার করিতাম, তবে এত সূক্ষ্ম নহে, সে সমুদয়ই উর্ণানির্ম্মিত, সুতরাং শীতের প্রভাব নিবারণে সমর্থ। আমি কখনও মাংস স্পর্শ করি নাই" অন্ন রোটিকা ডা'লও যথেষ্ট ঘৃতই আমার দেহ রক্ষার উপাদান ছিল। উহাতে আমার কিছুমাত্র কষ্ট হয় নাই, আমি বেশ সবলদেহে ও সুস্থমনে দেশে ফিরিয়াছিলাম।" দাক্ষিণাপথে এখন বেদচর্চ্চা কিরূপ হইতেছে, জিজ্ঞাসা করিলে পণ্ডিতা বাই বলিলেন "ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে বেদচর্চ্চা নাই বলিলেই হয়, মহারাষ্ট্রে ও দ্রাবিড়েই যাহা কিছু আছে, কিন্তু উহাও আশানুরূপ নহে। এই পুণা নগরীতে যে সকল বেদজ্ঞ পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের দুই একজন ব্যতীত বড় কাহারও বেদার্থ-পরিজ্ঞান নাই কিন্তু যাঁহাদের সুধু বেদ মুখস্থ আছে, এরূপ পণ্ডিতের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে"। ইংরেজী-শিক্ষার বিষয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন "ইংরেজী-শিক্ষায় মহারাষ্ট্র-দেশ বাঙ্গালা দেশের অনেক পশ্চাতে অবস্থিত। স্ত্রীশিক্ষা (ইংরেজী) ত বাঙ্গালাদেশের তুলনায় মহারাষ্ট্রে নিতান্তই অল্প হইতেছে"।

এই সকল কথার পর, রমাবাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি জানেন আমি কোন ধর্ম্মা বলম্বিনী ?" আমি বলিলাম "হাঁ আমি শুনিয়াছি, আপনি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন"। আবার প্রশ্ন করিলেন "এখানে ধর্ম্মমত লইয়া কাহারও সহিত আপনার কোন কথা হইয়াছিল কি ?" আমি বলিলাম "আনন্দাশ্রমে পুস্তকালয়াধ্যক্ষ পণ্ডিত মহাদেব শাস্ত্রীর সহিত

দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে সামান্ত কথোপকথন হইয়াছিল"। রমাবাই বলিলেন "দ্বৈতবাদীই হউন, আর অদ্বৈতবাদীই হউন, যিশুর কৃপা ব্যতীত কাহারই মুক্তি লাভের সম্ভাবনা নাই।" আমি বলিলাম "ইতিহাসাদিতে পাঠ করা যায়, খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যিশু-খ্রীষ্ট কিঞ্চিদূন দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। অতএব যে সকল লোক উক্ত মহানুভবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের তবে কি গতি হইয়াছে ?" তিনি বলিলেন "হাঁ তাহারা যদি সৎকর্ম্ম করিয়া থাকে, অবশ্য মুক্ত হইয়াছে। যাহারা যিশুর নাম শুনে নাই, অথচ উত্তম কার্য্য করে, তাহারা মুক্তি পাইতে পারে কিন্তু যাহারা যিশুর নাম শুনিয়াছে, অথচ ভজনা করে না, তাহারা যিশুর দয়া ভিন্ন পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে না।" আমি একটু অবিশ্বাসের ভাব দেখাইয়া বলিলাম "আপনার কথা আমি অনুমোদন করিতে পারিলাম না, কারণ উহার মূলে কিছুমাত্র যুক্তি নাই"। রমাবাই কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া একখানি সংস্কৃত বাইবেল্ বাহির করিলেন এবং উহার একটী স্থান পড়িতে আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি কয়েক পংক্তি পাঠ করিয়া বলিলাম "ইহার কিয়দংশ পাঠ করিয়াই আমার এত সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, যে বোধ হয় বহু বিতর্কেও তাহার নিরাস হইবে কিনা সন্দেহ"। তাহার পর, আরও অনেক কথা হইল। পণ্ডিতা রমাবাই জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি আর কয় দিন এখানে থাকিবেন ?" আমি বলিলাম "দুই দিনের অধিক নহে"। তিনি আর একবার সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম "আর বোধ হয় সাক্ষাৎ করিবার সুবিধা হইবে না, কারণ দুই দিনে আমার অনেক স্থান সন্দর্শন করিতে হইবে, অতএব এই শেষ সাক্ষাৎ"। রমাবাই

ডাক্তার গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের সহিত দেখা করিতে বলিলেন। আমি বলিলাম "আমি তাঁহার বাটীতে গিয়াছিলাম, দ্বারবানেরা বলিল, তিনি এখন লোণাবলীতে আছেন"। আমি আসার সময় পণ্ডিতাবাইকে বলিলাম "আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে, আপনার সহিত ধর্ম্মমত লইয়া বিতর্ক করিতে হইবে। অতএব ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতভেদ হওয়ায় যদি আপনার মতের বিরুদ্ধে কোন তীক্ষ্ণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকি, তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।" রমাবাই হাসিয়া বলিলেন "সে কি? ধর্ম্মসম্বন্ধে পৃথিবীতে মতভেদ চিরকালই আছে, তর্ক ব্যতীত সত্য নির্ণয় হয় না। আর আপনি ত তেমন কোন তীক্ষ্ণ বাক্য ব্যবহার করেন নাই, এ আপনার অতিরিক্ত বিনয় প্রকাশ করা হইতেছে। আপনি কলিকাতার বাইবেল-সোসাইটী হইতে এক খানি সংস্কৃত বাইবেল লইয়া পাঠ করিবেন এবং উহার কোন বিষয়ে সন্দেহ হইলে, কোন জ্ঞানী খ্রীষ্টানের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইবেন"। আমি বলিলাম "সর্ব্বদা সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়, অতএব অবসর পাইলে আমি বাইবেল পাঠ করিতে চেষ্টা করিব, আমাদের রাজার ধর্ম্মশাস্ত্রে কি আছে, উহা জানায় দোষ কি? তাহার পর, উভয়ে পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিয়া প্রায় ১০টার সময় বাসায় উপস্থিত হইলাম।

পণ্ডিতা রমাবাই একটী প্রভাববতী মহিলা। ইহার পিতার নাম অনন্তশাস্ত্রী ও মাতার নাম লক্ষ্মীবাই। অনন্ত, মহারাষ্ট্রের কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত ছিলেন। তিনি শৈশবে পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া শেষে পুণানগরীর প্রসিদ্ধ অধ্যাপক রামচন্দ্রশাস্ত্রীর নিকট অধ্যয়ন করিতে আসেন। তাঁহার অধ্যাপক যখন পেশোয়া-রাজপ্রাসাদের রাণীকে সংস্কৃত পড়াইতে যাইতেন, তখন অনন্তও

সঙ্গে থাকিতেন। একদিন তিনি উক্ত রাণীকে মধুরস্বরে সংস্কৃত কবিতা পাঠ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হন এবং বালিকা পত্নীকে সংস্কৃত শিক্ষা দিবার জন্য তাঁহার অন্তঃকরণে বাসনা জন্মে। তাহার পর, অনন্তশাস্ত্রী ত্রয়োবিংশতি কি চতুর্বিংশতি বর্ষে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে যান এবং পত্নীকে সংস্কৃত শিখাইতে চেষ্টা করেন কিন্তু গুরুজনের প্ররোচনায় তাঁহার পত্নী অধ্যয়ন করিতে সম্মত না হওয়ায় তাঁহার যত্ন ব্যর্থ হয়। কিছুদিন পরে তাঁহার পত্নী কালগ্রাসে পতিত হইলে তিনি পুনরায় বিবাহ করেন। এই নবপরিণীতা সুন্দরী বালিকার নাম লক্ষ্মীবাই। লক্ষ্মী বড় বুদ্ধিমতী ও স্বামীর আজ্ঞাকারিণী ছিলেন। স্বামী, প্রস্তাব করিবামাত্র তিনি লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করিলেন। গুরুজনেরা প্রথম নিষেধ করিলেন, শেষে লক্ষ্মীকে শিক্ষা হইতে বিরত করিবার জন্য নানা-প্রকার বিদ্রূপ ও পীড়াপীড়ি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অগত্যা অনন্তের গৃহত্যাগ করিতে হইল। তিনি বালিকা পত্নী, শয্যা ও কতিপয় গৃহসামগ্রী লইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। তাহার পর, সহ্যপর্ব্বতের পার্শ্বে গোদাবরী-সন্নিহিত গঙ্গামল নামক আরণ্য ভূভাগে দুখানি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। উহার অনতিদূরে দুই চারিটী ভীলের আবাস ব্যতীত অন্য লোকালয় ছিল না। ঐ স্থানের বনেচরগণ কর্তৃক তিনি সময়ে সময়ে উপকৃত হইতেন। তাহারা শাস্ত্রীকে বড় ভক্তি করিত এবং প্রায়ই শুষ্ক কাঠ, বনের ফল মূল, ক্ষেত্রের শস্য যোগাইত। অনন্ত, ঐ বিজন অরণ্যে প্রেমময়ী বালিকা ভার্য্যাকে লইয়া সুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার অভিষ্টসিদ্ধি হইল। লক্ষ্মীবাই সংস্কৃতভাষায় বেশ বিদুষী হইলেন। অনন্ত

ঐ সময় ভীলদের সাহায্যে কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিলেন এবং একটী নূতন আবাস প্রস্তুত করিলেন। ঐ নূতন ভবনে প্রবেশের পর, ক্রমে তাঁহার একটী পুত্র ও দুইটী কন্যা জন্মিল। এই কন্যা দুইটীর মধ্যে আমাদের বর্ণনীয় রমাই কনিষ্ঠা। ইনি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রেল মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা মাতা উভয়েই অতিযত্নপূর্ব্বক পুত্র কন্যাদের শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও দেশস্থ লোক তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়া তাঁহার গৃহে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন সুতরাং শাস্ত্রীর যাহা আয় হইত তদপেক্ষা অধিক ব্যয় হইতে লাগিল। তাঁহার প্রথমা কন্যার অল্প বয়সেই বিবাহ হইয়া গেল। শাস্ত্রী ও শাস্ত্রি-পত্নী প্রাণপণে পুত্রটীকে ও মেধাবিনী কন্যা রমাকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। ক্রমে শাস্ত্রী বার্দ্ধক্যে উপনীত হইলেন, এদিকে যাহা কিছু ছিল, ঋণদাতারা বিক্রয় করিয়া লইল। নিরুপায় হইয়া অনন্তশাস্ত্রী পত্নী ও সন্তানগণ সহ তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ কালে ও তিনি তীক্ষ্ণবুদ্ধি রমার শিক্ষা দানে বিরত হন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, শিক্ষা সমাপ্ত হইলে একটু অধিক বয়সে রমাকে কোন সৎপাত্রে অর্পণ করিবেন কিন্তু বিধাতা সকলের সকল ইচ্ছা পূর্ণ করেন না,, রমার বয়স যখন ১৫ বৎসর ৯ মাস, তখন শাস্ত্রী ও শাস্ত্রি-পত্নী পরলোক গমন করিলেন। যখন লক্ষ্মীবাইর মৃত্যু হয়, তখন একমাত্র সহোদর ব্যতীত রমার আর কেহই ছিল না। সুতরাং অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার সময় অপর দুইটী সাহায্যকারী ব্রাহ্মণের সহিত রমাকে ও জননীর মৃত দেহ বহন করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইতে হইয়াছিল। জনক জননীর মৃত্যুর পর, রমাবাই সহোদর সহ ভারতবর্ষের নানা

প্রদেশে পর্য্যটন করেন। তিনি ঐ সময় বঙ্গদেশেও আসিয়াছিলেন। কলিকাতার পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার সংস্কৃত-ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা ও সমস্যা-পূরণে অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়া "সরস্বতী" উপাধি প্রদান করেন। রমাবাই সরস্বতী যখন সমস্যা-পূরণার্থ আহূত হইয়া নদীয়া-রাজধানীতে গমন করেন, তখন আমরা নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক ৺কৃষ্ণকান্ত শিরোরত্ন মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিতাম। আমাদের অধ্যাপক মহাশয়ই রমা বাইকে কৃষ্ণনগরের রাজসভায় পূরণার্থ একটী কবিতাংশ প্রদান করেন*। তাহারপর, রমা কৃষ্ণনগর হইতে ঢাকা নগরীতে গমন করেন। সেখানে হটাৎ বিসূচিকা-রোগে তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যু হয়। ঐ আকস্মিক ঘটনায় অভিভূত না হইয়া তিনি শোক পরিহারপূর্ব্বক ঐ স্থান হইতে রংপুরে উপস্থিত হন। ঐ সময় রংপুরের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় তাঁহার গুণে একান্ত মোহিত হইয়া রমাবাইর একখানি প্রশস্তি রচনা করিয়া কোন ভূম্যধিকারিণীর সাহায্যে উহা মুদ্রিত করেন। কিছুকাল পরে রমাবাই একাকিনী শ্রীহট্টনগরীতে উপনীত হন এবং তত্রত্য শাহা-বংশ-সম্ভূত বাবু বিপিনবিহারী দাস এম্, এ, বি, এল্, নামক কোন যুবকের প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ হন। রমা কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মানুমোদিত বিবাহ করেন নাই। উহা অসাম্প্রদায়িক পরিণয় সুতরাং ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন অনুসারে উহা রেজেষ্টরি করা হয়।

* কবিতাংশ এই:—ভৃঙ্গৈঃ সংপ্রতিপক্ষতাং প্রবিদধৎ মাধাব রে পদ্মিনীম্।

বিবাহের পর, তিনি স্বামীর সহিত কিছুকাল, কাছাড়ে বাস করেন। কিন্তু এই প্রতিলোম বিবাহের ফল শুভ হয় নাই, বিবাহান্তে একটী কন্যা জন্মিলেই তিনি বিধবা হন। বিবাহের পর, এক বৎসর পাঁচ মাস মাত্র তাঁহার স্বামী জীবিত ছিলেন।

তাহার পর, কন্যা সহ রমা স্বীয় জন্মভূমি মহারাষ্ট্রে গমনপূর্ব্বক পুণা নগরীতে "আর্য্যমহিলাসমিতি" স্থাপন করেন। কিছুকাল ঐ স্থানে অবস্থান করিয়া স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য চেষ্টা করেন্ কিন্তু তিনি নিজের ইংরেজী-ভাষা জ্ঞানের অভাব অনুভব করিয়া আপন শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেখানে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ওয়ান্টেজ্ নগরীতে এক বৎসর ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন করেন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রমা চেল্টেনহাম-নগরের মহিলা-বিদ্যালয়ে সংস্কৃত-অধ্যাপিকার পদে নিযুক্ত হন। ঐ স্থানে অবস্থানের সময় তিনি অবসর কালে গণিত ও বিজ্ঞান-শাস্ত্র অভ্যাস করিতেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রমাবাই আমেরিকায় যান এবং তত্রত্য কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রীর পদ লাভ করেন। কয়েক বৎসর সেখানে কার্য্য করার পর স্বদেশে ফিরিয়া ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে পুণা-নগরীতে "সারদা-সদন" নামে একটী মহিলা-বিদ্যালয় স্থাপন্ করিয়াছেন। আমেরিকার খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারক-সম্প্রদায় ঐ সারদা-সদনের বাটী নির্ম্মাণের ব্যয়-স্বরূপ তাঁহাকে প্রায় ৭০,০০০ সত্তর হাজার মুদ্রা প্রদান করিয়াছেন। সারদা-সদনে বিদ্যার্থিনীর সংখ্যা ৬৬টী মাত্র। উহার অর্দ্ধাংশ, ছাত্রীনিবাসে থাকিয়া বিদ্যা অভ্যাস করেন এবং অর্দ্ধাংশ গ্রাম ও নগর হইতে আসিয়া অধ্যয়ন করিয়া যান। ছাত্রীদের অধিকাংশই হিন্দু, আর্য্যধর্ম্মাবলম্বিনী এবং

ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বিনীও আছেন। এই বিদ্যালয়ে মাসিক ১৫০০দেড় সহস্র টাকা ব্যয়িত হয়। উহাও আমেরিকার খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ প্রদান করেন। রমাবাইসরস্বতী খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বিনী হইলেও ধন্যবাদার্হ। কারণ তিনি যে রূপ নিঃসহায় অবস্থায় পতিত হইয়াও আপন অধ্যবসায়-প্রভাবে অসাধারণ খ্যাতি করিয়াছেন, উহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

অন্যান্য দ্রষ্টব্য। ঐ দিন অপরাহ্নে পূর্ব্বোক্ত যতীন্দ্র বাবুর সহিত ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়া নগরীর উত্তর পশ্চিমাংশে নদীবক্ষঃস্থ হোলকর-সেতু অতিক্রমপূর্ব্বক পুণার সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক-বিশ্ববিদ্যালয়ে উপনীত হইলাম। অত্রত্য কলেজ-বাড়ীটী মনোহর উদ্যানে সুশোভিত। যতীন্দ্রবাবু কলেজে লইয়া গিয়া কোথায় কৃষিশাস্ত্র, স্থপতিবিদ্যা ও যন্ত্রাদি-নির্ম্মাণ কার্য্য শিক্ষা হয়, উহা দেখাইলেন। তাহার পর, উদ্যান-মধ্যে প্রবেশ করিলাম। উহার একাংশে কয়েকখণ্ড ভূমিতে শস্যবীজ অঙ্কুরিত হইতেছে। কোন অংশে বা নানাবিধ ফুলের চারাগাছ একস্থানে সংগৃহীত আছে। ঐ সকল স্থলে জল-সেকের উত্তম ব্যবস্থা দেখিলাম। উদ্যানে কতই পরিজ্ঞাত ও অপরিজ্ঞাত পুষ্পিত তরুরাজি বিদ্যমান, উহার সংখ্যা করা যায় না। বরাহমিহির-কৃত বৃহৎসংহিতার বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ প্রকরণে বৃক্ষসমূহের রোপণ ও পালনের অনেক বিধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে বটে কিন্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের তীক্ষ্ণ মনীষা সে সমুদয় ভিন্ন আরও কত নূতন পদ্ধতি আবিষ্কারে ব্যাপৃত, তাহার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? বৈজ্ঞানিক-বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বমান একটী প্রশস্ত রাজপথ অবলম্বন করিয়া ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে চলিলাম। ঐ সুন্দর রাজ-

পথের উত্তর ভাগে বহু য়ুরোপীয়ের উদ্যান-শোভিত সুন্দর সুন্দর আবাস দৃষ্টিগোচর হইল। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ডাক্তার গোপাল-কৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের বাটী ও এই রাজপথের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত।

যাইতে যাইতে প্রান্তর মধ্যে উপস্থিত হইলাম। একটী শৈলমালার গাত্রে কতকগুলি গুহা আছে। উহার নাম পাণ্ডব-গুহা। সাধারণ লোকের বিশ্বাস, যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ বনবাস কালে এই গুহায় কিছুকাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ইহা পুরাকালের কোন-রূপ বৌদ্ধ-কীর্ত্তি। যাহা হউক, আমরা উক্ত গুহা ত্যাগ করিয়া প্রসিদ্ধ ফার্গুসন্-কলেজের সন্নিহিত হইলাম। কিয়ৎকাল পূর্ব্বে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রযত্নে এই কলেজটী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দেশীয় লোকের সম্পূর্ণ সাহায্যে ইহা পরিচালিত হইয়া থাকে। স্থানটী বড়ই মনোরম এবং বিদ্যার্থিগণের পাঠা-বস্থায় অবস্থানের সম্পূর্ণ উপযুক্ত। শৈলমালার বিজন উপত্যকায় পাষাণ-নির্ম্মিত সুন্দর বিদ্যামন্দিরটী বহুদূর হইতে নয়নগোচর হয়। পার্শ্বেই ছাত্রাবাস, কয়েকটী বিদ্যার্থী প্রান্তর-মধ্যে পাদচারণায় নিরত। অনেকে সমবেত হইয়া ব্যায়াম করিতেছে। এই স্থানটী নগর হইতে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানকার ছাত্রেরা নগরের বিলাস বিভ্রম হইতে দূরে থাকিয়া বেশ স্বাস্থ্য ও শান্তি উপভোগ করে। সূর্য্য অস্তগত-প্রায়, আমরা দ্রুতপদে পুণানগরীর পশ্চিমভাগস্থ ওয়েল্‌লীসেতুর উপরিভাগে উপনীত হইলাম। ইহার দক্ষিণে নদীর পূর্ব্বতীরে ভীষণ শ্মশানভূমি। নদী পার হইয়া আমরা অদৃষ্টপূর্ব্ব পল্লীসকল দেখিতে দেখিতে রাত্রি ৮টা বাজিয়া গেলে বাসায় উপনীত হইলাম।

পুণায় দেখিবার ও চিন্তা করিবার বিষয় অনেক আছে। যে পেশোয়া-নৃপতিদের জন্ম মহারাষ্ট্রের গৌরব, তাঁহাদের পুরাতন প্রাসাদ শনিবার-পেটে বিরাজিত। এখন উহা বহু-স্থানব্যাপী ধ্বংসাবশেষ মাত্র। উহার অনতিদূরে ওঙ্কারেশ্বর, হরিহরেশ্বর, অমৃতেশ্বর, মারুতি, গণপতি, অষ্টভুজার মন্দির এবং গায়কবার ভবন অবস্থিত। বর্ত্তমান পিঁজরাপোল (পশুপালনালয়) ও ঐ পল্লীতে বিদ্যমান। বুধবার-পেটে অষ্টমপেশোয়ার রাজপ্রাসাদ, বেলবাগ, ভাজিয়ামারুতির মন্দির, কোতোয়ালচাবড়ি, তাম্বড়ী যোগেশ্বরী, খনালীরামের মন্দির, মোরোবাদাদার ভবন, ভিদের ভবন, ধম্‌ধারের ভবন, ঠক্কের রামমন্দির ও পাসোদিয়া মারুতির মন্দির বিরাজমান। শুক্রবার-পেট, জীবাজীপন্থ খাস্‌গিবালে কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এই পল্লীতে তালিমখানা, তুলসীবাগ, নকড়-খানা, কালাহুদ, রামেশ্বরমন্দির, পন্থসচিবের প্রাসাদ, চৌধুরী-ভবন, হীরাবাগ ও পরেশনাথের মন্দির বিদ্যমান। সদাশিব নামক পল্লীটী, ৩য় পেশোয়ার ভ্রাতা সদাশিব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ঐ অংশে লকড়ীপুল, বিঠোবা ও মুরলীধরের মন্দির, খাজিনাবিহার, ফড়নবীশের জলাধার, বিশ্রামবাগপ্রভৃতি আছে। শিবপুরী নামক পল্লীতে ও দ্রষ্টব্য বস্তুর অভাব নাই। পেশোয়ার অশ্বা-রোহী সৈনিকগণের নেতা আনন্দরাওলক্ষ্মণ-রাস্তিয়ার শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার পর, এই স্থান শিবপুরী নামে খ্যাত হয়। এখানকার রাস্তিয়া-ভবন নামক বৃহৎ প্রাসাদ দর্শকের বিস্ময়জনক। মঙ্গলবার-পেটের নাগেশ্বরের মন্দিরটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভবানীনামক পল্লীটী পেশোয়া সবাই মাধবরাওর রাজত্বকালে নানাফড়নবীশ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। ঐ স্থানের

ভবানীমন্দির ও তেলফলাদেবীর মন্দির বেশ দর্শনযোগ্য। কস্‌বা নামক স্থানে গণপতি-মন্দির প্রভৃতি বিদ্যমান। আদিত্যবারপেট, বালাজীবাজীরাওর রাজত্ব-কালে মহাজনব্যবহার জোষী কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ পল্লীতে দুর্জ্জনসিংহের পাগ, ফড়কের প্রাসাদ, সোমেশ্বর-মন্দির, বেহোরাদিগের জমাৎখানা প্রভৃতি বিরাজিত। গণেশনামক পল্লীর মারুতির দোলমন্দির একটী দর্শনীয় পদার্থ। এতদ্ভিন্ন পুণার নদীতীরস্থ অসংখ্য দেবমন্দির ও মঠ পুণ্যাত্মা প্রতিষ্ঠাতৃগণের শরীরিণী অক্ষয়কীর্ত্তির ন্যায় বিরাজিত হইয়া নিয়ত দর্শকমণ্ডলীর হৃদয়ে পবিত্র আনন্দ প্রদান করে। পারসীকদিগের প্রেতভবন, সিন্ধিয়া-ছত্রী, বারুদখানা, গোরাবাগান, সেনাবারিক, জেলখানা, ফৌজদারী এবং দেওয়ানীকোর্ট প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য পদার্থ মধ্যে গণ্য।

বেদশাস্ত্রোত্তেজক-সভা। ১২ই জ্যৈষ্ঠ মধ্যাহ্ন আহারের পর পূর্ব্বের নির্দ্দেশ অনুসারে আদিত্যবারপেটে পূর্ব্বোক্ত ফড়কের সুবৃহৎ প্রাসাদে উপনীত হইলাম। ঐ দিন উত্তীর্ণ বিদ্যার্থিগণের পারিতোষিক প্রদানের নিমিত্ত উক্ত প্রাসাদের দ্বিতল গৃহে একটী বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছে। পুণা নগরীর হিন্দুসমাজের যাবতীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি ঐ সভা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। দ্বারদেশ হইতে বোধ হইল, উষ্ণীষবেষ্টিত মস্তকগুলি যেন স্ফটিকময় স্তম্ভশ্রেণীর ন্যায় বিরাজিত হইয়া সভার গাম্ভীর্য্য সূচনা করিতেছে। পূর্ব্বদিকে ঠিক মধ্যে একটী বেদীর উপরিভাগে সুপ্রসিদ্ধ শ্রীমন্ত রা০রা০ত্র্যম্বকরাওরামরাও উর্ফ নানাসাহেব পুরন্দর মহোদয় সুন্দর-কারুকার্য্য-খচিত বৃহৎ উষ্ণীষে মস্তক শোভিত করিয়া সভাপতির আসনে উপবিষ্ট। তাঁহার দক্ষিণ ভাগে প্রথমে দ্রাবিড়ী

এবং মহারাষ্ট্রীয় অধ্যাপকবর্গ ও তৎপর পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ বসিয়াছেন। বামভাগে ও সম্মুখে মহারাষ্ট্রের ইতিহাস প্রসিদ্ধ বংশসম্ভূত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সমাসীন। সভায় প্রায় পাঁচশতের অধিক ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছেন কিন্তু কার্য্যপ্রণালীর গুণে অনর্থক একটী শব্দ পর্য্যন্ত হইতেছে না। সভাগৃহের ভিত্তিতে অনেক আলেখ্য দৃষ্ট হইল। কিন্তু একটী চিত্রও বিলাসিতা-ব্যঞ্জক নহে, অধিকাংশই ইতিহাস-বিশ্রুত যুদ্ধের ছবিতে পরিপূর্ণ। যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম, কেবল অশ্বারোহী বীরগণের পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন ও দুর্গরক্ষার চিত্র নয়নগোচর হইতে লাগিল। আমি উপস্থিত হইলেই সম্পাদক মহাশয় আমাকে লইয়া গিয়া ছাত্রদের মধ্যে বসাইয়া দিলেন। সভাস্থ সকলেই আমার উষ্ণীষশূন্য মস্তকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। পূর্ব্বেই লিখিয়াছি "উষ্ণীষ একটী সভ্যতা-ব্যঞ্জক বস্তু, বিশেষতঃ সভাস্থ পাঁচশত সভ্য উষ্ণীষযুক্ত ও আমি একাকী নিরুষ্ণীষ" ইহাতে মনে মনে একটু লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। সভাসংলগ্ন অপরগৃহে যবনিকার অন্তরালে কতিপয় বিদুষী রমণীও উপবিষ্ট হইয়া সভার কার্য্য সন্দর্শন করিতেছিলেন। প্রথমে সভার অন্যতম সম্পাদক বলন্ত রামচন্দ্র সহস্রবুদ্ধি, মহারাষ্ট্রীয়-ভাষায় লিখিত গতবর্ষের কার্য্যবিবরণী পাঠ করিলে, সভাপতি মহাশয় উত্তীর্ণ ছাত্রবর্গের পারিতোষিক প্রদান করিলেন। প্রথম বেদের ব্যাখ্যায় উত্তীর্ণ ছাত্রবর্গকে, তাহার পর, শুধু বেদাভ্যাসী বিদ্যার্থিদিগকে পুরস্কার প্রদত্ত হইল। অনন্তর ছইটী ছাত্রের পর, আমি আহূত হইলাম। সভাপতি মহাশয় প্রথম প্রশংসাপত্র, তৎপর, চন্দনচূয়া ও পুষ্পমালার সহিত কাগজের মোড়কে করা পুরস্কারের

টাকাগুলি আমার হস্তে অর্পণ করিলেন। আমার পর, আরও অনেক ছাত্র পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন। কতকগুলি বিদ্যার্থী কেবল প্রশংসাপত্র লাভ করিলেন। পুরস্কার বিতরণ সমাপ্ত হইলে মহাদেবশাস্ত্রী ও ভিক্ষুবরশাস্ত্রী, সংস্কৃত-ভাষায় কিয়ৎকাল বক্তৃতা করিলেন। তাঁহারা আসন গ্রহণ করিলে সভাপতি শ্রীমন্ত রা°রা°ত্র্যম্বকরাও রামরাও উর্ফ নানাসাহেব পুরন্দর মহাশয়, অতীব ওজস্বিনী মহারাষ্ট্রীয়-ভাষায় কিয়ৎকাল বক্তৃতা করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। সভাপতির ধন্যবাদ জ্ঞাপনের পর, সভা-ভঙ্গ হইল। আমি যখন বাহিরে আসি, তখন চতুষ্পাঠীর ও কলেজের বহুবিদ্যার্থী আমাকে ঘিরিয়া ধরিলেন। আমি তাঁহাদের জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে দিতে নিম্নে অবতরণ করিলাম। বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর মধ্যে পুণাই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত স্থান। উক্ত নগরে যত শিক্ষিত লোকের বাস, বোধ হয় বোম্বাইপ্রদেশের আর কুত্রাপি তত নহে। এখানকার স্থানীয় শিক্ষিত লোকদের অনেকেই সংস্কৃত-ভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন। পুণা নগরীতে আসার পর, বাঙ্গালী ছাত্রগণ ভিন্ন অপর কাহারও সহিত আমার সংস্কৃতেতর ভাষায় কথা বলিবার প্রয়োজন হয় নাই।

রাজপথে উপস্থিত হইলেই একটী বিবাহের বরযাত্রি-সম্প্রদায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এই বরপক্ষ, এত সমারোহের সহিত যাইতেছেন যে, কাহার সাধ্য ঐ জনতা ভেদ করিয়া অগ্রসর হয়? বর, বীরোচিত উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আবৃত করিয়া একটী সুসজ্জিত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে যাইতেছেন। তাহার পর, আত্মীয় মহিলারা নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া বরের অনুগমন করিতেছেন। গ্রীষ্মকাল হইলেও প্রত্যেক রমণীর

সর্ব্বাঙ্গ লোহিত বর্ণের শালে আবৃত এবং পদযুগল জড়োয়া-কাজ করা পাদুকায় সুশোভিত। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, মহারাষ্ট্রীয় মহিলারা অবগুণ্ঠনে বদন আবৃত করেন না। সুতরাং তাঁহাদের অনাবৃত কবরীতে বিন্যস্ত সুবর্ণময় চন্দ্রক অথবা পদ্মগুলি অত্যন্ত শোভা বিস্তার করিতেছে। এই গজেন্দ্রগামিনীদের পশ্চাদ্-ভাগে সুবৃহৎ উষ্ণীষধারী পুরুষগণ পদভরে মেদিনী কম্পিত করিয়া যাইতেছেন। ইহাতে আর একটী বেশ কৌতুকাবহ দৃশ্য দেখিলাম। একটী ক্ষুদ্র বালিকা বরের পশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া বরের কর্ণের নিকট ছোট একটী ঘণ্টা বাজাইতেছে। জিজ্ঞাসা করিলে একটী বিদ্যার্থী বলিলেন "নববধূর মধুর স্বর বরের কর্ণে প্রবেশ করিলে, পাছে গুরুজনের উপর অশ্রদ্ধা জন্মে, তজ্জন্য পূর্ব্বকালে এই প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। অদ্যাপি সেই প্রাচীন পদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে।" আমি বলিলাম "নববধূর মধুর স্বর যখন বরের কর্ণে প্রবেশ করে, তখন বজ্রনিনাদও তাহার প্রতিবন্ধক করিতে পারে না, ক্ষুদ্র ঘণ্টার বাদ্য কি করিবে? উহা বর্ব্বরতার পরিচয় মাত্র"। ছাত্রটী আমার কথা শুনিয়া হাঁসিতে লাগিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দের দিবসেও বিবাহ হয়, উহা তাঁহারা অবৈধ মনে করেন না। আমি নারায়ণশাস্ত্রীকে বলিলাম "দিবা বিবাহের স্পষ্ট নিষেধ * সত্ত্বেও আপনারা কেন দিবসে বিবাহ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন"? তিনি বলিলেন "হাঁ। শাস্ত্রে নিষেধ আছে সত্য কিন্তু বহুকাল হইতে মহারাষ্ট্রে এই রীতি চলিয়া আসিতেছে"। দেশাচার অনন্ত, যে দেশের পক্ষে যাহা সুবিধাজনক, সে দেশের

* "মুহূর্ত্তচিন্তামণি" পাঠ করুন।

লোকে তাহাই অবলম্বন করে। বাসায় আসিয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইলাম। পুণার কার্য্য শেষ হইল, এখন দেশাভিমুখে গমনের জন্য ঔৎসুক্য বাড়িল। ছাত্রাবাসের বন্ধুগণও মান্দ্রাজী অপর একটী বিদ্যার্থী আগমন করিলেন, আহারের পূর্ব্বে অনেক ক্ষণ বসিয়া তাঁহাদের সহিত দক্ষিণাপথের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কথোপকথন করা গেল।

মহারাষ্ট্রের অধিবাসী।

দেশস্থ-ব্রাহ্মণ। ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রদেশেই ব্রাহ্মণজাতি প্রধান। মহারাষ্ট্রে ও ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা অল্প নহে। বঙ্গীয় ব্রাহ্মণগণের ন্যায় মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় ও বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে দেশস্থ ও কোঙ্কণস্থ—এই দুই শ্রেণীর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এক সময়ে দেশস্থ-শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণই মহারাষ্ট্র-প্রদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। এই সম্প্রদায়ের "দেশস্থ" নাম কেন হইয়াছে? দেশস্থ-ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে ও উহার সদুত্তর পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন "পর্ব্বতনিবাসী ব্রাহ্মণগণ হইতে সমতল ভূমির অধিবাসী ব্রাহ্মণদিগকে পৃথক্ করিবার জন্য দেশস্থ নামকরণ করা হইয়াছিল" কিন্তু উহাও অনুমান মাত্র। দেশস্থ-ব্রাহ্মণদের পূর্ব্ব নিবাস কোথায় ছিল, কি সূত্রে তাঁহারা মহারাষ্ট্রে আগমন করিয়াছিলেন, উহার কোনই ইতিবৃত্ত নাই। ইহারা বলেন "কিছুকাল পূর্ব্বে দেশস্থ-শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা নাসিক নামক স্থানে

বাস করিতেন। তাহার পর, ক্রমে সমস্ত মহারাষ্ট্রে ও কর্ণাট, মহীশূর, তাঞ্জোর, মদুরা, ত্রিবাঙ্কোর, ইন্দোর, গোয়ালিয়র, নাগপুর প্রভৃতি বহু স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহারা অদ্যাপি নিজ মহারাষ্ট্র-প্রদেশে বাস করিতেছেন, তাঁহারাই বিশুদ্ধ মরাঠী ভাষায় কথা বলেন, যাঁহারা দূরতর প্রদেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাদের ভাষা ও আচার ব্যবহারের কিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। দেশস্থ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদীই অধিক, সামবেদীর সংখ্যা নিতান্ত অল্প। সাতারা জেলায় কতকগুলি অথর্ব্ববেদী দেশস্থ-ব্রাহ্মণ আছেন। ঋগ্বেদীয়া প্রাতে ও সায়ংকালে আহ্নিক-কৃত্য সম্পন্ন করেন। আর যজুর্ব্বেদীয় মাধ্যন্দিনশাখাধ্যায়ীরা মধ্যাহ্নে সন্ধ্যোপাসনা করিয়া থাকেন। বেলগাঁর দেশস্থ-ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে আপস্তম্ব নামে এক শাখা আছেন, তাঁহারা ভাগিনেয়ের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া অত্যন্ত গৌরবের বিষয় মনে করেন। ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী দেশস্থ-ব্রাহ্মণেরা পরস্পর পান ভোজন করেন বটে কিন্তু ইহাদের মধ্যে আদান প্রদান প্রচলিত নাই। দেশস্থ-ব্রাহ্মণদের কিয়দংশ স্মার্ত্ত, কিয়দংশ বৈষ্ণব। স্মার্ত্তেরা সকলেই শৈব এবং জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য, আর বৈষ্ণবদিগের গুরু মধ্বাচার্য্য। স্মার্ত্ত-সম্প্রদায়ের কুলদেবতা ত্র্যম্বকেশ্বর, আম্বাগ্রামের যোগাদ্যা দেবী, তুলজাপুরের ভবানী, কোহ্লাপুরের অম্বাবাই ও ভীমাশঙ্কর। বৈষ্ণবদিগের কুলদেবতা, অবণ্ডা গ্রামের নাগনাথ, পণ্ঢরপুরের বিঠোবা এবং খাণ্ডোবাপ্রভৃতি। দেশস্থ-ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে দুইটি বিশেষ নিয়ম প্রচলিত আছে। প্রথম নিয়ম এই—ইহারা পিতৃস্বসার কন্যা ও ভগিনীর কন্যার বিবাহ করা

অবৈধ মনে করেন না। আপন পিস্তুত ভগিনী ও সহোদরার কন্যা (ভাগিনেয়ী) প্রায়ই ইহাদের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া থাকেন। দ্বিতীয় আচারটী এই ;—ইহারা আজ্রা দেবীর প্রীতির নিমিত্ত অল্পবয়স্কা বিধবাদিগের নিমন্ত্রণ করিয়া সিন্দুর, হরিদ্রা ও বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া তাঁহাদের পূজা করেন এবং তাঁহাদের প্রতি সধবার ন্যায় ব্যবহার করেন। মহারাজ শিবাজীর রাজত্বকালে দেশস্থ-ব্রাহ্মণগণের অবস্থা সবিশেষ উন্নত ছিল। মহারাজ শিবাজীর শিক্ষক দাদোজীকোদণ্ডদেব, গুরু রামদাসস্বামী, প্রধান মন্ত্রী পন্থপ্রতিনিধি, পন্থসচিব, পন্থ অমাত্য প্রভৃতি দেশস্থ-ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত ছিলেন। এই শ্রেণীতে জ্ঞানদেব, একনাথ, নিবৃত্তি-নাথ, সোপানদেব, রঙ্গনাথস্বামী প্রভৃতি অনেক সাধু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন আরও কত বিদ্বান্ ব্যক্তি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে? দেশস্থ ব্রাহ্মণদের মধ্যে কোন সামাজিক গোলযোগ উপস্থিত হইলে, স্ব স্ব সম্প্রদায়ের গুরু শঙ্করাচার্য্য বা মধ্বাচার্য্যের মঠের স্বামিগণ উহার মীমাংসা করিয়া থাকেন। ইহারা স্বশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণের মধ্যে পৌরহিত্য করেন। যাঁহারা শূদ্রযাজী, তাঁহারা যে কোন হীন-শ্রেণীর শূদ্রের বাটীতে পর্য্যন্ত পৌরহিত্য করিয়া থাকেন কিন্তু কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণের যাজন কার্য্য করেন না। পূর্ব্বে কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণের প্রতি ইহাদের এই বিদ্বেষ-বুদ্ধি আরও প্রবল ছিল। উক্ত ঈর্ষ্যাই ইহাদের অধঃপতনেরও কারণ হইয়াছিল। শিবাজীর রাজ্যকালে যেমন দেশস্থ-ব্রাহ্মণের প্রভাব অধিক হইয়াছিল, পেশোয়াদের আধিপত্য সময়ে উহা তেমনই খর্ব্ব হইয়া যায়। পেশোয়া-নরপতিগণ নিজে কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ-কুলসম্ভূত, সুতরাং

তাঁহারা কোঙ্কণস্থ-বিদ্বেষীদের ঈর্ষ্যার প্রতিশোধ লইতে সম্পূর্ণ সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়াই দেশস্থ-ব্রাহ্মণদিগকে বড় রাজকার্য্য প্রদান করিতেন না, সুতরাং কার্য্যক্ষেত্রে উৎসাহ ও শক্তি পরিচালনার অভাবে, ইহারা দিন দিন হীনপ্রভ হইয়া পড়েন। সম্প্রতি কেহ কেহ ইংরাজী শিক্ষা করিয়া গবর্ণমেণ্টের চাকুরী করিতেছেন বটে কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যাও অধিক নহে। অধিকাংশই কারকুনের কার্য্য * ও ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া দিনপাত করিয়া থাকেন। শোলাপুরের দেশস্থ-ব্রাহ্মণগণ বড়ই অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন।

কহ্লাড়ে ব্রাহ্মণ। কহ্লাড়ে ব্রাহ্মণগণ আপনাদিগকে দেশস্থ-ব্রাহ্মণের একটী শাখা বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। ইহাদের সংস্কৃত নাম "কারাষ্ট্র ব্রাহ্মণ" বা "করহাটব্রাহ্মণ"। মহারাষ্ট্রের লোকেরা বলেন "সেতারা নগরের দক্ষিণে কৃষ্ণা ও কোয়েনা নদীর সঙ্গমস্থলে কাহ্লাড় নামক একটী স্থান আছে। সেই স্থানের অধিবাসী বলিয়া ইহারা কাহ্লাড় নামে আখ্যাত"। মহাভারতে ও এই কারাষ্ট্র বা করহাট দেশ, দুষ্টদেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে †। স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রি খণ্ডে কারাষ্ট্র ব্রাহ্মণের অতিশয় নিন্দা কীর্ত্তিত হইয়াছে ‡

* কারকুনের কার্য্য—রাজস্ব আদায় ও হিসাব রাখা।

† মহাভারত সভাপর্ব্ব পাঠ করুন।

‡ কারাষ্ট্রো নাম দেশশ্চ দুষ্টদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সর্ব্বে লোকাশ্চ কঠিনা দুর্জ্জনাঃ পাপকর্ম্মিণঃ॥
তদ্দেশজাশ্চ বিপ্রাস্তু কারাষ্ট্রা ইতি নামতঃ।
পাপকর্ম্মরতা নষ্টা ব্যভিচার-সমুদ্ভবাঃ॥
তদ্দেশে মাতৃকা দেবী মহাদুষ্টা কুরূপিণী।
তস্যাঃ পূজা বহুশে চ ব্রাহ্মণো দীয়তে বলিঃ॥

কিন্তু শ্লোকগুলির রচনাভঙ্গী দেখিলে উহা নিতান্ত আধুনিক ও ঈর্ষ্যা-বশতঃ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে বলিয়া কতকটা মনে হয়। একজন প্রসিদ্ধ লেখক, কহ্লাড়-ব্রাহ্মণের শ্রেণীভেদের কারণ সম্বন্ধে নিম্ন-লিখিত কিম্বদন্তীর উল্লেখ করিয়াছেন। "বহুকাল পূর্ব্বে কোন দেশস্থ-ব্রাহ্মণের কন্যা দুশ্চরিত্রা হওয়াতে তাহাকে সমাজ হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়। পরে একটী দেশস্থ-ব্রাহ্মণ উক্ত স্ত্রী-লোকটীর সংসর্গ করাতে সেও সমাজচ্যুত হয়। ঐ ব্রাহ্মণ, ক্রমে অন্য যে সকল ব্রাহ্মণের সহিত আহার ব্যবহার করে, তাহারা সকলেই দেশস্থ-ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তাহারাই এখন কহ্লাড়ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত"। জানিনা, এই কিম্বদন্তীর মূলে কোন সত্য আছে কি না। কহ্লাড় ব্রাহ্মণগণ ও স্মার্ত্ত এবং বৈষ্ণব এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এই শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণগণ সকলেই ঋগ্বেদী। ইহাদের মধ্যে কাশ্যপ, উপমন্যু, মৌদ্গল্য, বৈণ্য, কৌশিক, কৌণ্ডিন্য, গার্গ্য, গৌতম প্রভৃতি ২০টী গোত্র আছে। কহ্লাড়-ব্রাহ্মণের অনেকে কেবল ভিক্ষার দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। রাজা-পুর, শান্তবাড়ী প্রভৃতি স্থানে ইহারা শুভ দিন ক্ষণ নির্ণয় করেন ও ঠিকুজী কোষ্ঠী লিখিয়া থাকেন। মালবন ও অন্যান্য স্থানে

ন কৃতা যেন সা হত্যা কুলং তস্য ক্ষয়ং ব্রজেৎ।
এবং পুরা তয়া দেব্যা বরো দত্তো দ্বিজান্ কিল॥
তেষাং সংসর্গমাত্রেণ সচেলং স্নানমাচরেৎ।
তেষাং দেশান্তরে বায়ুর্ন গ্রাহ্যো যোজনত্রয়ম্॥
স্কন্দপুরাণ, সহ্যাদ্রিখণ্ড ২।২।

ইহারা কুলকর্ণী * ও দেশপ্রভুর † পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন; কোহ্লাপুর অঞ্চলে ইহাদিগকে কারকুনের কার্য্য করিতে দেখা যায়। বোম্বাই নগরের কহ্লাড়-ব্রাহ্মণগণ পরভু (কায়স্থ) দিগের পুরোহিত। এতদ্ভিন্ন ইহাদের মধ্যে অনেক পৌরাণিক ও কথক আছেন। শান্তবাড়ী অঞ্চলে কহ্লাড়-ব্রাহ্মণদের মধ্যে একটী ভীষণ প্রথা বিদ্যমান ছিল। ইহারা আশ্বিন মাসের শুক্লা অষ্টমীতে, অভাবে ঐ পক্ষের অন্য কোন তিথিতে মাতৃকা দেবীর সন্নিধানে নরবলি প্রদান করিতেন। জামাতাই ইহাদের মতে শ্রেষ্ঠ বলি। জামাতার অভাবে সাধারণ ব্রাহ্মণ কিংবা অন্য কোন বর্ণের লোক বলি প্রদানার্থ গৃহীত হইত। প্রথম বধ্য ব্যক্তির খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে অল্প বিষ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইত। ঐ ব্যক্তি উহা খাইয়া অচৈতন্য হইয়া পড়িলে দেবীর সম্মুখে লইয়া সংহার করা হইত। তজ্জন্য আজ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি, প্রাণান্তেও আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে কহ্লাড়-ব্রাহ্মণের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে না। এমন কি অন্য দিনে ইহাদের গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণেও ভীত হয়। ঐ প্রথা নাকি কহ্লাড়-ব্রাহ্মণের একটী কুলধর্ম্ম। তাঁহাদের বিশ্বাস, দেবতার সমক্ষে ঐরূপ বলি না দিলে বংশবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি হয় না। পূর্ব্বে সমস্ত কহ্লাড়-ব্রাহ্মণই শাক্ত ছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে উক্ত কুপ্রথা বিদ্যমান ছিল। তজ্জন্য সহ্যাদ্রি-খণ্ডেও উহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আইনবলে উক্ত প্রথা নিষিদ্ধ করা হইয়াছে। এখন প্রায়ই নরবলির কথা শুনিতে পাওয়া

* যাঁহারা সমস্ত গ্রামের আয় ব্যায়র হিসাব রাখেন, তাঁহারা কুলকর্ণী নামে অভিহিত।

† যাঁহারা সমস্ত পরগণার হিসাব রাখেন তাঁহাদিগকে "দেশপ্রভু" বলে।

যায় না। উহার পরিবর্ত্তে দেবীর সম্মুখে ছাগ-বলি প্রদত্ত হয়।

যাহা হউক, কহ্লাড়-ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে এই সকল কিম্বদন্তী সত্ত্বেও ইহাদের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বলা যাইতে পারে, ইহারা বেশ উদ্যমশীল ও দাতা। কহ্লাড়-ব্রাহ্মণগণ ক্রিয়া কর্ম্মে বিলক্ষণ ব্যয় করিয়া থাকেন। কহ্লাড় হইতে ইহারা ভারতবর্ষের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। নাগপুর, ঝাঁসী, দেওঘর,বারাণসী প্রভৃতি স্থানেও অল্লাধিক পরিমাণে কহ্লাড়-ব্রাহ্মণের বাস আছে। ঝান্সীর রাণী সুপ্রসিদ্ধা লক্ষ্মীবাই কহ্লাড়-ব্রাহ্মণকুলসম্ভূতা ছিলেন। এতদ্ভিন্ন এক সময় মহারাষ্ট্রে কতকগুলি খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া কহ্লাড়-ব্রাহ্মণকুল উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রী তালকর, ইংরেজী ও মরাঠী ভাষায় একখানি অভিধান প্রণয়ন করেন। গোপাল শাস্ত্রী, বাল্মীকি-প্রণীত সংস্কৃত রামায়ণের মরাঠী ভাষায় অনুবাদ করেন। মোরোপন্থ, একজন বিখ্যাত কবিও ঔপন্যাসিক, তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের ১১ শ স্কন্ধ মরাঠী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। বালগঙ্গাধর শাস্ত্রী, মরাঠী, কাণাড়ী, গুজরাটী, হিন্দী, বাঙ্গালা, পার্সী, লাটিন্ এবং ইংরেজী ভাষায় একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি ছিলেন। ইনি মরাঠী ভাষায় দিগ্দর্শননামক একখানি মাসিকপত্র প্রচার করেন। গোবিন্দবিট্ঠল মহাজন ও একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি। ইনি প্রভাকর ও ধূমকেতু নামক দুই খানি সংবাদপত্রের সম্পাদক ছিলেন। রঘুনাথ শাস্ত্রী এবং কাশীনাথ শাস্ত্রীও কৃতবিদ্য বলিয়া খ্যাত। সিবিল্সার্জ্জেণ্ট শ্রীপদবাবাজী ঠাকুরও অল্প প্রসিদ্ধ ছিলেন না।

কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ। যাঁহাদের জন্য মহারাষ্ট্র-ভূমির এত গৌরব,

সেই সুপ্রসিদ্ধ কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণের কথা এ পর্য্যন্ত বলা হয় নাই। রামেশ্বর ক্ষেত্র হইতে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত সমুদ্রতীরবর্ত্তী দুর্গম অরণ্যানী ও শৈলমালা-পরিবেষ্টিত ভূভাগ কোঙ্কণ নামে অভিহিত। এই কোঙ্কণের অধিবাসী ব্রাহ্মণগণের নাম কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ। ইহারা সাধারণতঃ চিত্তপাবন, বা চিৎপাবন নামেও কথিত হইয়া থাকেন। চিত্তপাবন-ব্রাহ্মণের স্ত্রী পুরুষ সকলেই প্রায় গৌরাঙ্গ এবং সুদর্শন। এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বলেন "পরশুরাম আর্য্যাবর্ত্ত হইতে যে চতুর্দ্দশটী ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া দক্ষিণাপথে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁহাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা সেই চতুর্দ্দশটী ব্রাহ্মণের বংশসম্ভূত। ইহারা অন্যের চিত্ত পবিত্র করেন বলিয়া "চিত্তপাবন" আখ্যায় আখ্যাত হইয়া থাকেন"। কিন্তু স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে;—যে সময় পরশুরাম তীর্থ-পর্য্যটনের নিমিত্ত দক্ষিণাপথে গমন করেন, সেই সময় একদিন শ্রাদ্ধ ও যজ্ঞ উপলক্ষে সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ঋষিরা কেহই আগমন না করায় তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—"আমি নূতন কর্ত্তা, নূতন ক্ষেত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি, ব্রাহ্মণগণ কেন আগমন করিলেন না? যাহা হউক, আমি নূতন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিব"। পরদিন সূর্য্যোদয়ে যখন তিনি স্নানার্থ সাগরতীরে গমন করিলেন, তখন কতকগুলি লোককে আসিতে দেখিয়া তাহাদের জাতি ও গোত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং স্বীয় অভিপ্রায়ও তাহাদিগকে জানাইলেন। তাহারা বলিল "প্রভো! আমরা ধীবর, আমাদের আবার গোত্র কি? আমরা ব্যাধের কার্য্য করিয়া জীবনধারণ করি"। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পরশুরাম উহা শুনিয়াও ক্ষান্ত হইলেন না। তৎক্ষণাৎ মাছধরা জালের সূতা দ্বারা উহাদের উপবীত করিয়া দিয়া ব্রাহ্মণ্য ও সর্ব্ববিদ্যায় বিশারদত্ব

প্রদান করিলেন। চিতাস্থানে পবিত্র হওয়ায় চিৎপাবন আখ্যা হইল। ত্রৈলোক্যাধিপতি পরশুরাম তাহাদিগকে নিজ আলয়ে আনয়ন পূর্ব্বক গোত্র ও আখ্যা প্রদান করিলেন এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী কোঙ্কণ প্রদেশে স্থাপন করিলেন। পরশুরামের প্রসাদে ইহারা সকলে গৌরবর্ণ, সুলোচন ও সর্ব্ববিদ্যার পারদর্শী হইল। পরশু-রাম, প্রস্থান কালে বলিয়া গেলেন, যখন তোমাদের কোন প্রয়োজন হইবে, স্মরণ করিও, আমি তৎক্ষণাৎ আগমন করিব। একদিন তাহারা প্রভুর অনুগ্রহ পরীক্ষার্থ, অকারণ তাঁহাকে স্মরণ করিল। পরশুরাম তখনই আগমন করিলেন কিন্তু কোন কার্য্য না দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া এই বলিয়া অভিশাপ দিলেন যে "এই সকল ব্রাহ্মণ নিন্দনীয়, দরিদ্র এবং রাজসেবা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। এই কোঙ্কণজ ব্রাহ্মণ সর্ব্বকার্য্যে পরিত্যাজ্য হইবে *।

এই ত গেল পুরাণের কথা, ইহা ব্যতীত ইহারা পরশুরাম-শৈলের নিকটস্থ চিত্তপুল-গ্রামে পরশুরামের মূর্ত্তি পূজা করেন বলিয়া সহ্যাদ্রি-খণ্ডোক্ত বচনের উপর অধিকতর বিশ্বাস স্থাপনপূর্ব্বক অনেকেই ইহাদিগকে পরশুরামের সৃষ্টি বলিয়া থাকেন। আর একটী কিম্বদন্তী

---

* শ্রাদ্ধার্থং চৈব যজ্ঞার্থং মন্ত্রিতাঃসর্ব্বব্রহ্মণাঃ।
নাগতা ঋষয়ঃ সর্ব্বে ক্রুদ্ধোঽভূদ্ ভার্গবো মুনিঃ॥

. . .

ব্রাহ্মণাশ্চ ততো দত্বা সর্ব্ববিদ্যাস্থ লক্ষণম্।
চিতাস্থানে পবিত্রত্বাচ্চিত্তপাবন-সংজ্ঞকাঃ॥

. . . .

চিৎপাবনস্য চোৎপত্তিরিদং চৈব তু কারণম্।
সহ্যাদ্রেশ্চ তলে গ্রামশ্চিত্তপোলননামতঃ॥
(স্কন্দপুরাণ, সহ্যাদ্রিখণ্ড)

আছে; পরশুরাম কতকগুলি মৃত মনুষ্যকে সমুদ্র-জলে ভাসিতে দেখিয়া তাহাদিগের জীবনদানপূর্ব্বক গলায় উপবীত দিয়া সমুদ্র-তীরে বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন, তাঁহারাই কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ। কেহ কেহ এই শেষোক্ত কিম্বদন্তীতে বিশ্বাস করিয়া অনুমান করেন-"ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা তরী ভগ্ন হওয়ায় সমুদ্রস্রোতে ভাসিয়া কোঙ্কণে আসিয়া পড়েন—এইরূপ যে, জনপ্রবাদ আছে, উহা মিথ্যা নহে। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা পারস্য হইতে পলায়িত অগ্নি-পূজক পারসীকগণের সন্তান। নতুবা ভগ্ন তরীর কথা কি জন্য প্রচলিত হইবে?" কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত জনশ্রুতিই অমূলক। কারণ পরশুরাম, যেই ইচ্ছা করিলেন, অমনি কতকগুলি ধীবর, ব্রাহ্মণ হইয়া গেল, ইহা কথনই সম্ভব হইতে পারে না। আর পারসীকগণের বংশধর বলিয়া যে প্রবাদ, উহাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। যে হেতু কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণগণের বর্ণ গৌর হইলেও পারসীক-জাতির আকৃতির সহিত ইঁহাদের আকৃতিগত কোন সৌসাদৃশ্য নাই। আরও অবিশ্বাসের কারণ এই যে, পারসী-কেরা প্রাণান্তেও ধর্ম্মান্তর পরিগ্রহ করে না। প্রকৃত কথা এই—কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণের পূর্ব্ব অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। কোঙ্কণের অধিকাংশস্থল দুর্গম অরণ্যানী ও কঠিন শৈলমালায় পরিব্যাপ্ত সুতরাং শস্যাদি ভালরূপ জন্মিত না এবং বাণিজ্যের ও তেমন সুবিধা ছিল না, সুতরাং রাজা কিংবা ধনী লোকের অভাবে ঐ দেশীয় ব্রাহ্মণদিগকে অতিদীনভাবে জীবনযাপন করিতে হইত। যাহারা উত্তর কোঙ্কণ ছাড়িয়া মহারাষ্ট্রের পূর্ব্বাংশে আগমন করিত, তাহারাও বিদ্যা ব্রহ্মণ্যের অভাবে কেবল ভিক্ষা ও জলবাহকের কার্য্যের দ্বারা কিছু কিছু অর্থ

উপার্জ্জন করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইত। সেই সময় হইতেই দেশস্থ প্রভৃতি অন্যান্য ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায় উহাদিগকে ঘৃণা করিতেন। তাহার পর, মুসলমান সাম্রাজ্যকালে যখন কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণেরা অত্যাচারী শাসনকর্ত্তাদের উপদ্রবে প্রপীড়িত হইয়া দলে দলে মহারাষ্ট্রের পূর্ব্বাংশে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল, তখন ক্ষমতাপন্ন দেশস্থ-ব্রাহ্মণগণের বিদ্বেষভাব আরও প্রবল হইয়া উঠিল। সেই সময়েই বোধ হয় কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণদিগের বিরুদ্ধে নানাবিধ গ্লানিপূর্ণ বচন রচনা করিয়া স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন "ভারতবর্ষের জল বায়ুর এই একটী বিশেষত্ব যে, এদেশের লোক, অনেক সময় প্রকাশ্য ভাবে শত্রুতা না করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের কুৎসাপূর্ণ বচন রচনা করিয়া শাস্ত্রীয় গ্রন্থ মধ্যে প্রক্ষিপ্ত করিয়া রাখে। উক্ত গ্রন্থের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সেই সম্প্রদায়ের নিন্দা স্রোত ও ক্রমে বাড়িয়া যায়। ইহাতে অতিসহজেই ইষ্ট-সিদ্ধি হয়। কারণ লোককে অবমানিত করার এরূপ সহজ উপায় আর নাই। এই প্রকার আত্মকলহ দ্বারাই ভারতবর্ষ আবাহমান কাল ব্যাপিয়া অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হইতেছে"। কথিত আছে ;—বাজীরাও পেশোয়া এক সময় স্কন্দ পুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ড দগ্ধ করিবার অনুমতি করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে অনেক পুস্তক ভস্মীভূত করা হয়। এখনও প্রতিবৎসর কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণেরা সভা করিয়া উক্ত পুস্তক দগ্ধ করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ সহ্যাদ্রিখণ্ডে চিত্তপাবন-ব্রাহ্মণের এত গ্লানিপূর্ণ বচন আছে যে, উহা পাঠ করিলে চিত্তপাবন-বিদ্বেষীদের চরিত্রের প্রতি নিতান্ত ঘৃণা জন্মে। শাস্ত্রে কখনও ঐরূপ

গ্লানিকর কথা থাকা সম্ভব নহে। উহা খলস্বভাব ব্যক্তিদের বিদ্বেষ-বুদ্ধির নিদর্শন মাত্র। বর্ত্তমান সময়ে চিত্তপাবন-ব্রাহ্মণকুলে এমন অনেক পণ্ডিত বিদ্যমান আছেন, যাঁহারা ইচ্ছা করিলে অবলীলাক্রমে স্কন্দপুরাণের ন্যায় শত শত পুরাণ রচনা করিতে পারেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মহারাজ শিবাজীর সময়ে দেশস্থ-ব্রাহ্মণেরাই একাধিপত্য করিতেন। মহারাজ সাহুর অধিকারকালে কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণগণের উন্নতির সূত্রপাত হয়। উক্ত নরপতির প্রধানমন্ত্রী (পেশোয়া) বালাজী বিশ্বনাথভট্টের আবির্ভাবে যথার্থই কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণকুল ধন্য হইয়াছে। তিনিই উক্ত ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের উন্নতির একমাত্র হেতু। একদা বিশ্বনাথভট্ট কয়েক জন দেশস্থ কর্ম্মচারীকে কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে স্থানান্তরে যাইতে আদেশ করেন। তাঁহারা উক্ত আদেশ গ্রাহ্য করেন না। অগত্যা তিনি একজন কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ দ্বারা উক্ত কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া লন এবং মহারাজ সাহুর আদেশ গ্রহণপূর্ব্বক কোঙ্কণ হইতে দুই শত ব্রাহ্মণ-বালক আনাইয়া তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া দেন। তাহারা যেমন শিক্ষিত হইতে লাগিল, অমনি পেশোয়া তাহাদের উচ্চ উচ্চ পদ দিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে দিন দিন কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইতে লাগিল। যত দিন পেশোয়াদের রাজত্ব ছিল, তত দিন এই শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণেরা মনের আনন্দে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র প্রভুত্ব করিয়া বেড়াইয়াছিল। এ দিকে কার্য্যক্ষেত্রে শক্তি পরিচালনার উপযুক্ত অবসর না পাইয়া দেশস্থ-ব্রাহ্মণগণ ক্রমে ক্রমে অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলেন। ১৭২৭ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম দেখিয়াছিলেন, তাঁহার রাজ্যের সমুদয়

রাজকর্ম্মচারীর পদই কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ-কর্ত্তৃক অধিকৃত। ইংরেজ-রাজত্বের প্রারম্ভে যখন ইংরেজগবর্মেণ্ট পুণায় একটী পাঠশালা স্থাপন করেন। তখনও উত্তর কোঙ্কণ হইতে অনেক কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণসন্তান পুণায় আগমন করিয়া উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং শিক্ষাশেষে ভাল ভাল রাজকর্ম্মচারীর পদ প্রাপ্ত হন। যাহা হউক, এখন কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষমতা না থাকিলেও ইহাদের অবস্থা নিতান্ত অনুন্নত নহে। ইহারা বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, মেধাবী, দূরদর্শী, চতুর, স্বার্থপর এবং আত্মাভিমানী। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে ইহাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারেন, মহারাষ্ট্রে এরূপ সম্প্রদায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণগণের কেহ কেহ ঋগ্বেদের শাকল শাখা-ভুক্ত, কেহ কেহ বা কৃষ্ণযজুর্ব্বেদী। ইহাদের মধ্যে অত্রি, কপি, কাশ্যপ, কৌণ্ডিন্য, জামদগ্ন্য, গর্গ, কৌশিক, বিষ্ণুবৃদ্ধ, বাভ্রব্য, বসিষ্ঠ, ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্র আছে। কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণের উপাধি—অভ্যঙ্কর, জোষী, পটবর্দ্ধন, রাণাডে, গদ্রে, ভুগলে, মোদক প্রভৃতি। ভাষা কোঙ্কণী ও মরাঠী। আচার ব্যবহার দেশস্থ-ব্রাহ্মণ হইতে অনেকটা বিভিন্ন। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই স্মার্ত্ত, মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ও আছেন। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অল্প। কোন রূপ সামাজিক গোলোযোগ কিংবা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হইলে, কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণেরা প্রথম বারাণসী, নাসিক ও অন্যান্য ধর্ম্মক্ষেত্রের মত আনয়ন করেন। শেষে জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের মঠে উহা প্রেরণ করা হয়। মঠাধীশ শঙ্করাচার্য্যের মীমাংসাই শেষ মীমাংসা। কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণেরা স্বশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণকেই পৌরহিত্যে নিযুক্ত করেন। পুরোহিত, কেবল শান্তি স্বস্ত্যয়ন এবং পূজাদি

করিয়াই অব্যাহতি, পান না, তাঁহাকে প্রায়ই যজমান-গৃহিণীর ফরমাজ খাটিতে হয়। ঘটকালী করিতে হয়, সময়ে সময়ে বাজার সরকারের কাজও করিতে হয়। ইহা ছাড়া পুরোহিতের কিছু বেদান্ত জানা আবশ্যক, কারণ সময়ে সময়ে যজমানদিগকে শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারে কিছু কিছু উপদেশ দিতে হয়।

ইহাদের সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে তৎক্ষণাৎ জাতকর্ম্ম, পুণ্যাহবাচন, মাতৃকা-পূজা, নান্দীশ্রাদ্ধ ও শান্তি পাঠ করা হয়। পঞ্চম দিবসে বন্ধু বান্ধব ও ভিক্ষুদিগের ভোজন ব্যাপার। ষষ্ঠ দিবসে প্রসূতি স্নান করিয়া শুদ্ধ হন। দ্বাদশ দিবসে শিশুর কর্ণবেধ হয়। পুত্র হইলে চতুর্থ মাসে সূর্য্যাবলোকন ও ষষ্ঠ অষ্টম দশম ও দ্বাদশ মাসে অন্নাশন হইয়া থাকে। জন্মতিথি উপলক্ষ্যে প্রজাপতি, গণেশ, মার্কণ্ডেয়, ব্যাসদেব, কুলদেবতা, জন্মনক্ষত্র-দেবতা, ষষ্ঠী, প্রহ্লাদ, বলী, পরশুরাম, বিভীষণ, হনুমান্, অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্যের পূজা করিতে হয়। প্রথম হইতে পঞ্চম বর্ষের মধ্যে চূড়াকরণ ও সপ্তম হইতে দশম বর্ষের মধ্যে যজ্ঞোপবীত প্রদত্ত হয়। উপনয়নের দিন হইতে দ্বাদশ দিনের মধ্যে সমাবর্ত্তন হইয়া থাকে। ইহারা কন্যার ছয় বর্ষ হইতে দশ বৎসরের মধ্যে ও পুত্রের দশ হইতে কুড়ি বৎসরের মধ্যে বিবাহ দেন। বিবাহ-কালে বর, যৌতুক ব্যতীত অনেক উপহার প্রাপ্ত হন। কন্যাও উপহারে বঞ্চিত হন না। কন্যা-সম্প্রদানের জন্য কয়েক দিন পূর্ব্বে বিবাহমণ্ডপ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। বিবাহের পর, বর যখন শ্বশুর বাড়ীর গ্রাম পার হন, তখন সীমান্ত-পূজা করিতে হয়। বর কন্যার এক গ্রামে বাস হইলে বিবাহের পূর্ব্বাহে বা পরাহে গ্রামস্থ মন্দিরে বা বরের গৃহে সীমান্ত পূজা হয়। বরের গৃহে সীমান্ত-পূজাকালে কন্যাপক্ষীয় কোন সধবা প্রবীণা

রমণী, একটী চুবড়িতে নারিকেল, চাউল, ঘোল, দধি, দুগ্ধ, মধু, গুড়, চিনি, হলুদ, সিন্দূর, পুষ্প, চন্দন এবং একটী থলিয়াতে পান সুপারি জড়াইয়া দুখানি উত্তরীয়, দুইটী পাগড়ি, ফুলের ছড়া প্রভৃতি দ্রব্য একখানি চৌকির উপর বনাত চাপা দিয়া উহার উপরে কতকগুলি তামার পয়সা ছড়াইয়া রাখেন। পরে, পুরোহিতের হস্তে ঐ চৌকি খানি দিয়া পূর্ব্বোক্ত সধবা রমণী উক্ত পুরোহিত ও কন্যাপক্ষীয় পুরুষ এবং রমণীগণ সহ বরের বাটীতে যান। সেই সময় বরের বাটীতে বাজনা বাজিতে থাকে। বরকর্ত্তা বহির্ব্বাটীতে পুরুষদিগকে ও বরের মাতা কন্যার জননী প্রভৃতিকে সাদরসম্ভাষণ-পূর্ব্বক অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া বসান। তাহার পর, কন্যার পুরোহিতকর্ত্তৃক আনীত সেই উচ্চ চৌকীর পার্শ্বে দুই খানি ছোট চৌকি রাখিয়া তাহার উপর বনাত পাতিয়া দেন। বর, সেই উচ্চ চৌকীর উপর ও কন্যার পিতা মাতা উভয় পার্শ্বস্থ ছোট চৌকীর উপর উপবেশন করেন। কন্যার পিতা, প্রথম গণনাথের পূজা করিয়া কুলপুরোহিতকে একটী পাগড়ী প্রদান করেন। তাহার পর, বরের পূজা। কন্যার মাতা অগ্রে গরম জল দিয়া বরের দক্ষিণ পদ ধৌত করেন। কন্যার পিতা, বরের পা মুছাইয়া তাহার কপালে চন্দন ও মস্তকে ধান্য প্রদান করেন। পরে তিনি বরকে নূতন একটী পাগড়ী ও উত্তরীয় পরিতে দেন। বর নিজের পাগড়ী রাখিয়া সেই পাগড়ীটী পরেন এবং উত্তরীয় খানি স্কন্ধে স্থাপন করেন। সেই সময় বরের ভগিনী, পশ্চাৎ হইতে বরের পাগড়ীতে একগাছি ফুলের মালা জড়াইয়া দেয়। কন্যার পিতা বরকে পঞ্চামৃত খাইতে দেন, চতুর্দ্দিক্ হইতে পুষ্পবৃষ্টি ও ধান্যবৃষ্টি হইতে থাকে। কুলপুরোহিত

তখন মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকেন। ইহার পর, কন্যার মাতা বরের ভগিনীর পা ধুইয়া দেন। অন্তঃপুরে গিয়া পুনরায় বরের মাতা ও অপরাপর মহিলাগণের পা ধোয়াইয়া তাঁহাদের কোঁচড়ের কাপড়ে নারিকেল, চাউল ও চিনি প্রদান করেন। অন্তঃপুরে যখন ঐ সকল ক্রিয়াসম্পন্ন হয়, সেই সময়ে বাহিরে কন্যার আত্মীয়েরা অভ্যাগতদিগের কপালে চন্দনের টিপ ও পানসুপারি, নারিকেল দিয়া অভ্যর্থনা করেন। তাহার পর, কন্যা-পক্ষীয় সকলে স্ব স্ব গৃহে চলিয়া যায়। সেই দিন সায়ংকালে কন্যার পিতা ভিন্ন অন্যান্য আত্মীয়গণ নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য লইয়া বরের বাটীতে যায়। প্রথমে বর, সমবয়স্ক বালকগণের সহিত সেই সকল খাদ্য খায়। তাহার পর, বরপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয় কুটুম্বগণ আহারাদি করে। এদিকে কন্যা, পীতবসন পরিধানপূর্ব্বক হরগৌরীর সম্মুখে এক খানি ছোট চৌকীতে বসিয়া এই রূপ প্রার্থনা করে :—

"গৌরি গৌরি সৌভাগ্য দে,
দারি যেতিল ত্যাল্ আয়ুব্ দে"।

ইহার মর্ম্ম এই ;—হে গৌরি হে গৌরি! আমার সৌভাগ্য দাও। যে আমার দ্বারে এসেছে, তাহার দীর্ঘ আয়ু দাও। তাহার পর, কন্যার পিতা পুরোহিতকে সঙ্গে করিয়া বর আহ্বান করিতে যান। পুরোহিত বরের ও তাহার পুরোহিতের হস্তে একটী একটী নারিকেল দিয়া কন্যার বাড়ীতে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। সন্ধ্যা কালে যাত্রার সময় বর, প্রথম শ্বশুর-প্রদত্ত নূতন পাগড়ী ও উত্তরীয় পরিধান করে, তাহার ভগিনী সেই সময় একছড়া ফুলের মালা ঐ পাগড়িতে জড়াইয়া দেয়। ঐ সময় পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করেন। বর, প্রথম ইষ্টদেব তৎপরে গুরুজনদিগকে

নমস্কার করিয়া বাহিরে আসিয়া অশ্বে আরোহণ করে। তখন তোপ ধ্বনি ও বাজনা বাজিতে থাকে। বরের সঙ্গে তাহার মাতা ভগিনী ও অন্যান্য রমণী এবং আত্মীয় কুটুম্বগণ গমন করেন। পথে অনিষ্ট নিবারণের জন্য নারিকেল বিতরণ করা হয়। বর, কন্যার বাটীতে পৌঁছিলে তাহার মস্তকে অন্ন স্পর্শ করাইয়া উহা দূরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। কন্যাপক্ষীয় কোন সধবা, এক গাড়ু জল আনিয়া বরের ঘোঁড়ার পায়ে ঢালিয়া দেন। বর, অশ্ব হইতে অবতরণ করিলে সধবা মহিলারা সম্মুখে আলো ধরিয়া বরণ করেন। তাহার পর, কন্যার ভ্রাতা, বরের ডান কাণ মলিয়া দেয়, সেই জন্য সে একটী পাগড়ি উপহার পায়। সেই সময় কন্যাকর্ত্তা, বরকে বিবাহমণ্ডপে আনিয়া যথারীতি মধুপর্ক প্রদান করেন। পুরোহিত ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া শুভকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের অনুমতি গ্রহণ করেন। একজন সধবা রমণী আসিয়া পুরোহিত, বর, কন্যা ও কন্যার পিতা মাতার কপালে চন্দন লেপন করে। ঐ সময় কৌলিক বিধি অনুসারে সম্প্রদান কার্য্য সম্পন্ন হইলে লগ্নকঙ্কণ, সভাপূজন, গৃহপ্রবেশ এবং বিবাহ-হোমের পর সপ্তপদী গমন হইয়া থাকে। স্ত্রী-আচার ও বর কন্যার আহারের পর কড়িখেলা হয়। এই সময় বরকে কন্যার পায়ে ধরিতে ও পরস্পর চুম্বন করিতে বলা হয়। তখন বরপক্ষীয়গণ কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া বাটীতে চলিয়া যায়। কন্যাপক্ষীয় রমণীগণ চাঙ্গারি ভরিয়া মিষ্টান্ন ও বরের শ্বশুর এবং শ্যালক একটী ঘোঁড়া সাজাইয়া লইয়া গিয়া তাহাদিগকে প্রলোভিত করিয়া ফিরাইয়া আনেন। তখন বরপক্ষীয় রমণীগণ ঠাণ্ডা হইয়া হাসিতে হাসিতে বরকে লইয়া কন্যার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হন। ভোজের পর, বাহিরে

পুরুষগণের মধ্যে ও অন্তঃপুরে রমণীমণ্ডলীর মধ্যে নানাপ্রকার হাঁসি তামাসা হয়। উহার নাম উথান। ঐ সময় বর ও কন্যা-পক্ষীয়েরা মরাঠী ভাষায় ছড়া কাটাকাটি করে। বরপক্ষীয়গণ অলঙ্কার দ্বারা নববধূর মুখ দেখেন। তাহার পর, কন্যার মাতা বরের মাতাকে ও অন্যান্য রমণীদিগকে যত্নপূর্ব্বক ডাকিয়া আনিয়া বাটীর পশ্চাতে কলাতলায় লইয়া গিয়া স্নান করাইয়া দেয়। সেখানে ছোট ছোট ঘণ্টা ঝোলান থাকে। স্নানের সময় দড়ি ধরিয়া টানিলে সেই সকল ঘণ্টা বাজিতে থাকে। বিবাহের দিন হইতে পাঁচদিন পর্য্যন্ত এই রূপ নানাবিধ আমোদ আহ্লাদে কাটিয়া যায়, পঞ্চম দিনে বর বিদায়। সুসজ্জিত বর ঘোঁড়ার চড়িয়া নবপরিণীতা পত্নীকে সম্মুখে বসাইয়া গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলে পুরনারীগণ বরণ করিয়া গৃহে লইয়া যায়। এই সময়ে কয়েকটী কৌলিক আচারের পর, বর পত্নীকে বলে "আমার ভগিনী আমার কন্যাটীকে চায়।" তখন বধূ প্রতিজ্ঞা করে "আমাদের সাতপুত্রের পরও কন্যা হইলে ননদের পুত্রের সহিত বিবাহ দিব।" তাহার পর, বধূর নূতন নাম হয়। যেমন বরের নাম "শঙ্কর" হইলে বধূর নাম "পার্ব্বতী" কিংবা, বরের নাম "নারায়ণ" হইলে বধূর নাম "লক্ষ্মী" রাখা হয়। বর, চুপে চুপে পত্নীর নূতন নামটী তাহাকে শুনাইয়া দেয়। ইঁহাদের সমাজে কন্যাবিক্রয় নিষিদ্ধ নহে। অনেকে ধনলোভে অশীতিবৎসর-বয়স্ক বৃদ্ধের হস্তে অষ্টমবর্ষীয়া বালিকা কন্যা অর্পণ করে। কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণদের মধ্যে যথারীতি গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন ও সাধভক্ষণ প্রভৃতি সংস্কার হইয়া থাকে। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে ইহারা তুলসীপত্রের উপর শয়ন

করাইয়া মুমূর্ষু ব্যক্তিকে বেদ ও ভগবদ্গীতা শুনাইয়া থাকেন। ইহাদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং শ্রাদ্ধাদি ও অনেকটা বিভিন্ন প্রকারে সম্পাদিত হয়।

কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণকুলে এত পরাক্রান্ত রাজনৈতিক ও বিদ্বান্ লোক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন যে, তাঁহাদের সংখ্যা করা যায় না। বালাজী বিশ্বনাথ ভট্ট, বাজীরাও পেশোয়া, বালাজী বাজীরাও, নানাফড়্নবীশ হইতে নানাসাহেব পর্য্যন্ত সকলেই কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণকুলসম্ভূত। মহারাজ সিন্ধিয়ার প্রধান মন্ত্রী সুপ্রসিদ্ধ সার্ রাজা দিনকর রাও, রাওবাহাদুর কেরোলক্ষ্মণ ছাত্রে, অধ্যাপক শাস্ত্রী নীলকণ্ঠ মগরকর, মহাদেব গোবিন্দশাস্ত্রী কলট্‌কার, রাওসাহেব বিশ্বনাথ নারায়ণ মাণ্ডলিক, রাওবাহাদুর গোপালরাও হরিদেশমুখ, বামন আবাজি মোড়ক, মহাদেববুরেশ্বর কুণ্টে, অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের অনুষ্ঠাতা কাশীনিবাসী বেদমূর্ত্তি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বালশাস্ত্রী, বেনারস-কলেজের জ্যোতিঃশাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত বাপূদেব শাস্ত্রী,* বোম্বাই হাইকোর্টের জজ্ সুপ্রসিদ্ধ

* বেনারস কলেজে অবস্থান কালে পূজ্যপাদ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ৺বাপূদেব শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। সেই ভক্তিভাজন অধ্যাপক-প্রবরের আশ্চর্য্য প্রতিভা, বাক্‌কৌশল ও সর্ব্বশাস্ত্রে বিশেষতঃ গণিত-বিদ্যায় পারদর্শিতার বিষয় স্মরণ করিলে তাঁহাকে দৈববল-সম্পন্ন মহাপুরুষ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার স্বর্ণোজ্জ্বল বর্ণ, বিরাট দেহ ও প্রসন্ন বদন চিরকালের জন্য স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া আছে। শাস্ত্রী মহাশয় ১৭৪০ শকে পুণানগরে জন্ম গ্রহণ করেন। আমরা ১৮০১—১৮০২ শকে তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করি। ১৮১৪ শকে তিনি কৈলাসবাসী হইয়াছেন।

মহাদেব গোবিন্দ-রাণাডে, বিখ্যাত কেশরী পত্রের সম্পাদক বাল-গঙ্গাধর তিলক, ভারত-গভর্ণমেণ্টের মন্ত্রিসভার সদস্য মিঃ গোখ্‌লে-প্রভৃতি মনীষিগণ সকলেই কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণসমাজ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ে সকল-শ্রেণীর লোকই দেখা যায়। মহামহোপাধ্যায় বেদজ্ঞ পণ্ডিত হইতে জ্যোতিঃশাস্ত্র ব্যবসায়ী পর্য্যন্ত যাহা চাও তাহাই পাইবে। জজ, উকীল, ব্যারিষ্টার, দেশীয়রাজমন্ত্রী, দেশমুখ, কারকুন, কৃষক, হোটেলওয়ালা, শূদ্রদের পাচক, জলবাহক প্রভৃতি কিছুরই অভাব নাই। বহুসংখ্যক কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ কেবল ভিক্ষাবৃত্তিদ্বারা দিনপাত করেন।

দেবরুখে ব্রাহ্মণ। কোঙ্কণপ্রদেশে দেবরুখে নামক একটী স্থান আছে, সেখানকার অধিবাসী ব্রাহ্মণেরা দেবরুখে নামে আখ্যাত। কথিত আছে ;—এক সময় দেবরুখের অধিবাসী ব্রাহ্মণেরা কোঙ্কণস্থব্রাহ্মণ-রমণীদের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াছিলেন; তাহাতে তাঁহারা সমাজচ্যুত হইয়া ভিন্ন শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছেন। বোধ হয় দেবরুখে ব্রাহ্মণেরা কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণ হইতেই বহিষ্কৃত, তজ্জন্য ইহাদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে কোঙ্কণস্থ-ব্রাহ্মণগণের অনুগামী দেখিতে পাওয়া যায়। দেবরুখে-ব্রাহ্মণদের অধিকাংশই ভিক্ষাজীবী, কেহ কেহ কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। এ সম্প্রদায়ে কোন বিদ্বান্ কিংবা ধনী লোকের নাম শুনা যায় না।

শেনুই-ব্রাহ্মণ। মহারাষ্ট্রে শেনুই নামে আর এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়। ইহারা আপনাদিগকে গৌড়ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন। কথিত আছে :—ইহারা বঙ্গদেশ হইতে মহারাষ্ট্রে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। শেনুই-ব্রাহ্মণেরা মৎস্য মাংস ভোজন করেন বলিয়া দেশস্থ ও কোঙ্কণস্থ-শ্রেণীর ব্রাহ্মণের নিকট অত্যন্ত

ঘৃণিত। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা বঙ্গদেশাগত ব্রাহ্মণদিগকে মৎস্য ভোজন করিতে দেখিয়া ইহারা শেণুই অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। অদ্যাপি ইহারা সেই ঘৃণাব্যঞ্জক শেণুই শব্দে অভিহিত হইয়া আসিতেছেন। শেণুই-ব্রাহ্মণের সহিত মহারাষ্ট্রের অন্যান্য ব্রাহ্মণের ভোজ্যান্নতা নাই। শেণুই-ব্রাহ্মণের মধ্যে ১৮টী গোত্র প্রচলিত যথা;—বাৎস্য, মৌদগল্য, কৌণ্ডিন্য, কৌশিক, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, আঙ্গিরস, নৈধ্রুব, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, শাণ্ডিল্য, ধনঞ্জয়, সাংখ্যায়ন, গর্গ, জামদগ্ন্য, অত্রি, কৌৎস, সাংখ্য, সিদ্ধি, গৌতম। পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে নাকি চারি বেদেরই চর্চ্চা ছিল, এখন সকলেই ঋগ্বেদী। ইহারা বাঙ্গালার উত্তর প্রদেশস্থ জাহ্নবী-তীর হইতে আগমনকালে হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তি আনয়ন করিয়াছিলেন, উহাই শেণুই-ব্রাহ্মণগণের কুলদেবতা। এই দেবমূর্ত্তি মঙ্গেশ নামে প্রসিদ্ধ। গোমন্তকের সন্নিহিত কব্‌ড়ে নামক স্থানে ইহাদের গুরুকুলের একটী মঠ আছে। উহার নাম কৈবল্য-মঠ। কথিত আছে;—পুরাকালে গৌড়পাদাচার্য্য কর্ত্তৃক নাকি উক্ত মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে শেণুই-ব্রাহ্মণেরা সকলেই শাক্ত ছিলেন, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে কতকগুলি ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত হন। নবদ্বীপের চৈতন্য মহাপ্রভুই নাকি মহারাষ্ট্রে ধর্ম্ম প্রচারকালে ইহাদিগকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। উক্ত কিম্বদন্তীটী নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। যদিও চৈতন্য মহাপ্রভুর চরিতাখ্যায়ক-গণের পরস্পর মতের মিল নাই। কিন্তু তিনি যে দক্ষিণাপথে গিয়াছিলেন, ইহা সকলেই বর্ণন করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে। চৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচল

(পুরী) হইতে কৃষ্ণদাস নামক এক ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইয়া গোদাবরী তীরস্থ বিদ্যানগর, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, রাজমহেন্দ্রী, মল্লিকার্জ্জুনতীর্থ, স্কন্দক্ষেত্র, গোমন্তক, শৃঙ্গগিরি, গোকর্ণ, গৌতমী গঙ্গার উৎপত্তিস্থান ব্রহ্মগিরি, দ্বারকা-প্রভৃতি দক্ষিণাপথের বহুস্থানে ভ্রমণ করেন এবং অনেক বৌদ্ধ ও শাক্ত ব্রাহ্মণকে বৈষ্ণব-ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। সম্ভবতঃ ঐ সময়ে শাক্ত ব্রাহ্মণগণের অনেকে বৈষ্ণব ধর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকিবেন। শেনুই-ব্রাহ্মণগণের অনেকে শাস্ত্রালোচনায় কালযাপন করেন, কেহ কেহ বা কারকুণ (কেরাণী) পহোজী (শিক্ষক) প্রভৃতির কার্য্য করেন। কুলকর্ণী এবং দেশপাণ্ডের কার্য্যেও অনেকে ব্রতী আছেন। পূর্ব্বে ইঁহাদের কেহ কেহ দেশীয় রাজার মন্ত্রিপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শেনুই-ব্রাহ্মণদের কাহারও কাহারও জায়গীর আছে। কেহ কেহ শুধু ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রের অন্যান্য ব্রাহ্মণের তুলনায় গৌড় বা শেনুই-ব্রাহ্মণের মধ্যে ভিক্ষুকের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। ইঁহারা প্রাণান্তেও কন্যা বিক্রয় করেন না; সামর্থ্য অনুসারে কথক, পৌরাণিক, বিদ্যার্থী, পণ্ডিত ও ভিক্ষুকের প্রার্থনা পূর্ণ করেন। পরোপকার ইঁহাদের জীবনের একটী ব্রত। এমন কি, অনেক সময় ইঁহারা ঋণ করিয়া দান করিয়া থাকেন। গৌড়-ব্রাহ্মণেরা যেমন স্বয়ং পরোপকারী, অন্যকর্ত্তৃক উপকৃত হইয়াও তদ্রূপ বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। ইঁহারা অল্পে সন্তুষ্ট, সুতরাং বিশেষ উন্নতি করিতে পারেন না। এত গুণ সত্ত্বেও শেনুই-ব্রাহ্মণেরা দোষের হস্ত হইতে মুক্ত নহেন। প্রধান দোষ, ইঁহারা বড়ই নিন্দুক-স্বভাব। অনেক সময় পরস্পর পরস্পরের কুৎসা লইয়া সময় অতি-

বাহিত করেন। যতই দোষ থাকুক না কেন, মহারাষ্ট্রে এই মুষ্টিমেয় গৌড় বা শেনুই-ব্রাহ্মণের অবস্থা মন্দ নহে। ইহাদের মধ্যেও বিদ্বান্ এবং খ্যাতনামা লোকের অভাব নাই। বেলগাঁএর লক্ষ্মণভট্ট উপাধ্যায়, কর্ণাটকের বেদমূর্ত্তি নারায়ণভট্ট, এবং লক্ষ্মণভট্ট পাণ্ডিত্যের জন্ত বিশেষ প্রসিদ্ধ। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি কাশীনাথ এম্বকতেলাঙ এবং সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিৎ বোম্বাই-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চেন্‌সেলার ডাক্তার-গোপালকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর ও শেনুই-ব্রাহ্মণকুল অলঙ্কৃত করিয়াছেন। শেষোক্ত মহাত্মা পুণা ডেকান্‌কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপকের পদে অবস্থানকালে দক্ষিণাপথের যে সুবিস্তৃত ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন, উহা য়ুরোপীয় ও দেশীয় ঐতিহাসিকগণের উপজীব্য গ্রন্থরূপে পরিণত হইয়াছে।

সারস্বত-ব্রাহ্মণ। মহারাষ্ট্রের সারস্বত-ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে এই প্রবাদ আছে যে, পুরাকালে জমদগ্নির পুত্র ভগবান্ পরশুরাম ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল করিয়া সমস্ত পৃথিবী ব্রাহ্মণগণকে দান করেন। যে সকল স্থান প্রদত্ত হইয়া ছিল, উহাতে বাস করা অনুচিত বিবেচনা করিয়া তিনি সহ্যাদ্রির পশ্চিম ভাগে উপস্থিত হন। ঐ প্রদেশের নাম কোঙ্কণ, উহা পরশুরাম-ক্ষেত্র বলিয়া পরিচিত। কিছুকাল পরে পরশুরাম একটী বৃহৎ যজ্ঞ আরম্ভ করেন। ঐ মহাযজ্ঞ গোমন্তকের (গোয়ার) সন্নিহিত হারমল নামক স্থানে সমাহিত হইয়াছিল। যজ্ঞাবসানে পরশুরাম নিমন্ত্রিত সারস্বত-ব্রাহ্মণদিগকে বাসোপযোগি স্থান প্রদান করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কিন্তু দুই চারিজন ব্যতীত কোন ব্রাহ্মণই অনার্য্য-সঙ্কুল সুদূর প্রদেশে বাস করিতে সম্মত হইলেন না। যাঁহারা বাস

করিতে স্বীকার করিলেন, পরশুরাম তাঁহাদিগকে আটখানি গ্রাম দান করেন। সারস্বত-ব্রাহ্মণগণ সপরিবারে নিমন্ত্রণে আসেন নাই, সুতরাং একাকী কি প্রকারে বাস করিবেন বলিয়া মহাচিন্তিত হইলেন। শেষে নাগর-জাতীয়া এবং অনায়াস-লভ্যা দ্রাবিড়ী নিতম্বিনীদিগকে গৃহলক্ষ্মী করিয়া গৃহিণীর অভাবপূর্ণ করিতে হইল। দ্রাবিড়ী-মহিলার গর্ভে সারস্বত-ব্রাহ্মণদিগের যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহারাই বর্ত্তমান সারস্বত-ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ। সারস্বত-ব্রাহ্মণগণ বহুকাল গোমন্তকে পরমসুখে কালাতিপাত করেন। তাহার পর ১৪৩২ শকে পর্ত্তুগিজ্ জাতি গোমন্তক (গোয়া) প্রদেশ আক্রমণ করে এবং কিছু কাল যুদ্ধের পর তাহারা উক্ত প্রদেশ অধিকার করে। তাহাদের আচার ব্যবহার ও বেশভূষা দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা ভীত হইলেন। এদিকে পর্ত্তুগিজ্ গণ হিন্দুদিগকে নিজধর্ম্মে আনয়নের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল এবং এই উপলক্ষে নানাপ্রকার অত্যাচার হইতে লাগিল। সারস্বত-ব্রাহ্মণগণ পর্ত্তুগিজ্ দিগের পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া চারিদিকে পলায়ন করিলেন। ব্রাহ্মণগণের পলায়নে দেশ শ্রীভ্রষ্ট হইল। তখন পর্ত্তুগিজেরা ঘোষণা করিল, তাহারা আর কাহার ও ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবে না এবং প্রজারা যাহাতে সুখে থাকে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইবে। ঐ ঘোষণা বাক্য শ্রুত হইয়া যে সকল ব্রাহ্মণ অপেক্ষাকৃত নিকটে ছিলেন, তাঁহারা ফিরিয়া আসিলেন, যাঁহারা দূরে গিয়াছিলেন তাঁহারা আর ফিরিলেন না। গোমন্তকে (গোয়ায়) প্রধান আবাস হইলেও এখন সারস্বত-ব্রাহ্মণেরা নানাপ্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন। বোম্বাই, রত্নগিরি, মালবন, শান্তবাড়ী, উত্তর-কানাড়া, দক্ষিণকানাড়া, মালাবার, বেলগাঁও, ধারোয়ার, হায়দরা-

বাদ, ইন্দোর, বড়োদা-প্রভৃতি স্থানে অল্প বিস্তর সারস্বত-ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই-প্রদেশে সারস্বত-ব্রাহ্মণের সংখ্যা লক্ষাধিক। এই শ্রেণীতে শাস্ত্রজ্ঞ, চাকুরে, ভিক্ষাজীবী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকই বিদ্যমান।

কিরো-অন্ত ব্রাহ্মণ। মহারাষ্ট্রে—'কিরোঅন্ত'—নামে একশ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা যায়, ইহারা সারস্বত-ব্রাহ্মণের শাখা। পূর্ব্বে সারস্বত-ব্রাহ্মণগণ শূদ্রের পৌরহিত্য করিতেন না। যাঁহারা প্রথম ঐরূপ শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ঘৃণিত এবং কিরো-অন্ত আখ্যা প্রাপ্ত হন। কিরোঅন্ত শব্দ ক্রিয়াবন্ত শব্দের অপভ্রংশ অর্থাৎ যাঁহারা শূদ্রের যাজনক্রিয়া করাইয়া থাকেন। এই সকল ব্রাহ্মণের অধিকাংশ অতিদীনভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। অনেকে শূদ্রের যাজনক্রিয়াও কেহ কেহ দিন ক্ষণ নির্ণয় এবং ঠিকুজী কোষ্ঠী লিখিয়া জীবিকা অর্জ্জন করেন। পূর্ব্বে ইহারা মহারাষ্ট্রের অন্যান্য ব্রাহ্মণের নিকট ঘৃণার পাত্র ছিলেন কিন্তু এখন সে ভাব অনেকটা তিরোহিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে কোঙ্কণস্থ ও কহ্লাড় ব্রাহ্মণ-বালক-সকল কিরোঅন্ত ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক দত্তকরূপে গৃহীত হওয়ায় ইহাদের মধ্যে সদ্ভাবের সঞ্চার হইতেছে। এই শ্রেণীতে বিখ্যাত লোক অতি অল্পই আছেন।

মহারাষ্ট্রে কনোজিয়া, সাগরদ্বীপী, রামানুজ, মারোয়ারী, তৈলঙ্গী, গুজরাটী প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ পরদেশী ব্রাহ্মণ নামে প্রসিদ্ধ। গোবর্দ্ধন, ত্রিশুল, বিদুর প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ পৌনর্ভব-ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত। আভীর, জাবল-প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ হীনশ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত। মহারাষ্ট্রে উল্লিখিত ব্রাহ্মণগণের উচ্চ নীচ কোন শ্রেণীই ব্রাহ্মণেতর জাতির বাটীতে আহার করেন না, এমন কি

ফলাহার পর্য্যন্ত নয়। কিন্তু বাঙ্গালাদেশে যেমন শূদ্রজাতির অন্তর্গত কয়েকটী বর্ণের যাজনের নিমিত্ত কতিপয় বর্ণযাজী ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়, মহারাষ্ট্রে তাহা নাই। এদেশে যে শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ, সে উচ্চ নিম্ন সর্ব্ববিধ শূদ্রজাতিরই যাজন কার্য্য সম্পন্ন করে কিন্তু কাহারই বাটীতে আহার করে না। মহারাষ্ট্রে সামাজিক ভোজন ব্যতীত অন্য সময় ব্রাহ্মণ হইতে চণ্ডাল পর্য্যন্ত ছত্রিশ জাতি এক গৃহে ভিন্ন ভিন্ন পংক্তিতে আহার করিয়া থাকে। এদেশে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে আচার ব্যবহার বিষয়ে এতদূর তারতম্য যে দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মহারাষ্ট্রের শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ যেমন শুদ্ধাচার, শূদ্রগণ তেমন অনাচার-সম্পন্ন। পণ্ডিতেরা রজক দ্বারা বস্ত্র ধৌত করান না, প্রত্যহ স্বয়ং কাচিয়া লন। তৈল ও মৎস্য মাংস ব্যবহার করেন না এবং অধিকাংশ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত সন্ধ্যা বন্দনা বেদপাঠ নিত্যহোমে দিবসের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করেন। ইহারা নিরীহ এবং যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট।

মহারাষ্ট্রের স্থানে স্থানে চোহান ও রাঠোর বংশসম্ভূত রাজপুত দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অধিক নহে, মরাঠীরাই এখন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্থান অধিকার করিতে উদ্যত কিন্তু মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ অদ্যাপি ঐ সকল বর্ণের গৃহে বেদোক্ত প্রণালীতে মন্ত্র পড়াইতে সম্পূর্ণ সম্মত হন নাই, অধিকাংশ স্থলে পুরাণোক্ত পদ্ধতি অনুসারে বৈধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর বংশধর কোহ্লাপুরের রাজবংশ, নাগপুরের ভোস্লেগণ, বড়োদার গায়কবাড়, মরাঠা-জাতিসম্ভূত। মহারাষ্ট্রেও কায়স্থ-জাতির অবস্থা বেশ উন্নত। শিক্ষায় কায়স্থেরা মরাঠীদের অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। এদেশে কায়স্থকে পরভু বলে। পরভুরা

কতিপয় শ্রেণীতে বিভক্ত। মহারাজ শিবাজীর সময় হইতেই পরভুরা রাজনৈতিক বিভাগে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এখনও অনেক শিক্ষিত পরভুকে দেশীয় রাজ্যে ও ইংরেজ-রাজ্যের প্রায় সকল বিভাগেই উচ্চ উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। এদেশে নরশাকের ও অন্যান্য বর্ণের অবস্থাও নিতান্ত মন্দ নহে।

দশম পরিচ্ছেদ।

বম্বে প্রত্যাগমন।

১১ই জ্যৈষ্ঠ আহারান্তে যাঁহাদের যত্নে পুণা নগরীতে সুখে অবস্থিতি করিয়াছিলাম, সেই ছাত্রবন্ধুদের নিকট বিদায় লইয়া পূর্ব্বাহ্ন ১১টার সময় ষ্টেসন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। গিয়া দেখি, বেদশাস্ত্রোত্তেজক-সভায় যাঁহাদের সহিত পরীক্ষা দিয়াছিলাম, তাঁহাদের অনেকে গাড়ীর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। আমাকে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহারা আহ্লাদ সহকারে আসিয়া আমার সহিত সমবেত হইলেন। গাড়ী আসিলে সকলে প্রফুল্লচিত্তে আরোহণ করিলাম। চন্দ্রবাবুর উপদেশানুসারে গন্তব্যপথের নির্ম্মাণ-কৌশল ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনের নিমিত্ত গবাক্ষ-সন্নিধানে উৎসুকচিত্তে বসিয়া রহিলাম। নগরের অনতিদূরবর্ত্তী কতিপয় সদ্যঃ-কর্ষিত ভূখণ্ড অতিক্রম করিলেই বম্বের গবর্ণরের প্রাসাদ দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার পর, কোন শৈলমালার অধিত্যকায় একটী মন্দির দেখা গেল। সঙ্গী বিদ্যার্থি-

গণ বলিলেন "ঐ মন্দিরে মহারাজ শিবাজীর প্রতিষ্ঠিত চতুঃশৃঙ্গীদেবী বিরাজিত আছেন"। কিয়দ্দূর গিয়া লোনাবলী ষ্টেসন পাওয়া গেল। স্থানটী বড়ই স্বাস্থ্যপ্রদ। ষ্টেসনের উভয় পার্শ্বে অদ্রি-গাত্রে কতিপয় সুন্দর বাঙ্গলো ও মনোহর পুষ্পোদ্যান বিরাজিত হইয়া ঐ স্থানের দৃশ্যকে অত্যন্ত নয়ন-প্রীতিকর করিয়া রাখিয়াছে। অনুমান অপরাহ্ণ দুইটার সময় গাড়ী খাণ্ডাবারা ষ্টেসনে উপনীত হইল। উক্ত স্থান হইতে পলাশদড়ী ষ্টেশন পর্য্যন্ত সহ্যপর্ব্বতের গাত্র দিয়া অদ্ভুত প্রণালীতে রেলপথ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। সর্পের ন্যায় বক্রগতিতে বাষ্পশকট কখন শৈলশ্রেণীর অধিত্যকায়, কখনও উপত্যকা-প্রদেশে ভ্রমণ করিতে লাগিল। কিছু দূর অগ্রসর হইলে শকটমালার অগ্রে ও পশ্চাতে ইঞ্জিন্ জুড়িয়া দেওয়ায় ক্ষণকাল-মধ্যে উহা পর্ব্বতের চূড়ায় উপনীত হইল। তখন শকট হইতে শৈলনিতম্ববাহিনী স্রোতস্বিনীকে একগাছী সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় ও উপত্যকাস্থ পথিক-গণকে ক্ষুদ্র পিপীলিকাসদৃশ বোধ হইতে লাগিল। আবার শকটমালার গতি পরিবর্ত্তিত হইল। এবার নামিতে নামিতে যেন রসাতল অভিমুখে ধাবিত হইল। এই রূপ আরোহণ ও অবরোহণে* অনেক সময় অতীত হইল। ইহার মধ্যে ২৪টী বিভিন্ন স্থানে পর্ব্বতমালা ভেদ করিয়া রন্ধ্রপথ (Tunnel) নির্ম্মিত হইয়াছে। কোথায় রন্ধ্রস্থিত রেলপথ অর্দ্ধ মাইল, কোন স্থানে বা সিকি মাইল, উহার ন্যূন প্রায় নাই। উক্ত সমুদয় রন্ধ্রপথই চারিটী তারবিশিষ্ট (dauble line) সুতরাং যুগপৎ বিভিন্নদিগ্গামী শকটনিচয়ের গমনাগমনে কোনই প্রতিবন্ধক ঘটে না। যাইতে যাইতে বাষ্প-শকট একটী তিমিরাচ্ছন্ন পর্ব্বততল-খোদিত পথে (Tunnel)

* আরোহণ অবরোহণ—চড়াই উৎরাই।

প্রবেশ করিল। ঠিক ঐ সময় বিপরীত দিক্ হইতে একখানি ধাবমান বাষ্পশকট, ভীষণ শব্দে আমাদের দিকে আসিতে ছিল। যখন উভয় শকট পাশাপাশি চলিতে লাগিল, তখন অন্ধকারে কিছুই নেত্রগোচর হইল না, কেবল গভীর গর্জ্জন শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইয়া হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার করিতে লাগিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে ঐ ভীমরব আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। কিছুদূর গেলেই পর্ব্বতমালার পার্শ্বে বহুদূর-ব্যাপী একটী হ্রদের তীরদেশে শুভ্র শুভ্র অট্টালিকা ও উদ্যান-পরিশোভিত প্রসিদ্ধ কল্যাণনগর নয়নপথে উপস্থিত হইল।

কল্যাণনগর অতিপ্রাচীন। খ্রীষ্টীয় ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর উৎকীর্ণ শিলালিপিতেও ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। একখানি পুরাকালের রচিত সংস্কৃত গ্রন্থে কর্ব্বেতীনগরের মকরাজবংশীয় রাজগণের বংশ-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে;—তোন্দমান চক্রবর্ত্তীর বংশধর ধনঞ্জয়-চোলনামক জনৈক চোলরাজপুত্র হইতে এই রাজবংশের উৎপত্তি হইয়াছিল। এই ধনঞ্জয়-চোলের বংশে নারায়ণরাজ নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই এই কল্যাণপত্তন বা কল্যাণ নগরের স্থাপয়িতা। বিহ্লন কবির "বিক্রমাঙ্ক-চরিত" পাঠে অবগত হওয়া যায়, দক্ষিণাপথের চালুক্য-রাজবংশে বিক্রমাদিত্য-ত্রিভুবন-মল্লদেব নামে একজন পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল, ৯৮৭ শকাব্দ হইতে ১০৪৮ শকাব্দ পর্য্যন্ত। এই বিক্রমাদিত্যের পিতা আহবমল্ল দ্বিতীয় বার এই কল্যাণনগরী নির্ম্মাণ করেন। হিন্দু ও মুসলমান-বংশীয় অনেক রাজা ও রাজবংশ কল্যাণ নগরে রাজ্য করিয়া লয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। এখন ইহা বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত টানাজেলার একটী

উপবিভাগের প্রধান নগর। প্রাচীনকাল হইতেই কল্যাণনগর বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। মধ্যে কিছু কালের জন্য ইহা হীন-দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল। অধুনা ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন হইয়া ক্রমে ক্রমে এই নগরী পুনরায় পূর্ব্ব-গৌরব লাভ করিতেছে। কল্যাণ নগরের সমীপবর্ত্তী নারায়ণ-নদের বক্ষে অনেক নৌকা ও দুই চারি খানি সুন্দর ক্ষুদ্রপোত দেখিলাম। কল্যাণজংসন অতিক্রম করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলেই টানা-সহর পাওয়া গেল। টানা জেলার প্রধান নগরী। এখানে দেওয়ানি ও ফৌজদারী কোর্ট আছে। এখানকার লবণক্ষেত্র একটী দ্রষ্টব্য পদার্থ। দূর হইতে শ্রেণীবদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লবণস্তূপগুলি দেখিতে বেশ মনোহর। এইরূপ অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে দেখিতে অপরাহ্ন ৫টার সময় বোম্বাই-নগরে উপনীত হইলাম। অল্পক্ষণ বিশ্রামের পর ভ্রমণের নিমিত্ত সমুদ্রতীরে চলিলাম। সমুদ্রতীরের অনেক দূর পর্য্যন্ত বিচরণ করিয়া জল-সন্নিহিত একখানি উপলখণ্ডে বসিয়া সায়ং-সন্ধ্যায় প্রবৃত্ত হইলাম। প্রশান্ত জলধির বিজন তটে অনন্যমনে ভগবচ্চিন্তায় মন সরস ও পবিত্র হয়। কিছুক্ষণ পাষাণখণ্ড-প্রহৃত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিমালার জলকণ-সংসর্গী সুশীতল সমীরণ সেবা করিয়া রাত্রি আট ঘটিকার সময় বাসায় ফিরিলাম।

মহালক্ষ্মী। ১৪ই জ্যৈষ্ঠ প্রাতঃকালে ৭॥টার মধ্যে প্রাতঃকৃত্য স্নান সন্ধ্যা শেষ করিলাম। আজ মহালক্ষ্মী গমনের মানস। বম্বে-নগরীর প্রত্যেক পল্লীতে পল্লীতে রেল-ষ্টেসন। বাসার নিকটস্থ ষ্টেসন হইতে ৵১৫ তিন পয়সার টিকিট ক্রয় করিয়া পূর্ব্বাহ্ন ৮টার সময় মহালক্ষ্মী ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। ষ্টেসন হইতে মহালক্ষ্মীর মন্দির

প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। রঙ্গিন বসন ও নানাবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত রমণীগণ দুই একটী পুরুষের সহিত শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রান্তর অতিক্রমপূর্ব্বক মন্দির অভিমুখে ছুটিতেছে। আমরাও সেই সঙ্গে দ্রুতপদে মন্দিরে উপনীত হইলাম। উর্ম্মিমালা-বিভূষিত মহালক্ষ্মীর মন্দিরের মধ্যভাগও সোপান-সকল মর্ম্মর-পাষাণে নির্ম্মিত এবং উহার গাত্রস্থ কারুকার্য্য ও বেশ দৃষ্টিরম্য। মন্দিরের মধ্যভাগে চতুর্ভুজা মহালক্ষ্মী উপবিষ্টা। চতুর্দ্দিকে অন্যান্য কতিপয় দেবমূর্ত্তি বিরাজমান। মন্দিরের মধ্যে ও বারান্দায় কয়েকটী ব্রাহ্মণ চণ্ডীপাঠ করিতেছেন। বারাণ্ডার উত্তর পার্শ্বে কতকগুলি গৌরাঙ্গী ব্রাহ্মণ-মহিলা ভক্তি-ভাবে মহালক্ষ্মীর স্তোত্র পাঠে নিরত আছেন। সঙ্গী দুইটী মহারাষ্ট্রীয়-ব্রাহ্মণ ও আমি পূজোপকরণ ক্রয় করিয়া যথাশক্তি পূজা স্তব, প্রদক্ষিণ ও প্রণামাদি শেষ করিলাম। মহালক্ষ্মীর সেবক ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন "মহালক্ষ্মী অতি পুরাকালের দেবী। বম্বে-নগরীর সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে এই দেবী বম্বে নগরীতে বিরাজিত আছেন। কিন্তু বর্ত্তমান মন্দির অধিক পুরাতন নহে। কিছুকাল পূর্ব্বে ইহা বম্বের কোন ধনী বণিকের অর্থে নির্ম্মিত হইয়াছে"।

শৈশব হইতেই সমুদ্র-দর্শনের স্পৃহা বলবতী। বম্বে নগরীতে প্রথম সমুদ্র দর্শন হইয়াছে এবং উহাতে অবগাহনও করিয়াছি কিন্তু কালিদাসের কবিতা পাঠ করিয়া সমুদ্রের যেরূপ ছবি কল্পনা করিয়াছিলাম, তাহা না দেখিয়া মন নিতান্ত অতৃপ্ত ছিল। মহালক্ষ্মীতে আসিয়া সে বাসনা পূর্ণ হইল। মহার্ণবের প্রকৃত মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। মহালক্ষ্মীর মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে উর্ম্মি-প্রহত শিলাখণ্ডে উপবেশন করিয়া

আরব-সাগরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই প্রথমে উপলখণ্ড-ব্যাপ্ত বেলাভূমি একটী কৃষ্ণবর্ণ রেখার ন্যায় প্রতীয়মান হইল। বামভাগে তাল ও খর্জ্জুর-বন-বিশোভিত শৈলশ্রেণী ও দক্ষিণে নারিকেল-তরুরাজি-বিরাজিত তীরদেশে নয়নপাত করিলেই সেই রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গের বর্ণনা * স্মৃতিপথে উপস্থিত হইল। সম্মুখে উত্তালতরঙ্গসঙ্কুল মহার্ণবের গভীর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া মন বিস্ময়-সাগরে ডুবিয়া গেল। যতদূর দৃষ্টি যায়, কেবল অনন্ত-নীলাম্বুরাশির উপরিভাগে তরঙ্গের উপর গগনস্পর্শিনী তরঙ্গমালা নৃত্য করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছে। এক এক বার সেই বিক্ষুব্ধ মহার্ণবের বীচিমালা যখন গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে আমাদের দিকে আসিতে লাগিল, তখন মনে হইল বুঝি, এই বার সমস্ত বম্বেদ্বীপ অর্ণবসাৎ হইবে কিন্তু সমুদ্রের কার্য্য কেমন সীমাবদ্ধ। ঐ সকল তরঙ্গমালা ক্রমশঃ ক্ষীণ অপেক্ষা ক্ষীণতর আকার ধারণপূর্ব্বক আমাদের পদলগ্ন পাষাণখণ্ডে প্রহত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযানগুলি দূর হইতে এত ছোট দেখাইতে লাগিল যে, বোধ হইল যেন ক্ষুদ্রকায় পারাবত-সমূহ দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছে। তীর হইতে অনতিদূরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিশুমার ও অন্যান্য জল-জন্তু নাসিকা দ্বারা জল উৎক্ষিপ্ত করিয়া সলিলে বিলীন হইতেছে। কোথাও বা নক্রমকরাদি বৃহৎকায় জলচরগণ কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় তরঙ্গের উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে। অনেক ক্ষণ অর্ণবতীরে বসিয়া সমুদ্রের শোভা নিরীক্ষণ করিলাম। এক একবার মনে হইতে লাগিল

"দূরাদয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী
তমালতালীবনরাজিনীলা।
আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
র্ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা।"॥

দৃষ্টি স্থির করিয়া মহার্ণবের শেষ সীমা পর্য্যন্ত দেখিয়া লই কিন্তু যেই নয়ন প্রসারিত করি, অমনি চক্রবালরেখা (Horizon) সম্মুখে আপতিত হওয়ায় দৃষ্টির বিষয় আচ্ছন্ন হইয়া যায়। প্রাচীন পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন ;—দেশ-ভ্রমণে চাতুর্য্য-শিক্ষা হয় * কিন্তু চতুরতা শিক্ষা যত হউক বা না হউক, অনন্ত-শোভাময়ী প্রকৃতির বিবিধ বৈচিত্র্য প্রত্যক্ষ করিয়া হৃদয়ে যে অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভূত হয়, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক। মহার্ণবের শোভা নয়নগোচর করিয়া যে অনুপম পরিতোষ লাভ করিলাম, দুঃখের বিষয় এমন ভাষা খুঁজিয়া পাই না, যাহা দ্বারা সেই সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিব। প্রকৃত পক্ষে বারিধির সুষমা দর্শনীয় বটে কিন্তু বর্ণনীয় নহে।

আমরা কেবল সমুদ্রতীর হইতে উঠিয়াছি, এমন সময় এক অশীতিপর বৃদ্ধ সমুদ্র জলে অবগাহন করিয়া উত্থিত হইলেন। পরিধেয় কৌপীন ব্যতীত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অনাবৃত। দেহ গৌর এবং ঈষৎ স্থূল। মুণ্ডিত মস্তকে অঙ্কুরিত শুভ্র কেশগুলি প্রস্ফুটিত কদম্ব-কুসুমের আকার ধারণ করিয়াছে। তিনি যখন কমণ্ডলু হস্তে করিয়া প্রসন্ন-বদনে যাইতেছিলেন, তখন সকলেই তাঁহাকে পরমহংসজী বলিয়া প্রণাম করিতে ছিল। আমি "ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া প্রণিপাত করিলে, তিনি নারায়ণ স্মরণপূর্ব্বক আমার সহিত আলাপ করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন। আমি সংস্কৃত-ভাষায় ধর্ম্ম-সম্বন্ধে দুই একটী প্রশ্ন করিলে তিনি উহার

---

* "দেশাটনং পণ্ডিত-মিত্রতা চ,
বারাঙ্গনা-রাজসভা-প্রবেশো।
অনেকশাস্ত্রাণি বিলোকিতানি,
চাতুর্য্য-মূলানি ভবন্তি পঞ্চ॥"

উত্তর প্রদানপূর্ব্বক যদৃচ্ছাক্রমে ভগবদ্‌গীতার একটী শ্লোক পাঠ করিলেন এবং স্বয়ংই উহার মর্ম্ম বিশদ-ভাবে বুঝাইয়া দিলেন। ধর্ম্মকথা অনেক শুনা যায় কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিকের মুখ হইতে নির্গত না হইলে উহার যথার্থ মাধুর্য্য অনুভব করা যায় না। পরমহংস গীতার যে শ্লোকটীর ব্যাখ্যা করিলেন, পাঠাবস্থা হইতে উহার সহিত পরিচয় আছে। তথাপি শ্লোকটী যে শুধু নূতন বোধ হইল, তাহা নহে, উহার মর্ম্ম হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া গেল। শিষ্টাচার-বিরুদ্ধ হইলেও আমি কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া পরমহংসের জন্ম-ভূমি ও নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। যোগিবর হাঁসিতে হাঁসিতে বলিলেন "যে, নাম রূপ ত্যাগ করিয়াছে, তাহার আর সে বিষয়ে প্রশ্ন কেন? আমাকে একটী বিশেষণ-বিহীন পদার্থ বলিয়া জান"। আমি ঐ বাক্যটীর বিষয় চিন্তা করিতেছি, এই অবসরে পরমহংস সহসা অন্তর্হিত হইলেন। আমি চারিদিকে নিরীক্ষণ করিয়া কোথায়ও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না।

মহালক্ষ্মীর মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া রাজপথ। পথের পার্শ্বে মধ্যে মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ড পতিত আছে। সঙ্গী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণটীর সহিত আমি উহার একখানি শিলাখণ্ডে উপবেশন করিব মনে করিতেছি, এমন সময় একটী প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলা দুই তিনটী নারিকেল হস্তে সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তাঁহার স্বর্ণো-জ্জ্বলবর্ণ, অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন-সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে হইল, ইনি কোন রাজবংশের কন্যা অথবা বধূ হইবেন। তাঁহার পশ্চাতে, মস্তকে কেশ ভার, লম্বমান-শ্মশ্রু, ললাটে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র, যজ্ঞসূত্র গলে, কাষ্ঠপাদুকা পায়ে এক শ্যামতনু দীর্ঘকায় পুরুষ সেখানে আগমন করিলেন। ঐ বৃদ্ধই রমণীর স্বামী। তাঁহাদের প্রকৃত পরিচয়

অবগত হওয়া গেল না। কথা-প্রসঙ্গে এইমাত্র জানিলাম—বৃদ্ধ পঞ্জাবী ক্ষত্রিয়, গৃহিণীর সন্তানাদি হয় নাই। প্রায় তিনমাস হইল তীর্থ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন। দ্বারকা ও সেতুবন্ধ-রামেশ্বর সন্দর্শন হইয়াছে। সংপ্রতি পঞ্চবটী, অবন্তী ও ওঙ্কারেশ্বরে যাইবেন মানস করিয়াছেন। বৃদ্ধ, দুইটী ভৃত্য সহ সমুদ্রে অবতরণ করিলেন। গৃহিণী আমাদের সন্নিহিত এক পাষাণখণ্ডে উপবেশন করিলেন এবং নারিকেল ভাঙ্গিয়া মিষ্টান্ন সহ আমাদের হস্তে প্রদান করিলেন। সেই উদারহৃদয়া মহিলার "ভাইয়া" সম্বোধনটী বড় মধুর বোধ হইল। আমাদের জলযোগের প্রকৃত অবসর অথবা স্থান না হইলেও আমরা উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিলাম না। তিনি নারিকেলকে "শ্রীফল" নামে অভিহিত করিলেন। আমরা তাঁহার প্রদত্ত শ্রীফলখণ্ড ও কলাকন্ (সন্দেশ) গ্রহণ করিয়া তাঁহার অনুরোধে সেখানেই উহার সদ্ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলাম! ঐ রমণীও আমাদের সঙ্গে নারিকেল ও মিষ্টান্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদেশে সঙ্গিনী অপর একটী মহিলা আমাদের নিমিত্ত উত্তম পানীয় জল আনয়ন করিলেন। ঐ ভদ্রমহিলাটী অনেক ক্ষণ পূর্ব্বোক্ত মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণের ও আমার সহিত হিন্দীভাষায় ধর্ম্মকথার আলোচনা করিলেন। তাঁহার বিমল প্রকৃতি, প্রসন্ন বদন ও মৃদুমধুর বাক্য যথার্থই প্রীতিদায়ক। আমরা তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সদয় ব্যবহারে অত্যন্ত মোহিত হইলাম। এই শ্রেণীর ধর্ম্মপরায়ণা মহিলারাই নারীকুলের গৌরব-স্থল। ইহারা স্বকীয় পবিত্র ব্যবহার দ্বারা পৃথিবীতে স্বর্গীয় আদর্শ প্রদর্শন করেন। তাহার পর, আমরা গাত্রোত্থান করিলাম। কিছু দূর আসিয়া ঐ রমণী আমাদিগকে অভিবাদন করিয়া সঙ্গিনীও

পরিচারিকা সহ একটী বড় বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পথে আসিবার কালে মহারাষ্ট্রীয় বন্ধু বলিলেন "সামান্য গৃহস্থবধূর এরূপ নির্ভীক ভাব সম্ভবপর নহে। কত সময় কত দেশের কত রাজা রাণী, ছদ্মবেশে তীর্থ ভ্রমণে আসিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ ইনি সেই রূপ কোন রাজবধূ হইবেন। আমি বলিলাম "অসম্ভব কি? উঁহার স্বামীর শ্মশ্রু-বিরাজিত মুখ হইলেও একজন বীর পুরুষের ন্যায় আকৃতি, সঙ্গে দাস দাসীও নিতান্ত অল্প নহে। অতএব কোন রাজা অথবা ভূম্যধিকারী যে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই"।

ভিকেটারিয়া-উদ্যান। বাসায় আসিতে প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল। আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া পুনরায় দুইটার সময় নগর ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। রৌদ্রের প্রখরতা তখনও পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান। রাজপথের উভয় পার্শ্বে নানা দ্রব্যে সজ্জিত মনোহর-বিপণি সকল দেখিতে দেখিতে ভিক্টোরিয়া-উদ্যানের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। এই উদ্যানের মধ্যে একটী কৌতুকাগার (Muslum) আছে। প্রথমেই প্রাসাদ-মধ্যস্থ মহারাণী ভিকেটারিয়ার মর্ম্মর-প্রস্তরময়ী মূর্ত্তির প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। বড়োদার ভূতপূর্ব্ব নৃপতি খণ্ডেরাও গায়কবাড়ের প্রযত্নে এই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার কারুকার্য্য অতিমনোহর। নির্ম্মাণব্যয় ১৮০০০০ টাকা। কলিকাতার চিত্রশালিকায় (মিউজিয়মে) যে সকল মৃত জন্তুও সামুদ্রিক-প্রাণীর কঙ্কাল দৃষ্ট হয়, এখানেও সে সমুদয় বিদ্যমান। বিশেষত্বের মধ্যে এখানকার তিমিমৎস্যের কঙ্কাল সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানেও এক দিকে নানাবিধ মৃন্ময় ও ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য বিরাজিত। অপর পার্শ্বে নীল পীত

লোহিত প্রভৃতি নানাবর্ণের উপল-খণ্ড শোভা পাইতেছে। দেশীয় শিল্পিগণের নির্ম্মিত বালক বালিকার প্রতিকৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। ছবিগুলি যেন জীবন্ত হাস্য করিতেছে। হস্তী বৃষ মূষিক প্রভৃতি জন্তুর মূর্ত্তিগুলিও শিক্ষা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। উদ্যানের পূর্ব্বাংশে প্রাণি-বাটিকা। ঐ অংশে বানর ব্যাঘ্র ভল্লুক সর্প প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ স্বভাবসিদ্ধ বলবিক্রম পরিহারপূর্ব্বক উদ্যানরক্ষী-দের প্রসাদাকাঙ্ক্ষী হইয়া দিন যাপন করিতেছে। বিহঙ্গনিকেতনে নানাবর্ণের পাখী অশ্রুতপূর্ব্ব স্বর শুনাইয়া দর্শকগণের কৌতূহল উৎপাদনে ব্যগ্র। বানরের অপূর্ব্ব চাতুর্য্য সন্দর্শনপূর্ব্বক পুষ্পো-দ্যান ঘুরিয়া অতিশ্রান্ত-দেহে একটী উৎসের (ফোয়ারার) নিকটবর্ত্তী হইলাম। দর্শক নরনারীগণ উহার চতুর্দ্দিকে দাঁড়াইয়া দারুণ নিদাঘে শৈত্যসুখ অনুভব করিতেছে। কিছুক্ষণ ঐ স্থানে বিশ্রাম করিয়া উদ্যান হইতে বাহির হইলাম।

বম্বের "প্রাণিরক্ষালয়" (পিঁজরাপোল) ও একটী দর্শনীয় পদার্থ। রুগ্ন জরাগ্রস্ত অথবা আততায়ীদিগের করাল হস্ত হইতে নির্মুক্ত প্রাণি-গণের রক্ষার নিমিত্ত জীবদুঃখকাতর জৈনও হিন্দু-দিগের প্রযত্নে এই প্রাণি-রক্ষালয়টী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখানে আসিলে সত্ত্বগুণকে মূর্ত্তিমান্ প্রত্যক্ষ করা যায়। নিত্য নিত্য ধনিগণের কত অর্থরাশি বিলাসিতা-স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে। যাঁহারা দয়াগুণের প্রেরণায় এই মহৎ কার্য্যে অর্থদান করিয়াছেন, তাঁহারাই ধন্য সেই সকল মহাত্মার শ্রমার্জ্জিত অর্থের প্রকৃত সদ্ব্যবহার হইতেছে।

বালুকেশ্বরপর্ব্বত। অপরাহ্নে চারিটার সময় সঙ্গী সহ বালু-কেশ্বর পর্ব্বতের উপরিভাগে ভ্রমণার্থ চলিলাম। প্রফুল্ল গোলাপ

কুসুমের ন্যায় পারসীক বালক বালিকারা হাঁসিতে হাঁসিতে আমাদের অগ্রে অগ্রে সোপান-পথে ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। পারসীকপুরুষও রমণীরা তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছেন। পর্ব্বতোপরি ইংরেজগণের বাঙ্গলোগুলি অত্যন্ত মনোহর। এই পর্ব্বতের উপরিভাগে বম্বের গবর্ণরের উদ্যান-সংবলিত মনোজ্ঞ প্রাসাদ অবস্থিত। কিন্তু কি কারণে জানিনা, বম্বের শাসনকর্ত্তা অধিক দিন এখানে অবস্থান করেন না। বালুকেশ্বর-পর্ব্বতে এত উদ্যান ও রাজপথ যে, ভ্রমণ করিতে করিতে দিশেহারা হইতে হয়। বেড়াইতে বেড়াইতে দক্ষিণ দিগ্‌বাহী প্রশস্ত রাজপথের বামপার্শ্বস্থ এক উপবনে প্রবেশ করিলাম। এই বিজন কাননে গ্রীষ্মকালজাত নানাবিধ পুষ্প বিকশিত হইয়া সৌরভ বিস্তার করিতেছে। স্থানে স্থানে নিবিড় বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালে দুই একটী যুবক যুবতীর অনতিস্ফুট প্রণয়ালাপ শ্রুত হইতে লাগিল। আমরা কাহারও বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত হইবে আশঙ্কায় ঐ অংশ ত্যাগ করিয়া কোন প্রস্রবণ-সন্নিহিত শিলাখণ্ডে গিয়া উপবেশন করিলাম। স্থানটী বেশ ছায়াময় ও শীতল। কিছুক্ষণ পরেই সমীপস্থ তরুশাখা হইতে কোকিল কুহরব করিয়া উঠিল। সঙ্গী বন্ধুটী বলিলেন "কোকিল এই বনের নিত্য সহচর। যে ঋতুতেই আসিনা কেন, কোকিলের রব শুনিতে পাওয়া যায়। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর উৎস হইতে সুশীতল পানীয় পান করিয়া প্রস্রবণটী কিরূপ ভাবে পর্ব্বত-গাত্র দিয়া বহিতেছে উহা দেখিতে দেখিতে উত্তরাভিমুখে চলিলাম। এই পর্ব্বতোপরি প্রাচীন পর্টুগিজ-দুর্গের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। উহার উপরে নানাজাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া শীঘ্র শীঘ্র উহাকে ধ্বংসের পথ

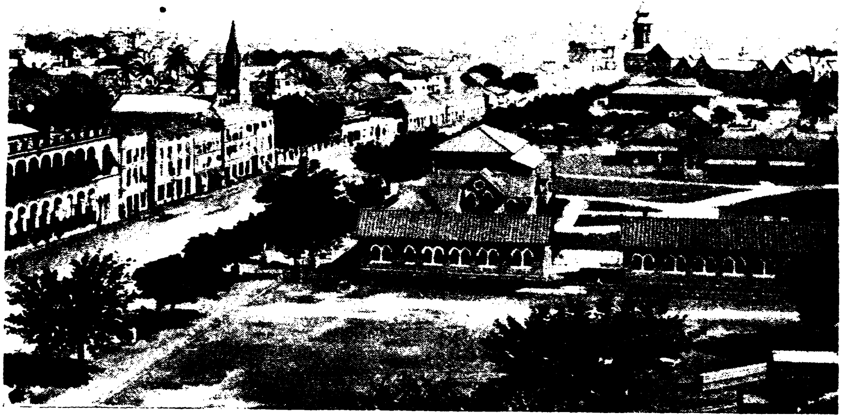
প্রদর্শন করিতেছে। শৈলোপরিস্থ তুলসীহ্রদও একটী মনোরম দৃশ্য। বালুকেশ্বর পর্ব্বতে যে, ইংরেজপল্লী ব্যতীত অন্যজাতীয় লোকের বাস নাই, তাহা নহে। ধনী পারসীক ও হিন্দুগণের বৃক্ষবাটিকা এবং প্রাসাদ-মালাও যথেষ্ট নয়নপ্রীতিকর। এখানকার দৃশ্যসমূহের মধ্যে পারসীকগণের দোখ্মা (Towers of silence) অথবা প্রেতভবন একটী নির্ব্বেদজনক দৃশ্য। প্রায় এক মাইল প্রাচীর-বেষ্টিত ভূভাগে পাঁচটী কূপ আছে। প্রত্যেক কূপের চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান। ঐ কূপগুলি দেড়তালা উচ্চ বৃত্তাকার প্রাচীরদ্বারা বেষ্টিত। উহার উপরে কোনরূপ ছাদ নাই। কূপের চতুর্দ্দিকে প্রাচীরের মধ্যে তিনটী লোক শয়ন করিতে পারে এরূপ স্থান তিনভাগে বিভক্ত করা আছে। দোখ্মার বাহিরে পারসীকগণের উপাসনালয় ও অগ্নিমন্দির বিদ্যমান। মৃতের আত্মীয়গণ বাহকের সাহায্যে মৃতদেহ উপাসনাস্থানে লইয়া গিয়া শেষ উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। তাহার পর, বাহকেরা উহা দোখ্মার মধ্যে লইয়া গিয়া তিন ভাগে বিভক্ত স্থানের প্রথম বিভাগে পুরুষের, দ্বিতীয় বিভাগে রমণীর ও তৃতীয় বিভাগে শিশুর দেহ বিবসন করিয়া রাখিয়া আসে। তাহারা দ্বাররুদ্ধ করিয়া বাহিরে আসিবার পূর্ব্বেই প্রাচীরের উপরিস্থিত গৃধ্র শকুনি প্রভৃতি পিশিতাশী বিহঙ্গগণ দ্রুতবেগে আপতিত হইয়া দুই এক ঘণ্টার মধ্যে উহা কঙ্কালাবশেষ করিয়া ফেলে। বাহক ব্যতীত মৃতের আত্মীয় কিংবা অন্য কোন দর্শকের দোখ্মায় প্রবেশ করিবার অধিকার নাই। উপাসনালয়ের কর্ম্মচারিগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমস্ত বিষয় জিজ্ঞাসুকে বুঝাইয়া দেন। পারসীকেরা বলেন "মৃতদেহ সমাহিত করিলে ভূমি দূষিত হয়, দগ্ধ

করিলে ভূতল কলুষিত হয় না বটে কিন্তু উহাতে কাহারও কোন উপকার হয় না। ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিলে এক শ্রেণীর জীবের আহারের সংস্থান করিয়া দেওয়া হয়"। আমরা দূর হইতে দোখ্‌মা সন্দর্শন করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। তাহার পর, বেড়াইতে বেড়াইতে একটী রাজপথ অবলম্বনপূর্ব্বক নীচে নামিতে নামিতে সমুদ্র সলিলের সন্নিহিত একটী হস্তিগুণ্ডাকার স্থানে উপনীত হইলাম। ঐ স্থানে দর্শকগণের বিশ্রামের নিমিত্ত কয়েক খানি কাষ্ঠাসন সংস্থাপিত হইয়াছে। আমরা সেখানে বসিয়া মহার্ণবের নীলজলে তরঙ্গমালার মোহন নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম। তীরস্থ কাননের প্রতিবিম্ব সাগর জলে পতিত হওয়ায় বড়ই মনোরম দৃশ্য হইয়াছে। উহা দেখিয়া শিশুপালবধের তৃতীয় সর্গের বর্ণনা মনে পড়িল *। শিশুপালবধ মহাকাব্যের রচয়িতা মাঘ, গুজরাটের অধিবাসী ছিলেন†। সুতরাং সমুদ্রতীরবর্ত্তী এইরূপ কোন স্থানের দৃশ্য দেখিয়াই বোধ হয়, তাঁহার কাব্যের ঐ অংশের বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া ঐ স্থান হইতে উঠিলাম। পর্ব্বত হইতে অবতরণ কালেও আবার সেই পারসীক-মহিলাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল। এক একটী পারসীক-ললনা

---

*" পাঁরে জলং নীরনিধেরপশ্যন্
মুরারিরানীলপলাশরাশীঃ।
বনাবলীরুৎকলিকা-সহস্র-
প্রতিক্ষণোৎকূলিতশৈবলাভাঃ"॥

† মল্লিখিত মাঘকবির জীবন-বৃত্তান্ত বিষয়ক প্রবন্ধ—পাঠ করুন। উহা ১৩০১ সালের ১লা ভাদ্র বঙ্গীয়সাহিত্যপরিষদের তৃতীয় মাসিক অধিবেশনে পঠিত হয়। এবং ১৩০১ শালের কার্ত্তিক মাসের ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে।

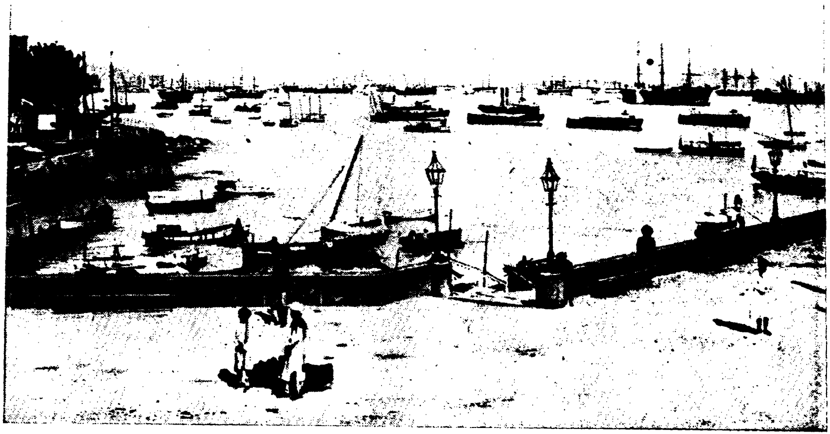


বোম্বাই-নগরীস্থ ক্রফোর্ড মার্কেট্ এবং দেশীয় মহাজন-পল্লী।

যেন এক একটী দেবকন্যা। সঙ্গী বন্ধু বলিলেন "পূর্ব্বে পারসীরা প্রায়ই সমুদ্রতীরে বাস করিতেন। পল্লীবাসীরা তাঁহাদের সহিত বড় পরিচিত ছিল না, সুতরাং অপরাহ্নে পারসীক-সীমন্তিনীগণের সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে দেখিয়া স্বর্গ হইতে অবতীর্ণা অপ্সরা মনে করিত"। আমরা যখন সমুদ্রতীরে উপনীত হইলাম, তখন সূর্য্য প্রায় অস্তগমনোন্মুখ, একে একে নক্ষত্রগুলি আকাশে ফুটিয়া উঠিতেছে। উপল-খণ্ডে বসিয়া সায়ং-সন্ধ্যা শেষ করিলাম। সমস্ত দিনের ভ্রমণে শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন বোধ হইতে লাগিল, সুতরাং অধিক ক্ষণ সমুদ্রতীরে বিলম্ব না করিয়া বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইলাম।

ক্রফোর্ডমার্কেট ও দেশীয়-ধনিক-পল্লী। ১৫ই জ্যৈষ্ঠ প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক দেশীয় ধনিকগণের অত্যুচ্চ প্রাসাদ-মালা দেখিতে দেখিতে ক্রফোর্ডমার্কেটে (মিউনিসিপালিটীর বাজারে) উপস্থিত হইলাম। বম্বের কৃত্রিম দৃশ্যের মধ্যে ইহা একটী অল্প-প্রীতিকর নহে। ত্রিতল পঞ্চতল, সপ্ততল সৌধরাজি শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে অবস্থিত। প্রশস্ত রাজপথ, অসংখ্য বিপণি, অশ্বশকটের ঘর্ঘর শব্দ, নানাজাতীয় মানুষের ভিড়। বাজারের দক্ষিণাংশের পণ্যশালাগুলি নানাবিধ পুষ্প-স্তবক ও বহুপ্রকার সুপক্ক ফলে সুসজ্জিত। এই স্থানটীর সমুদয় বস্তুই বম্বে নগরীর মহাসমৃদ্ধির পরিচায়ক। তাহার পর, নগরীর ঘনবসতি অতিক্রম করিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে প্রথমেই এলফিন্‌ষ্টোন্‌-চক্রে (Elffinston Square), উপনীত হইলাম। এই চক্রাকার দূর্ব্বামণ্ডিত হরিদ্বর্ণ ক্ষেত্রে চতুর্দ্দিকে পাষাণময় প্রাসাদ-মালা উন্নতশিরে বিদ্যমান। ঐ সৌধরাজি যেমন কারুকার্য্যময়, তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

এপোলোবন্দর। তাহার পর, ক্রমে সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজপথ অবলম্বনপূর্ব্বক দক্ষিণদিকে যাইতে যাইতে অনেক ক্ষণের পর এপোলোবন্দর পাওয়া গেল। ঐ স্থানটী বড়ই দৃষ্টিরম্য। সমুদ্রের ঘাট পাষাণময়। ইহার সিঁড়ীগুলি সুবৃহৎ প্রস্তর-খণ্ডের দ্বারা এমন সুদৃঢ়ভাবে নির্ম্মিত যে দেখিলে ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়। তটের উপরিভাগে দর্শকগণের জন্য যে সকল প্রস্তরাসন ও কাষ্ঠাসন আছে, উহার এক খানিতে গিয়া বসিলাম। য়ুরোপযাত্রীরা এই স্থান হইতে অর্ণবযান আরোহণ করেন। তজ্জন্য প্রত্যেক কোম্পানির একটী করিয়া অফিষ ও টিকিট বিক্রয়ের স্থান রহিয়াছে। রাজপথের উভয় পার্শ্বে নানা জাতীয় পান্থনিবাস (Hotel) বিদ্যমান। সমুদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে কেবল সাগর-বক্ষে তাল খর্জ্জুর গুবাক ও নারিকেল তরুরাজি-সুশোভিত অসংখ্য দ্বীপশ্রেণী নয়নগোচর হয়। উহারই একটীতে হস্তিগিরি গুহা (Elephant Cave) বিরাজিত। পর্ব্বতগাত্রে প্রকাণ্ড হস্তিমূর্ত্তি খোদিত আছে বলিয়া উহার "হস্তিগিরি-গুহা" নাম হইয়াছে। উক্ত শৈলের নিতম্ব-দেশে গহ্বর-মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অর্দ্ধনারীশ্বর, হরপার্ব্বতী, শিবের বিবাহ, গণেশ-জননী, রাবণের কৈলাস উত্তোলন, দক্ষযজ্ঞনাশ, মহাদেবের তপস্যা-প্রভৃতির ও অনেক বৌদ্ধ দেব দেবীর ছবি আছে। উহার শিল্পকার্য্য নাকি অত্যন্ত মনোহর। প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন, প্রায় সহস্রাধিক বর্ষ পূর্ব্বে ঐ সকল মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু অর্ণব-মধ্যস্থ বিজন গিরিগুহায় কোন্ রাজার অধিকার কালে কাহার প্রযত্নে ঐ সকল দেবমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল? এ পর্য্যন্ত তাহা নির্ণীত হয় নাই। সময়াভাবে হস্তি-গুহায় যাওয়ার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হইল। বাল্মীকি-রামায়ণে পাঠ করিয়াছি, মহার্ণব,



বোম্বাইনগরী-সমুদ্রতীরে এপোলো-বন্দর।

দেবরাজের ভয়ে ভীত হিমালয়ের পুত্র মৈনাক পর্ব্বতকেই স্বীয় অঙ্কে আশ্রয় দিয়াছিলেন কিন্তু বম্বের এপোলোবন্দরে আসিলে দেখা যায়, মৈনাকের ন্যায় সহস্র সহস্র শৈল প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে জলধি-বক্ষঃ আশ্রয় করিয়া বিরাজ করিতেছে। অনেক সময় বারিধি-গর্ভস্থ ঐ সকল শৈলমালায় আহত হইয়া শত শত অর্ণবযান চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তজ্জন্য অর্ণবপোতের কর্ণধারগণের পথ প্রদর্শনের নিমিত্ত এপোলোবন্দর হইতে আরম্ভ করিয়া বরাবর সমুদ্রবক্ষে আলোকস্তম্ভ (Light-post) প্রোথিত হইয়াছে। ঐ স্তম্ভসমূহ সমুদ্রবক্ষে যেন হীরক-মালার ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে।

ক্রমশঃ সূর্য্যাতপ তীক্ষ্ণ হইতে লাগিল। আমি সেখান হইতে উঠিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে পূর্ব্বাভিমুখে চলিলাম। কিছুক্ষণ পরেই গবর্ণমেণ্ট ডক্‌ইয়ার্ডে (Dockyard) পৌঁছিলাম। এখানে আসিলে ভারতবর্ষের অন্নাভাবের কারণ উত্তমরূপে প্রত্যক্ষ করাযায়। অসংখ্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অর্ণবপোত দরিদ্র ভারতবাসীর খাদ্য দ্রব্য অপহরণের নিমিত্ত মুখব্যাদান করিয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। অপর দিকে অর্ণবতরী-সমূহ হইতে দেশান্তরের সহস্র সহস্র বিলাস-দ্রব্য অবতীর্ণ হইতেছে। বম্বের ডক্‌ইয়ার্ডে বাণিজ্য-ব্যাপারে মানুষের সজীবতা লক্ষ্য করিয়া পুলকিত হইতে হয়।. এই সজীবতার প্রবর্ত্তক বৈদেশিকগণ। তাঁহাদেরই কার্য্যকলাপের যথাশক্তি অনুসরণ করিয়া আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীও বিত্ত-সঞ্চয় করিয়া ধনবান্ হইতেছে। বাঙ্গালাদেশের ন্যায় দক্ষিণাপথে মধ্যসত্ত্বাধিকারী জমিদার-শ্রেণী নাই। বাণিজ্যই ইহাদের সৌভাগ্যের একমাত্র প্রসূতি।

রাজাবাই-স্তম্ভ। বম্বের অন্যতম প্রধান দৃশ্য রাজাবাইস্তম্ভ(Raja

by clock tower)। সাধারণতঃ লোকে উহাকে "রাজাবাই-টাওয়ার্" বলিয়া থাকে। অনুমতিপত্র(Pass)ব্যতীত উহা দেখা যায় না। আমি রাজবাই-টাওয়ার্ দেখিতে সঙ্কল্প করিয়াছি শুনিয়া বোম্বাই প্রবাসী আরও তিনটী বাঙ্গালী আমার সঙ্গী হইলেন। তাঁহারা কার্য্যোপলক্ষে বম্বেনগরীতে থাকেন কিন্তু কখনও ঐ স্তম্ভে আরোহণ করেন নাই। টাওয়ারের পার্শ্বস্থ সৌধে বম্বে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সম্পাদকের কার্য্যালয়। আমরা অপরাহ্ণ দুইটায় সময় উক্ত কার্য্যালয় হইতে অনুমতিপত্র লইয়া সেই গগনস্পর্শী স্তম্ভে আরোহণ করিলাম। জলধিতটে বিরাজমান এই স্তম্ভকে দূর হইতে যেন একটী স্বর্গীয় মঞ্চের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই স্তম্ভ চারিতল-বিশিষ্ট। ইহার মধ্য দিয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া সিঁড়ী প্রস্তুত করা হইয়াছে। আমরা ক্রমে তিন তলা অতিক্রম করিয়া চতুর্থ তলে উপস্থিত হইলাম। ঐ স্থানে একটী সুবৃহৎ ঘড়ী ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছে। উহার বৃহত্বের কথা অধিক কি বলিব? কাঁটা নির্ম্মাণের কৌশল দেখিবার জন্য ক্রমে ক্রমে তিনটী বাঙ্গালীই ঐ ঘড়ীতে আরোহণ করিলেন কিন্তু উহা একটুও নড়িল না। এই অদ্ভুত ঘড়ী প্রতিকোয়াটারে (১৫ মিনিট অন্তর) আপনা অপনি মনোহর রবে বাজিয়া সমস্ত বম্বেবাসীকে সময় জ্ঞাপন করিয়া থাকে। এখান হইতে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিলে নিসর্গের শোভায় অন্তঃকরণ মোহিত হয়। পশ্চিমে অনন্ত-মহার্ণবহীরকমালার ন্যায় আলোকস্তম্ভ-সমূহে শোভিত হইয়া বিরাজমান। উত্তরে উপবন-বিমণ্ডিত বালুকেশ্বর শৈলবর ও দক্ষিণে এপোলোবন্দরের অভ্রস্পর্শী গুণবৃক্ষসকল * শোভা পাইতেছে। পূর্ব্বভাগে বম্বেনগরী

* গুণবৃক্ষ—জাহাজের মাস্তুল।



বোম্বাই-নগরীস্থ রাজাবাইস্তম্ভ ও অন্যান্য কার্য্যালয়।

ত্রিতল পঞ্চতল সৌধমালা, প্রফুল্ল পুষ্পোদ্যান, আলোকস্তম্ভশোভিত ব্যায়ামক্ষেত্র, জনতাপূর্ণ রাজপথ ও বিবিধ পণ্যবীথিকা বক্ষে করিয়া যেন অমরাবতীকে উপহাস করিতেছে।

স্তম্ভ হইতে অবতরণকালে পূর্ব্বভাগের শাসীর মধ্যভাগ ভাঙ্গা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলে একটী বাবু বলিলেন ;—চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একদিন অপরাহ্ণ প্রায় চারি ঘটিকার সময় একটী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া ভুবনমোহিনী সুন্দরী পার্সী বালিকা ও তাহার সঙ্গিনী অপর একটী পার্সী যুবতী, স্তম্ভে আরোহণ করে কিন্তু পাঁচ ঘটিকার সময় তাহাদের মৃত দেহ স্তম্ভসন্নিহিত দূর্ব্বাক্ষেত্রে পতিত দেখা যায়। জনরব এই যে, কোন দুর্ব্বৃত্ত ধনি-সন্তান প্রথমোক্ত বালিকার রূপে মুগ্ধ হইয়া প্রত্যহ তাহার অনুসরণ করিত। ঐ দিবস নিঃসহায়-অবস্থায় স্তম্ভে উঠিতে দেখিয়া সেও অনুগমন করে কিন্তু সেই স্বর্গীয় কুসুম পাপিষ্ঠের করস্পর্শে কলঙ্কিত হয় নাই। আক্রমণের পূর্ব্বক্ষণে সেই দেববালা প্রাণত্যাগ করিয়া আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিল। অপর একটী বাবু অন্যরূপ বলিলেন। যাহা হউক, ঘটনাটী যে নিতান্ত শোকাবহ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। দুর্ব্বৃত্ত নাকি বহু অর্থব্যয়ে আত্মদোষ গোপন করিতে সমর্থ হয়। আমার তখন স্মরণ হইল, ঐ ঘটনাটীর বিষয় পূর্ব্বে সংবাদপত্রেও পাঠ করিয়াছিলাম। এই স্তম্ভটী "রাজবাইস্তম্ভ" নামে কেন খ্যাত, উহা জানিবার জন্য অনেকের ঔৎসুক্য হইতে পারে। তজ্জন্য উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছি। বোম্বাইবাসী যে বণিক্-প্রবরের প্রদত্ত অর্থের কুসীদ (সুদ) হইতে কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ বিদ্যার্থিগণ বিশেষ পরীক্ষা প্রদান করিয়া বার্ষিক দশ সহস্র

* (১০,০০০) টাকার একটী বৃত্তি (Roy chand and Prem chand scholarship) প্রাপ্ত হন, তাঁহারই অর্থে এই স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রেমচাঁদ বাণিজ্য দ্বারা বহু অর্থ সঞ্চয় করেন এবং অনেক মহৎ কার্য্যে উহার বিনিয়োগ করিয়া যান। তন্মধ্যে তিনি বোম্বাই-বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বাইশ লক্ষ (২২,০০০০০) টাকা দান করেন, তাহারই কিয়দংশ দ্বারা তাঁহার পত্নী রাজাবাইর স্মরণার্থ সমুদ্রতীরবর্ত্তী এই মহাস্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রেমচাঁদের পুত্র রায়চাঁদ। বোম্বাইপ্রদেশের লোক আপন নামের শেষে পিতৃনাম যোগ করে, তজ্জন্য ইনি রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ নামে প্রসিদ্ধ। এই ধনিবংশের আর পূর্ব্বের অবস্থা নাই। এখন ইহারা মধ্যশ্রেণীর লোকের অবস্থায় পরিণত হইয়াছেন কিন্তু পূর্ব্বপুরুষগণের বদান্যতার গুণে সমাজে যথেষ্ট সম্মান প্রতিপত্তি আছে।

আলোক-গৃহ। প্রায় দুই ঘণ্টার পর, রাজাবাইস্তম্ভ হইতে অবতরণ করিয়া বাসায় উপস্থিত হইলাম। বিশ্রামান্তে পুনরায় বাহির হইতেছি, এমন সময় গুজরাটী বণিক্‌দিগের একটী বিবাহের বরযাত্রি-সম্প্রদায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। অগ্রে ও পশ্চাতে লালপাগড়ি-ওয়ালা প্রহরিগণের সহিত য়ুরোপীয় শান্তিরক্ষকগণ অশ্বে আরোহণ করিয়া শান্তিরক্ষা করিতেছে। মধ্যভাগে সুসজ্জিত মহিলা ও পুরুষগণ বরের অনুগমন করিতেছেন। গুজরাটী বণিক্-রমণীরা বড়ই অলঙ্কারপ্রিয়। ইহাদের মধ্যে এমন মহিলাও অনেক আছেন, যাঁহাদের এক জনের গাত্রে সাত/আট লক্ষ টাকার হীরকা-

* এখন কোম্পানির কাগজের সুদ কমিয়া যাওয়ায় উহা আট হাজারে পরিণত হইয়াছে।

লঙ্কার শোভা পাইয়া থাকে। যাইতে যাইতে পুনরায় সেই সমুদ্রতীরে উপনীত হইলাম। সমুদ্র-গর্ভস্থ প্রধান আলোকগৃহ (Light-house) প্রায় ১৫০ ফিট্ উচ্চ এবং উহার পরিধি ১২ ফিটের ন্যূন নহে। আমরা উপস্থিত হইলে কিছু ক্ষণের পরই উহা সহসা জ্বলিয়া উঠিল এবং এই আলোক-স্তম্ভের শিরোভাগস্থ আলোকাধার ঘুরিয়া ঘুরিয়া রশ্মি বিকীর্ণ করিতে লাগিল। তখন এই স্থানের যে কি এক অপূর্ব্ব শোভা হইল, তাহা লিখিয়া প্রকাশ করা যায় না। আমাদের একটী সঙ্গী, ক্ষুদ্র নৌকায় আরোহণ করিয়া ঐ স্তম্ভের উপরিভাগে উঠিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন কিন্তু আমি উহাতে আরোহণ করার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিলাম না। বোম্বাই নগরীতে ইংরেজ-গবর্ণমেণ্টের অনেক যুদ্ধ জাহাজ বিদ্যমান। এখান হইতে আগ্নেয়াস্ত্র-পরিপূর্ণ ঐ সকল রণতরী দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিয়া প্রায় রাত্রি ৮টার সময় বাসায় ফিরিলাম।

বম্বেনগরীতে আসিলে প্রথমে দুইটী জাতির আচার ব্যবহার ও সভ্যতার প্রতি হৃদয় আকৃষ্ট হয়। প্রথম পার্সী, দ্বিতীয় ভাটিয়া বেণে। পার্সীর বিষয় পূর্ব্বেই বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে, এখন ভাটিয়াদের সভ্যতার বিষয় সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া বম্বের ভ্রমণকথা শেষ করিব। বোম্বাইনগরীতে সর্ব্বশুদ্ধ ৭,৭৩,১৯৬ লোকের বাস। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ৩৫,৪২৮ ধর্ম্মচ্যুত হিন্দু, ৪,০৭,৭১৭ অন্য জাতীয় হিন্দু ৪৯,১২২ পার্সী ৪৮,৫৯৭ বৌদ্ধ ও জৈন ১৭,২১৮ ভাটিয়া ৯,৪১৭ ইহুদি ৩,৩২১ মুসলমান ১,৫৮,০২৪ য়ুরোপীয় ১০,৫৫১ ফিরিঙ্গি ১,১৬৮ চীনদেশীয় ১৬৯ দেশীয় খ্রীষ্টান ৩০,৭০৮ আফ্রিকাবাসী ৬৮৯ জন।

উপরে যে ৯,৪১৭ ভাটিয়া বেণের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহারা সকলেই ধনকুবের। কতিপয় য়ুরোপীয় ও দেশীয় পরিব্রাজকের মতে এই ভাটিয়া বণিক্-সম্প্রদায়ের ন্যায় মিতব্যয়ী জাতি পৃথিবীতে আর আছে কিনা সন্দেহ। জগতের সর্ব্ববিধ বিষয় হইতে চিত্ত-বৃত্তিকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া কেবল ধন-সঞ্চয় করাই ইহাদের জীবনের প্রধানতম লক্ষ্য। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশশতাব্দীর মধ্যভাগে ত্রৈলিঙ্গ-দেশীয় শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বল্লভাচার্য্য একটী অভিনব বৈষ্ণব-মতের সৃষ্টি করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য কি ছিল, ঠিক বলা যায় না, কিন্তু এখন বল্লভাচারী গোস্বামিগণ উক্ত ধর্ম্মমতের অনুষ্ঠানকে নিতান্ত বিলাসব্যাপারে পরিণত করিয়াছেন। ইহারা বলেন "পরমেশ্বরের উপাসনাতে উপবাসের প্রয়োজন নাই। বিষয়-সুখ ভোগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা কর, তাহা হইলেই অভীষ্ট-লাভ হইবে।" ভাটিয়াবণিক্ ও বণিক-পত্নীরা শ্রীকৃষ্ণের অবতার-জ্ঞানে বৃন্দাবন-বিলাসিনী গোপীদিগের অনুকরণে ঐ সকল গোস্বামীর সেবায় তনু মন অর্পণ করিয়া থাকে। বল্লভাচারী গোস্বামীরা "মহারাজ" নামে কথিত। প্রকৃতপক্ষে ইহারা ভূম্যধিকারী মহারাজগণের অপেক্ষাও অধিকতর ভোগসুখে নিমগ্ন থাকেন। বম্বে নগরীতে বল্লভাচারী গোস্বামিগণের কয়েকটী বাড়ী ও দেবমন্দির আছে। তাঁহাদের ঐশ্বর্য্য এবং ভোগসুখ দেখিলে রাজভোগও তুচ্ছ মনে হয়। গোস্বামিগণ অবশ্য তাঁহাদের বিলাস-সামগ্রী শিষ্যদের নিকট হইতেই সংগ্রহ করিয়া থাকেন। তজ্জন্য নানা উপায়ে অর্থ-সঞ্চয় করা হইয়া থাকে। একজন পরিব্রাজক অনুসন্ধান করিয়া যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে উহা বিবৃত হইল। শিষ্য এবং শিষ্যার গুরুদর্শনে ৫৲ গুরুর স্পর্শনে ২০৲ গুরুর চরণ প্রক্ষালনে

৩৫৲ গুরুকে দোলায় বসাইয়া দোল দেওয়ায় ৪০৲ গুরুর অঙ্গে চন্দন লেপনে ৪২৲ গুরুর সহিত একাসনে উপবেশনে ৬০৲ মদন-মূর্ত্তির সহিত (অর্থাৎ গুরুর সহিত) স্ত্রীজাতীয়া শিষ্যার এক গৃহে অবস্থিতির জন্য ৫০৲ হইতে ৫০০৲ গুরু অথবা গুরুর কোন সেবকের পদাঘাত খাইবার জন্য ১১৲ দণ্ডের আঘাত খাওয়ায় ১৩৲ রাসক্রীড়ার জন্য স্ত্রীজাতীয়া শিষ্যার পক্ষে ১০০৲ হইতে ২০০৲ পর্য্যন্ত, গুরুর প্রতিনিধির দ্বারা রাসক্রীড়ায় ৫০৲ হইতে ১০০৲ পর্য্যন্ত, গুরুর পানের পিক খাওয়ায় ১৭৲ মহারাজের (অর্থাৎ গুরুর) স্নানোদক কিংবা যে জলে মহারাজের বস্ত্র ধৌত করা হইয়াছে, সেই জলপানে ১৯৲ টাকা প্রদান করিতে হয়। মানুষ অন্ধবিশ্বাসে কি না করে? দীর্ঘকালের প্রচলিত আচারের নিকট শাস্ত্রের অনুশাসন কিংবা নৈতিক-বন্ধন যে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, উহার একমাত্র কারণ শিক্ষার অভাব।

বম্বের প্রধান প্রধান দৃশ্যগুলির বিষয় মাত্র বর্ণিত হইল। উহা ব্যতীত এই নগরের স্কুল, কলেজ, দেবমন্দির, মঠ, মস্‌জিদ্, গির্জ্জা, রাজনৈতিক-সভা, সাহিত্যসমাজ এবং বৃহৎ বৃহৎ মুদ্রাযন্ত্র যে কত আছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে? রয়াল্-এসিয়াটিক্-সোসাইটীর বোম্বাই-শাখা প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধান কার্য্য দ্বারা জগতে সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। নির্ণয়সাগর এবং বেঙ্কটাচলেশ-প্রভৃতি যন্ত্রালয়-সমূহ সহস্র সহস্র সংস্কৃত পুস্তকের উৎকৃষ্ট সংস্করণ-সকল প্রকাশ করিয়া নিয়ত জগতের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিতেছে।

নাসিকতীর্থ।

ঐ দিবস আহারান্তে রাত্রি ১২টার ট্রেনে নাসিক যাইবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। ভ্রাতৃকল্প শ্রীমান্ নীলমণি মুখোপাধ্যায়, বুড়ীবন্দর ষ্টেসনে আসিয়া আমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া গেলেন। এই ষ্টেসনের নামান্তর ভিক্টোরিয়াটার্মিনাস্ (Victoria Terminus) ইহার ন্যায় বৃহত্তম রেলষ্টেসন ভারতবর্ষের আর কোথাও নাই। বহুদূর হইতে ষ্টেসন-গৃহের অভ্রস্পর্শী চূড়া-সকল দৃষ্টিগোচর হয়। প্রতিদিন ষ্টেসনের সম্মুখে অসংখ্য ভাড়াটিয়া গাড়ী প্রতীক্ষা করে। বম্বের ভাড়াটিয়ে গাড়ীগুলিও কলিকাতার বড়লোকদের গাড়ী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। নিকটেই নানাজাতীয় হোটেল্। কিঞ্চিদ্দূরে একটী প্রদর্শনী-গৃহ। ষ্টেসনের অভ্যন্তর-ভাগে অনেকগুলি টিকিট বিক্রয়ের স্থান। দিবারাত্রি অসংখ্য লোক সমাগম হইতেছে কিন্তু বন্দোবস্তের গুণে কিছুমাত্র ভিড় নাই। ভদ্রমহিলাদের বিশ্রামগৃহ এক দিকে, পুরুষ দিকের অন্যদিকে। ঘরগুলি যেমন সুন্দর তেমনই সুসজ্জিত। গাড়ী ছাড়িবার একটু পূর্ব্বে প্রথম ঘণ্টা (First bell) বাজিলে সেই উপকারী বন্ধু নীলমণি বাবুকে বিদায় দিয়া বিছানা প্রস্তুত করিয়া ঠিক হইয়া বসিলাম। যথাসময়ে সুদূরব্যাপিনী শকট-রাজি আমাদিগকে লইয়া হুস্ হুস্ শব্দে ধাবিত হইল। যাইবার কালে বড়োদা হইয়া ঘুরিয়া গিয়াছিলাম। এই বার অপেক্ষাকৃত সরল পথ অবলম্বন করিলাম। বম্বে হইতে নাসিক যাওয়ার রাস্তাটীও নিতান্ত সুগম নহে। কত কত শৈলমালা অরণ্যানী ও নদ নদী অতিক্রম করিয়া পরদিন ১৬ই জ্যৈষ্ঠ পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটি-

কার সময় নাসিক-রোড ষ্টেসনে উপনীত হইলাম। উক্ত ষ্টেসন হইতে নাসিকতীর্থ ও নাসিকনগরী প্রায় আড়াই ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আরোহীদের গমনাগমনের জন্য ট্রামও ঘোড়ার গাড়ী উভয়ই আছে। আমরা বহুসংখ্য তীর্থযাত্রীর সহিত ট্রামে উঠিয়া প্রায় ১১ ঘটিকার সময় নগরীর দক্ষিণপ্রান্তে উপস্থিত হইলাম। এখানেও পাণ্ডার ভিড় অল্প নহে। আমি একজন পাণ্ডা ঠিক করিলাম। তাহার ভৃত্য আমার দ্রব্যাদি বহিয়া লইয়া পাণ্ডার গৃহে উপস্থিত করিল। বাটীর মধ্যে দোতলার একটী গৃহে আমার বাসস্থান নির্ণীত হইল।

বাল্মীকি-রামায়ণে বর্ণিত পঞ্চবটীই এখন নাসিক নামে প্রসিদ্ধ। সূর্য্য-বংশাবতংস রাম যখন পিতৃসত্য পালনার্থ সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনে আগমন করেন, তখন কিছু কাল এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। রাবণভগিনী সূর্পণখা রামকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করে কিন্তু রাম উহাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করায় উক্ত রাক্ষসী কুপিত হইয়া সীতাকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হয়। শেষে রামের ইঙ্গিত-ক্রমে মহাবীর সৌমিত্রি উহার নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া বিরূপ করিয়া দেন। যে সময়ে এখানে সূর্পণখার নাসা কর্ণ ছিন্ন হয়, তাহার পর হইতে এই স্থান নাসিক নামে প্রখ্যাত হইয়াছে। নাসিক দক্ষিণাপথের একটী প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। দাক্ষিণাত্য হিন্দুগণ নাসিককে দক্ষিণকাশী বলিয়া থাকেন। ইহা পুণ্য-সলিলা গোদাবরীর তীরে অবস্থিত। গোদাবরী সেই বৈদিক কালের পুণ্যনদী। দক্ষিণাপথের লোকেরা জাহ্নবী অপেক্ষা ও গোদাবরীর প্রতি অধিকতর ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। এই নদীর অপর নাম গৌতমী-গঙ্গা। ব্রহ্মাণ্ড-

পুরাণের অন্তর্গত গৌতমী-মাহাত্ম্যে গোদাবরীর উৎপত্তি কথা এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে। যখন মহর্ষি গৌতম ব্রহ্মগিরিস্থ আশ্রমে অবস্থান করিতেন, সেই সময় দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপিয়া অনাবৃষ্টি হওয়ায় দারুণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ গৌতমের শরণাপন্ন হন। গৌতম অন্ন দিয়া ঋষিগণকে রক্ষা করেন। দ্বাদশবর্ষ পরে সুবৃষ্টি হইল এবং বসুমতী শস্যশালিনী হইলেন। এদিকে কৈলাস পর্ব্বতে এক মহাবিভ্রাট উপস্থিত। মহাদেব গঙ্গাকে মাথায় করিয়া জটামধ্যে রাখিয়াছেন বলিয়া অভিমানিনী হৈমবতীর বড়ই ঈর্ষ্যা হইয়াছে। তিনি কাতরভাবে মহাদেবকে বলিলেন "দেখ নাথ! তুমি গঙ্গাকে মাথায়, আর আমাকে কোলে রাখিয়াছ। ইহাতে আমার অপমান করা হইতেছে। তুমি শীঘ্র গঙ্গাকে নামাইয়া রাখ।" মহাদেব তখন ধুস্তূর সেবায় আসক্ত ছিলেন, সুতরাং সুখাবেশে হৈমবতীর কথা শুনিয়াও শুনিলেন না। ইহাতে তাঁহার আরও দুঃখ হইল। তিনি আপন পুত্র গণেশকে মনের ব্যথা জানাইলেন। গণেশ মাতার দুঃখ দূর করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন। তিনি কার্ত্তিকের সঙ্গে বৃদ্ধ-ব্রাহ্মণবেশে গৌতমের আশ্রমের বাহিরে আসিয়া ঋষিগণকে দেখিয়া বলিলেন "ব্রাহ্মণগণ! এখন সর্ব্বত্রই শস্য জন্মিয়াছে, আর আপনাদের পরান্নে নির্ভর করা উচিত নহে, অতএব নিজ নিজ স্থানে গমন করুন। ঋষিগণ গৌতমের নিকটে আসিয়া বিদায় চাহিলেন। গৌতম বলিলেন "মহর্ষিগণ! আমি দুর্দ্দিনে আপনাদিগকে অন্ন দিয়াছি, এখন ভাল সময় বলিয়া আমাকে ছাড়িয়া যাওয়া আপনাদের উচিত নহে। আমার ইচ্ছা আপনারা এই স্থানেই চিরকাল থাকুন।" ঋষিগণ গৌতমের অনুরোধ এড়া-

ইতে পারিলেন না, সুতরাং সেখানেই রহিলেন। গণেশ ঐ স্থান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কার্ত্তিককে বলিলেন "ভাই তুমি গাভীরূপে গৌতমের ক্ষেত্রে গিয়া শস্য নষ্ট কর, গৌতম তোমাকে তাড়না করিলে মৃতবৎ পড়িয়া থাকিবে"। কার্ত্তিক তাহাই করিলেন। তিনি গাভী হইয়া গৌতমের শস্য নষ্ট করিতে আরম্ভ করিলেন। গৌতম যেই গাভীকে তাড়াইতে যাইবেন, গাভী অমনি মড়ার মত পড়িয়া রহিল। আশ্রমে গোহত্যা হইয়াছে শুনিয়া ঋষিরা সকলেই প্রস্থানের উদ্‌যোগ করিলেন। এ বারও গৌতম তাঁহাদিগকে থাকিতে অনুরোধ করিলেন। ঋষিগণ বলিলেন "যদি তুমি ভগীরথের ন্যায় গঙ্গাকে আনয়ন করিয়া গাভীকে পুনর্জীবিত করিতে পার, তাহা হইলে আমরা থাকিতে পারি।" গৌতম তাহাতেই সম্মত হইলেন। তিনি ত্র্যম্বক-পর্ব্বতে গিয়া মহাদেবের উদ্দেশে তপস্যা করিলেন। মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, গৌতম বলিলেন "প্রভো! আপনি জটাস্থিত গঙ্গাকে আমায় প্রদান করুন। তিনি মৃতগাভীর জীবন দান করিয়া সাগর-সঙ্গমে গমন করুন"। এই বার হৈমবতীর অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। মহাদেব গঙ্গাকে জটা হইতে নামাইয়া দিলেন। তিনিই ভূমণ্ডলে গোদাবরী বা গৌতমী-গঙ্গা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। প্রকৃত পক্ষেও নাসিক জেলার ত্র্যম্বক-নামক গ্রামের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী পর্ব্বত হইতেই গোদাবরীর উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ স্থানে একটী কূপ আছে। উহার নিম্নদেশে নামিবার জন্য ৬৯০টী সিঁড়ী আছে। ঐ স্থানে অবস্থিত একটী খোদিত পাষাণ-মূর্ত্তির ওষ্ঠ প্রান্ত দিয়া ফোটা ফোটা জল পড়িতেছে। ঐ সকল বারিবিন্দুর সমষ্টিতেই গোদাবরী-প্রবাহ উৎপন্ন হইয়াছে। এই

নদী পূর্ব্ব-ঘাট হইতে পশ্চিমঘাট পর্ব্বত পর্য্যন্ত ৮৯৬ মাইল বিস্তৃত। ইহার জলের পবিত্রতা ও উপকারিতা এবং উভয় কূলের সৌন্দর্য্য অতিমনোহর। গোদাবরীর তীরবর্ত্তী বহু স্থানে বহু-তীর্থ বিদ্যমান। তন্মধ্যে নাসিক অতিবিখ্যাত। এই গোদাবরী সপ্তশাখায় বিভক্ত যথা ;—তুল্যা, আত্রেয়ী, ভারদ্বাজী, গৌতমী বৃদ্ধগৌতমী, কৌশিকী ও বশিষ্ঠা,। যেখানে এই সপ্তশাখা মিলিত হইয়াছে, উহার নাম সপ্তগোদাবরী-সাগরসঙ্গম। ঐ স্থানটী মান্দ্রাজের অন্তর্গত।

আমি পাণ্ডার সহিত গোদাবরীতীরে উপস্থিত হইলাম। এই স্বল্পায়তা স্রোতস্বিনীর উভয় তীর, অসংখ্য পাষাণময় ঘাট ও মঠ মন্দিরাদিতে এমন শোভান্বিত যে, দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। কাশীর জাহ্নবীতীর ব্যতীত এরূপ মনোরম দৃশ্য আর কোথায়ও নাই। নাসিকে চিত্তপাবন-ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। প্রত্যেক ঘাটেই গৌরাঙ্গী চিত্তপাবন-ব্রাহ্মণ-ললনারা ঘাট আলো করিয়া স্নান পূজা করিতেছেন। নাসিকে সকল ঋতুতেই যাত্রি-সমাগম হয়। উক্ত দিবস অনেক তীর্থযাত্রী দেখিলাম। পাণ্ডা, পুরোহিতের সহিত আমাকে গোদাবরী-তীরে বসাইয়া রাখিয়া তীর্থশ্রাদ্ধের দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া আনিল। এখানেও শ্রীফল (নারিকেল) সহ গোদাবরীর ভেট করিতে হয়। গোদাবরীর অর্ঘ্যদান শেষ হইলে একটী বিশেষ সঙ্কল্প-মন্ত্র পাঠ করিয়া অবগাহন করিলাম। এবং সন্ধ্যা শেষ হইলে তীর্থশ্রাদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পুরোহিতটী সাধারণ তীর্থ-পুরোহিতের ন্যায় নহেন, ইহার শাস্ত্রে অধিকার আছে। বেশ ধীরভাবে যথাসম্ভব বিশুদ্ধ প্রণালীতে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। রুচি-স্তোত্রের ন্যায় একটী

স্তোত্র পাঠ করাইলেন, উহা বঙ্গদেশে নাই। স্তোত্রটী যেমন সুমধুর-সংস্কৃতে নিবদ্ধ, তেমনই ভক্তিভাবের উত্তেজক। এখানকার পাণ্ডারা অপেক্ষাকৃত ভদ্রপ্রকৃতি-সম্পন্ন। পুরোহিতের দক্ষিণা, ব্রাহ্মণ-ভোজন, সুফলীকরণের বৃত্তি প্রভৃতি লইয়া একরূপ স্বল্পব্যয়েই সমুদয় সম্পন্ন হইল। উপরে উঠিয়া গণপতি মহাদেব প্রভৃতির অর্চনান্তে বাসায় প্রত্যাবৃত্ত হইলাম। পাণ্ডারা তিন ভাই। আহারের সময় বাটীর তিনটী বধূই অনাবৃত-মস্তকে আমার সম্মুখে আসিয়া বসিলেন। তাঁহারা শুনিয়াছেন, 'আমি পণ্ডিত' সুতরাং আহারের পর, আমাকে হাত দেখিতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম "আমি সামুদ্রিক ও জ্যোতিঃশাস্ত্র পড়িয়াছি বটে কিন্তু কখনও করকোষ্ঠী দেখি না"। বড়বধূ নিজে সন্তানবতী কিন্তু তাঁহার অপর দুইটী যাতার সন্তানাদি হয় নাই। তজ্জন্ত বারংবার হাত দেখিবার জন্ত নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি কোন রূপে সম্মত না হওয়ায় অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন "দেখুন দেখি ইহাদের সন্তান হইবে কিনা?" আমি "বচনে কিং দরিদ্রতা" এই নীতিবাক্যের অনুসরণ করিয়া বলিলাম "হাঁ হইবে"। উহা শুনিয়া প্রৌঢ়-যৌবনা মেজে বধূ কিঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া রহিলেন। ষোড়শী ছোটবধূটী খুসী হইয়া হাঁসিতে হাঁসিতে উঠিয়া গেলেন। আহারান্তে পাণ্ডার সহিত নাসিকতীর্থ-সংক্রান্ত অনেক কথা হইল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর দেবালয় সন্দর্শনার্থ বহির্গত হইলাম।

গোদাবরী পার হইয়া প্রথম রামমন্দিরে রামসীতা, লক্ষ্মণমন্দিরে লক্ষ্মণমূর্ত্তি অবলোকন করিয়া সীতাগুহায় উপস্থিত হইলাম। মন্দিরের স্বামী দর্শককে সীতামূর্ত্তি দর্শন করাইতে আদেশ করিলেন। প্রদর্শক একটী দ্বার অতিক্রম করিয়া মন্দিরের অভ্যন্তরস্থ কোন

স্বাভাবিক পার্ব্বত্য-গুহার মধ্যে উপস্থিত করিল। উহার অভ্যন্তর-ভাগ অন্ধকারময়, কেবল একটী প্রদীপ ক্ষীণভাবে জ্বলিতেছে। ঐ সামান্য আলোকের সাহায্যে পর্ব্বতগাত্রে খোদিত সীতামূর্ত্তি দর্শন করিলাম। ক্ষুদ্র একটী দ্বার ব্যতীত কোন দিক্ হইতে বায়ু-সঞ্চারের সম্ভাবনা নাই। একে দারুণ গ্রীষ্ম, তাহাতে বায়ুর অভাবে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। আমরা কেবল গুহার মধ্য হইতে বাহিরে আসিবার উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় প্রায় ত্রিশ জন যাত্রী উহার মধ্যে প্রবেশ করিল। আমার তখন শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। সূচ্যগ্র-পরিমিত স্থান নাই যে, নির্গত হইব। দর্শককে বারংবার বাহিরে লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলাম, সে আমার কথায় কর্ণপাত না করিয়া যাত্রীগণের নিকট সীতামূর্ত্তির ইতিহাস-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইল। শেষে সেই যাত্রীর ভিড় কমিলে বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। আর একটু হইলে প্রাণবায়ু পলায়ন করিত। সীতা-গুহা হইতে নির্গত হইয়া প্রধান প্রধান প্রায় ত্রিশটী মন্দিরে নানাবিধ দেবমূর্ত্তি সন্দর্শন করিলাম। পুস্তকের কলেবর অত্যধিক বিস্তৃত হইয়া পড়ে বলিয়া সে সমুদায়ের সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ হইল না।

পঞ্চবটী। এই সকল দেবালয় দর্শন করিতে অপরাহ্ণ সাড়ে চারি ঘটিকা বাজিয়া গেল। পঞ্চবটীর যে অংশে রাম পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত কাল যাপন করিয়াছিলেন, পাণ্ডার সহিত সেই দিকে চলিলাম। এই অংশের প্রাকৃতিক দৃশ্য যিনি এক বার নয়নগোচর করিবেন, তিনি জীবন থাকিতে উহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। আমরা গোদাবরী-তীর ছাড়িয়া সরল পথ অবলম্বনপূর্ব্বক প্রান্তরের মধ্য দিয়া পূর্ব্বদক্ষিণাভিমুখে

চলিলাম। অনতিদূরে পর্ব্বতশ্রেণী মেঘমালার ন্যায় দিঙ্‌মণ্ডল ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ময়ূরগুলি আমাদিগকে দেখিয়া বিস্মিতচিত্তে রাস্তার একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। পীত ও শুভ্রবর্ণে চিত্রিত শৃঙ্গহীন হরিণসমূহ লাফাইয়া লাফাইয়া দূরে পলায়ন করিতে লাগিল। প্রান্তর অতিক্রম করিয়া পুনরায় গোদাবরী-তীরে উপনীত হইলাম। পথের উভয় পার্শ্বে সাধুগণের আশ্রম। আমরা তীরবর্ত্তী পথ ধরিয়া পূর্ব্বাভিমুখে চলিলাম। বাল্মীকি-রামায়ণের আরণ্যকাণ্ড পাঠে অবগত হওয়া যায় 'রাম দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয় প্রথম মহর্ষিগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহার পর, বিরাধ নামক রাক্ষসকে বধ করিয়া শরভঙ্গ ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন। ঐ ঋষি, রামের যথাবিধি অভ্যর্থনা ও উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক হুতাশনে দেহ সমর্পণ করিলে, রাম সুতীক্ষ্ণ মুনির নিকেতনে গমন করেন। সেখানে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে উপস্থিত হন এবং তাঁহারই উপদেশে গোদাবরী-তীরে মনোরম পঞ্চবটী-কাননে পর্ণশালা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন'। আমরা যেখানে ভ্রমণ করিতেছিলাম, হয়ত উহারই কোন স্থলে শরভঙ্গ ও সুতীক্ষ্ণ ঋষির আশ্রম ছিল। মহর্ষি অগস্ত্য ও উহারই কোন অংশে পর্ণকুটীরে উপবেশন করিয়া বেদ অধ্যাপনা করিতেন। ঋষিকন্যা আত্রেয়ী অলৌকিক-প্রতিভা-সম্পন্ন কুশলবের সহিত অধ্যয়ন করিতে অসমর্থ হইয়া বাল্মীকির আশ্রম * হইতে দক্ষিণাপথে অগস্ত্যের আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন †।

---

* কাণপুরের অনতিদূরবর্ত্তী বিঠুর নামক স্থানে বাল্মীকির আশ্রম ছিল।

† আত্রেয়ী। "অস্মিন্নগস্ত্য-প্রমুখাঃ প্রদেশে
ভূয়াংস উদ্গীথবিদো বসন্তি।
তেভ্যোঽধিগন্তুং নিগমান্তবিদ্যাং
বাল্মীকি-পার্শ্বাদিহ পর্য্যটামি॥"
(ভবভূতিঃ)।

সাধুগণের আশ্রম অতিক্রম করিলেই গোদাবরী-তীরে বৃহৎ বৃহৎ তরুরাজি-বিরাজিত দীর্ঘকানন দৃষ্ট হইল। ঐ কাননের মধ্য দিয়া ক্ষুদ্র পথ অবলম্বনপূর্ব্বক অরুণা ও গোদাবরীর সঙ্গমস্থলে উপনীত হইলাম। ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী অরুণা পার্ব্বত্যপথে অবতরণ করিয়া পুণ্যসলিলা গোদাবরীর সহিত মিলিয়াছেন। এই সঙ্গম স্থলের দৃশ্য দেখিলে মনে হয় যেন অরুণা ও গোদাবরী উভয় সখী উপত্যকা-পথে অবতরণ করিয়া পবিত্র ভাবরাশির ন্যায় স্বচ্ছ সলিল-প্রবাহ বিনিময় করিতেছেন। সূর্য্যদেব অস্তগমনোন্মুখ, ধীরে ধীরে সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। বিজন গোদাবরীতীর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। কেবল উচ্চ বৃক্ষের চূড়ায় পক্ষি-সকল কলরব করিতেছিল। সেই স্থানে দাঁড়াইয়া কত কি মনে হইতে লাগিল। বন-দেবতা বাসন্তী যেন রামকে বলিতেছেন "মহারাজ! যাহাকে তুমিই আমার জীবন, তুমিই আমার দ্বিতীয় হৃদয়, তুমিই আমার নয়নের আনন্দদায়িনী জ্যোৎস্না এবং তুমিই আমার অঙ্গের অমৃত ইত্যাদি শত শত চাটু বাক্য দ্বারা প্রীত ও প্রসন্ন করিতে, এখন তাহাকেই......অথবা এই পর্য্যন্তই থাক, আর প্রয়োজন কি?" * আবার যেন তমসা সীতাকে বলিতেছেন "রামকে অত্যন্ত মনোযোগের সহিত এই বিশ্বসংসার যথাবিধি পরিপালন করিতে হয়, তাহাতে আবার নিদারুণ প্রিয়া-শোক, নিদাঘ-

---

* 'ত্বং জীবিতং ত্বমসি মে হৃদয়ং দ্বিতীয়ং,
ত্বং কৌমুদী নয়নয়োরমৃতং ত্বমঙ্গে।
ইত্যাদিভিঃ প্রিয়শতৈরনুরুধ্য মুগ্ধাং,
তামেব শান্তমথবা কিমিহোত্তরেণ।'
(ভবভূতিঃ)

কাল যেমন পুষ্পকে ম্লান করে, সেই রূপ জীবন-কুসুমকে অতিশয় শুষ্ক করিয়া তুলিতেছে। আবার আপনিই সীতাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন সুতরাং বিলাপ দ্বারা যে মনের ক্লেশ দূর করিবেন, তাহারও উপায় নাই। আর যদিও রোদন দ্বারা কিছুমাত্র চিত্ত-বিনোদন হয় না, তথাপি যখন উহা দ্বারাই আজ পর্যান্ত জীবিত আছেন, তখন রোদনই পরম লাভ মনে করিতে হইবে" *।

কিছুকাল পরে গোদাবরী-সঙ্গমে স্নানের পরিবর্ত্তে সঙ্কল্প পাঠ-পূর্ব্বক সলিল স্পর্শ করিয়া সায়ং-সন্ধ্যা এবং অন্যান্য তীর্থোচিত কার্য্য শেষ করিলাম। এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনায় মহাকবি বাল্মীকি ও ভবভূতি এতদূর সফলকাম হইয়াছেন যে, দর্শক এখানে আসিলে তাঁহাদের বর্ণিত সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত রামের পঞ্চবটী-বাস, বনদেবতা বাসন্তী এবং সীতার সহিত তমসা মুরলার কথোপকথন প্রভৃতি প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিতে পারেন। পাণ্ডা গৃহগমনের জন্য ব্যগ্র, সে পুনঃ পুনঃ আমাকে বলিতে লাগিল "মহাশয়! শীঘ্র চলুন, এখানে বিলম্ব করিবেন না, হিংস্র জন্তুর ভয় আছে।" আমি অগত্যা অনিচ্ছা-সত্ত্বেও সেই মনোরম ক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া চলিলাম। গোদাবরীর কূলে বহুসংখ্যক সাধুর আশ্রম বিদ্যমান। তীর্থযাত্রীদের দানেই উক্ত সাধুগণের পঞ্চবটী-বাস সম্পন্ন

তমসা,

* "ইদং বিশ্বং পাল্যং বিধিবদভিযুক্তেন মনসা,
প্রিয়াশোকো জীবং কুসুমমিব ঘর্ম্মঃ ক্লময়তি।
স্বয়ং কৃত্বা ত্যাগং বিলপনবিনোদোঽপ্যসুলভ
স্তদস্যাপ্যুচ্ছ্বাসো ভবতি ননু লাভো হি রুদিতম্॥

(ভবভূতিঃ)

হয়। পাণ্ডার উপদেশে তাঁহাদের আশ্রম ও দেবমন্দির দেখিবার উদ্দেশ্যে অন্যপথে চলিলাম। গোদাবরী-সঙ্গম হইতে বহুদূর পর্য্যন্ত কোন লোকালয় নাই। তীরভূমি কেবল আম্র জম্বু, কদম্ব, বিল্ব ও অন্যান্যতরু-গুল্মে পরিব্যাপ্ত। চতুর্দ্দিকে সান্ধ্য আলোক বিকীর্ণ হওয়ায় বনশ্রেণী যেন স্বর্ণের কান্তিতে শোভিত হইয়া গেল। তরুতলে পতিত পক্ব জম্বু-সকল পদাঘাতে বিদলিত হইয়া একপ্রকার গন্ধ বিস্তার করিতে লাগিল। এক স্থানে ময়ূরদম্পতি বিচরণ করিতেছিল, আমাদের পায়ের শব্দ পাইয়া কদম্বের শাখায় উঠিয়া বসিল। বেলাভূমি হইতে গোদাবরীর জলপ্রবাহ অনেক নিম্নে প্রবাহিত। যে স্থানে নদীর গতি বক্র, সেখানে তীরস্থ লতাগুলি নুইয়া জলে পড়িয়াছে। কোন স্থানে নদীর কূলে গভীরগর্ত্ত ও নিবিড় অরণ্য। উহা হইতে অনবরত ঝিল্লীরব উত্থিত হইতেছে। এই নির্জ্জন কাননের উচ্চ উচ্চ বৃক্ষের শাখায় কোকিল ও অন্যান্য বনবিহঙ্গ আনন্দে রব করিতেছে। উহা বড়ই শ্রুতি-মধুর বোধ হইল। আমাদের বঙ্গীয় কবি মধুসূদন বোধ হয়, এই স্থান স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াই লিখিয়াছিলেন ;—

"ছিনু মোরা সুলোচনে গোদাবরীতীরে,
কপোত কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে"।

কিছুক্ষণ পরেই আমরা পুনরায় সাধুগণের আশ্রমের সন্নিহিত হইলাম। ঐ স্থানে ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের সাধুই অবস্থান করেন। অনেক দণ্ডী পরমহংস দেখিলাম। কোন স্থানে মধ্বাচার্য্য-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব, কোথায় বা বল্লভাচারী বৈষ্ণবগণ কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

নাসিক ইতিহাসাতীতকাল হইতে বিশ্রুত। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন "যিশুখ্রীষ্টের জন্মগ্রহণের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এখানে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী অন্ধ্রভৃত্য-বংশীয় নরপতিগণ রাজত্ব করিতেন।" অদ্যাপি ইহার অনতিদূরবর্ত্তিনী একটী পর্ব্বতমালার উপরিভাগে অসংখ্য বৌদ্ধ-কীর্ত্তিকলাপ বিদ্যমান আছে। তাহার পর, যথাক্রমে চালুক্য, রাঠোর এবং যাদববংশীয় নৃপতিগণ এই প্রদেশ শাসন্ করেন। খ্রীষ্টীয় ১২৯৫—১৭৬০ অব্দ পর্য্যন্ত ইহা মুসলমানগণের অধিকারে থাকে। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮১৮ অব্দ পর্য্যন্ত এই প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয়গণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। পেশোয়াগণের অধিকার কালে এখানে বহুসংখ্যক দেবালয় ও মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখনও উহার অনেক বিদ্যমান আছে। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই প্রদেশ ইংরাজরাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াছে। নাসিক অতি স্বাস্থ্যকর স্থান। ইহা নাসিক-জেলার হেড্‌কোয়ার্টার্। এখানে দেওয়ানী ও ফৌজদারী কোর্ট ও মিউনিসিপালিটী আছে। নাসিক নগরে চিত্তপাবন-ব্রাহ্মণের সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বহুকাল হইতে নাসিক সংস্কৃত-চর্চ্চার জন্য প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বগৌরবের নিদর্শন-স্বরূপ অদ্যাপি এখানে কয়েকটী সংস্কৃত-চতুষ্পাঠী দেখিতে পাওয়া যায়। রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় পুনরায় গোদাবরী পার হইলাম। নাসিকের তাম্র ও পিত্তলের দ্রব্য বড়ই সুন্দর। এক কাংস্যকারের বিপণি হইতে কয়েকটী পিত্তলের ও কাঁসার দ্রব্য ক্রয় করিয়া বাসায় ফিরিলাম। নাসিক যে এত সুন্দর ও শান্তিপ্রদ স্থান তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। কয়েক দিন এখানে অবস্থান করিতে পারিলাম না বলিয়া মনে অত্যন্ত ক্ষোভ হইল। গ্রীষ্মাবকাশ প্রায় শেষ হইয়াছে, আর থাকিলে চলিবে না।

অগত্যা পাণ্ডার প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া রাত্রি ১১ টার ট্রেন্ ধরিবার জন্য ট্রামে আরোহণ করিলাম। সমস্ত নিশা ও পর দিবস বাষ্প-শকটে অতিবাহিত করিয়া অপরাহ্ন ছয় ঘটিকার সময় নাগপুর পৌঁছিলাম। ঐ রাত্রি নাগপুরে যাপন করিয়া পরদিন ১৭ই জ্যৈষ্ঠ আট ঘটিকার মধ্যে আহার শেষ করিয়া পুনরায় বাষ্পশকটে উঠিলাম। পরদিন (১৮ই জ্যৈষ্ঠ) ১২ টার পর উক্ত শকট আসানসোল ষ্টেসনে উপস্থিত হইল। ঐ স্থানে আধ ঘণ্টা গাড়ী অপেক্ষা করে। তাহার পর, পুনরায় ট্রেনে উঠিয়া অপরাহ্ন পাঁচটার সময় হাওড়া ষ্টেসনে অবতরণ করিলাম। একখানি ঘোড়ার গাড়ীতে আরোহণ করিয়া বাসায় পৌঁছিয়া দেখি আমার ছাত্রগণ আমার অভ্যর্থনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাঁহার কৃপায় নিরাপদে ভ্রমণ শেষ হইল, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরকে প্রণিপাত করিয়া বিশ্রামার্থে গমন করিলাম।
